জুলাই-আগস্ট
২০২১

হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবের দ্বৈমাসিক বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিন

হোয়াইট অরিজিন্স

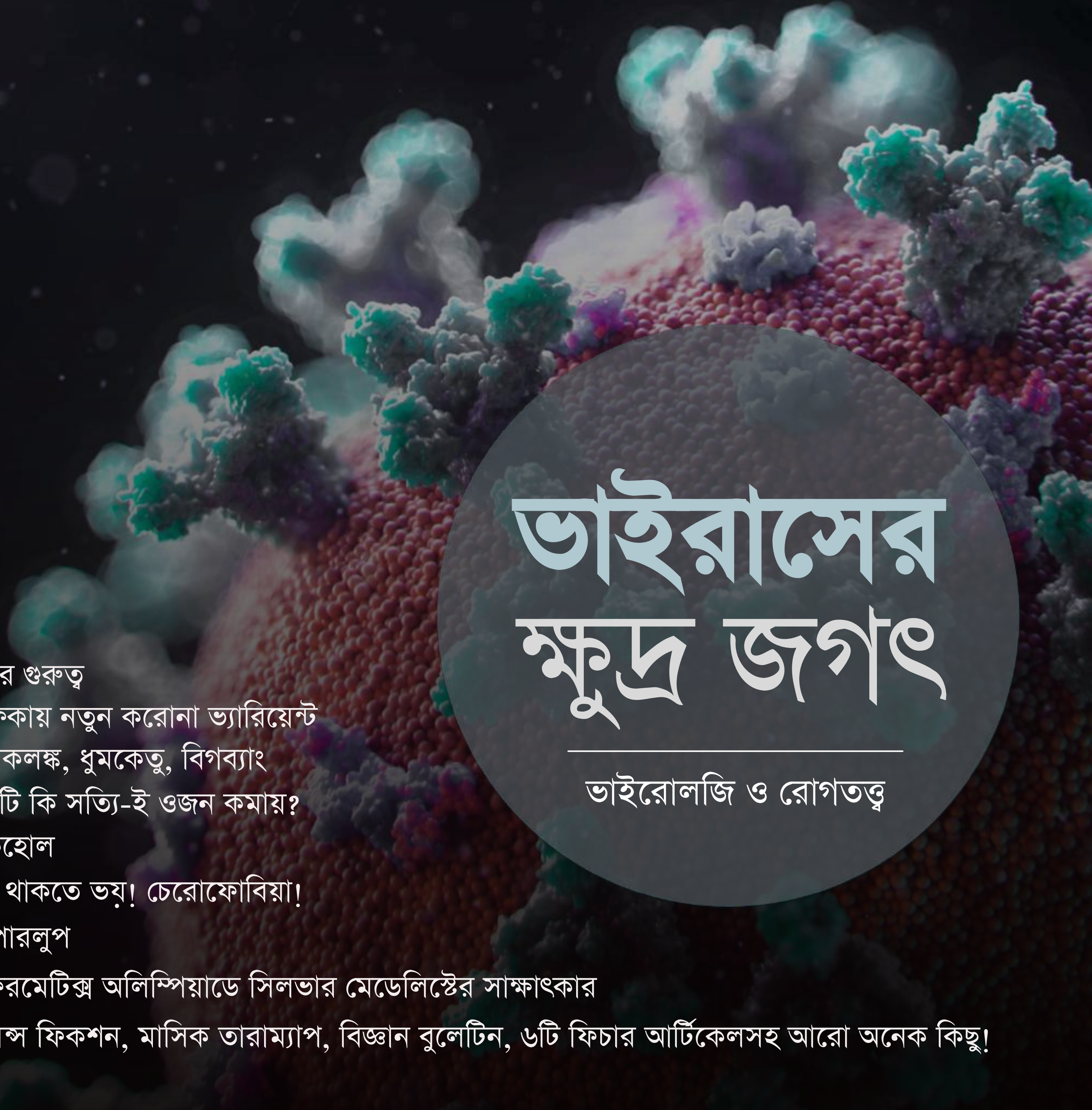

ভাইরাসের ক্ষুদ্র জগৎ

ভাইরোলজি ও রোগতত্ত্ব

- পানির গুরুত্ব
- আফ্রিকায় নতুন করোনা ভ্যারিয়েন্ট
- সৌরকলঙ্ক, ধুমকেতু, বিগব্যাং
- গ্রিন টি কি সত্যি-ই ওজন কমায়?
- ব্ল্যাকহোল
- সুখে থাকতে ভয়! চেরোফোবিয়া!
- হাইপারলুপ
- ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে সিলভার মেডেলিস্টের সাক্ষাৎকার
- সায়েন্স ফিকশন, মাসিক তারাম্যাপ, বিজ্ঞান বুলেটিন, ৬টি ফিচার আর্টিকেলসহ আরো অনেক কিছু!

ম্যাগাজিনে ঢোকার আগে...

আমাদের বিজ্ঞান ক্লাব থেকে এটাই প্রথম ম্যাগাজিন, তাই ভুল কিছু অবশ্যই থাকবে। তারপরেও আমরা চেষ্টা করব ভালো মানের একটি ম্যাগাজিন দিতে। এবং প্রথম ম্যাগাজিনে যেটি হয়... সব রকম ফিচার থাকে নাহ, ধীরে ধীরে নতুন নতুন অনেক কিছু যুক্ত হতে থাকে। আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেরকমই হবে। সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা ধীরে ধীরে বড় হতে চাই এবং বিজ্ঞানের শুদ্ধ চর্চা ও চিন্তাকে নিঃস্বার্থভাবে প্রসার করতে চাই। এই কাজে তোমাদের থেকে আমাদের বেশ কিছু সাহায্য দরকার।

প্রথমত, যদি আমাদের কোথাও কোনো ভুল ধরা পড়ে, দয়া করে আমাদের মেইলে একটু ইলেক্ট্রনিক চিঠি লিখে জানিয়ে দিও! প্রতিটি ফিডব্যাক এবং সংশোধনীর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। আর মেইলে শুধু সমালোচনা করতে হবে তা নয়, চাইলে যা যা ভালো লেগেছে তাও বলতে পারো। একটু একটু প্রশংসা হয়ত আমাদেরকে অনেক উৎসাহ দিবে। দ্বিতীয়ত, আমরা চাই এই ম্যাগাজিন সবার হোক, এখানে সবাই লিখুক। তাই তোমার সকল রকম লেখা আমাদেরকে মেইল করতে ভুলো নাহ! তৃতীয়ত, তোমার বিজ্ঞানপ্রিয় বা আধাপ্রিয় বন্ধুগুলোকে জানিয়ে দাও এই ম্যাগাজিনের কথা!

অবস্থা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আপাতত অনলাইন কপিই বের হবে, এবং ফেসবুক পোস্টের মত ধুম ধুম স্ক্রল না করে একটু শান্ত হয়ে মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করতে থাকো "হোয়াইট অরিজিন্স"। অন্য ম্যাগাজিন থেকে সাইজে বেশ বড় কিন্তু! সময় লাগতে পারে অনেক!

সম্পাদকের ডাইরি থেকে

এই যে!

আশেপাশে এখনো তো করোনা ঘুরোঘুরি করছে, নাহ? এবং ঘরে বসে থাকতে থাকতে তুমিও ক্লান্ত নিশ্চয়ই! আমিও তেমনই... তবে আমাদের দুজনের মধ্যেই যে মিলটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা দুজনই সম্ভবত টের পাচ্ছি বেশ দ্রুতই আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু হবে!

স্বাভাবিক জীবনে গেলে করোনাকে তো ভুলে যাবই, ভুলে যাব হয়ত ভাইরাসকে বা টিকাকে। শেষবারের মত তাই হরেকরকম ভাইরাসের টিকা, ভ্যাক্সিনের নানা রকমফের, কীভাবে তারা কাজ করে, বাংলাদেশের প্রতিকার বা প্রতিরোধের কী অবস্থা তা নিয়ে বেশ কিছুটা আলোকপাত করে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সকল বিজ্ঞানীদের প্রতি উৎসর্গ করে এবারের হোয়াইট অরিজিন্স আসছে। আর এর সাথে নিয়মিতভাবে থাকছে প্রশ্নোত্তর বিভাগ, বিজ্ঞানের নানা আপডেট, এবং এ মাসের আকাশের তারাম্যাপ। থাকছে বেশ কিছু সুন্দর সায়েন্স ফিকশন!

এসবের বাইরেও ম্যাগাজিনের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকবে আরো মজা। সায়েন্টিফিক মিম, বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সাথে পরিচয়, গ্রীন টির কার্যকারিতা, স্বাস্থ্যঝুঁকি, ক্যান্সার জেনেটিক্স, বিগ ব্যাং, চেরোফোবিয়া, ব্ল্যাকহোল, হাইপারলুপসহ নানা বিষয়ের উপর মজাদার আর্টিকেল!

আশা করছি এবারের সংখ্যা পড়ে বেশ মজা পাবে। তোমার বন্ধুরাও মজা পেতে পারে, তাদেরকেও জানিয়ে দিও। যেকোনো সাজেশন থাকলে আমরা তো আছিই! তোমাদের সাজেশনের জন্যই অপেক্ষা করবে আমাদের ই-মেইল বক্সে। বাইরে যাওয়ার সময় এখনো মাস্ক নিতে ভুলো নাহ যতই তাড়াহুড়ো থাকুক! তুমি মাস্ক না পড়লে হয়ত তোমার জন্য করোনা আরো ১৪ দিন বেশি থাকবে বাংলাদেশে!

- সম্পাদনা পরিষদ,
হোয়াইট অরিজিন্স প্রথম সংখ্যা

STOP
COVID-19
NOW!

সূচিপত্র

সাইলিট

৮ মৃতপৃথিবী
১১ ঘৃণা
৫৫ জাদুকর
৬৪ শিউলীফুলের ভালোবাসা
১০১ সায়ানাইড
১১১ ঘোলাটে সকাল

মূল আকর্ষণ

করোনার হাতিয়ারঃ ভ্যাক্সিন ২৫
ভ্যাক্সিনের ধরণ নিয়ে মানুষের যত জিজ্ঞাসা ২৯
ভ্যাক্সিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ৩৩
বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা ও ভ্যাক্সিন ৩৯
প্রতিকার নাকি প্রতিরোধ ৪২
মানুষ ও এইচআইভি ভাইরাসের যুদ্ধ ৪৭

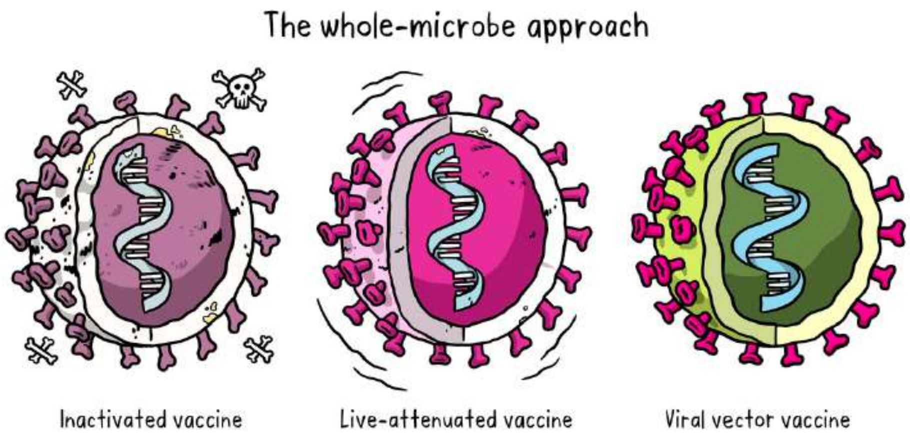
The whole-microbe approach
Inactivated vaccine
Live-attenuated vaccine
Viral vector vaccine

ম্যাগাজিন টিম

সম্পাদনা পরিষদ

অংকন দে অনিমেষ
আব্দুর রহমান
মাহির আজরাফ
সাঈদ খান সাগর

ডিজাইন প্রধান

অংকন দে অনিমেষ

ডিজাইন সহকারী

মুহাম্মদ জাওহার চৌধুরী
নূরে ওয়াকিয়া
জাবেদ মাহমুদ
হাসপিয়াত তোরাবী
শাজিদুল ইসলাম
খালেদ বিন হেলাল
ইমতিয়াজ উদ্দিন
সামিরা আকতার
হিমাদ্রী দে

প্রচ্ছদ

মুহাম্মদ জাওহার চৌধুরী

শুভকামনায়

ড. আদনান মান্নান
সাইফুদ্দিন মুন্না
ড. মঞ্জুরুল কিবরিয়া

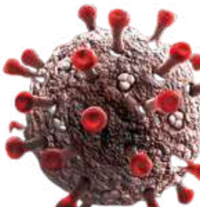

সূচিপত্র

বৈজ্ঞানিক লেখালেখি

৫৬ চেরোফোবিয়াঃ সুখী হওয়ার অযৌক্তিক ভয়
৬১ বাড়ছে প্রবণতা আত্মহত্যার দিনদিন
৬৯ পানির গুরুত্ব কি ওভাররেটেড?
৭৭ উজ্জ্বল সূর্যের অন্ধকার দাগ
৮৯ অগ্নি কেতন সৃষ্টিঃ ধুমকেতু
৯৬ বিগ ব্যাংঃ সবকিছুর সৃষ্টি যেখানে

৬৬
হাইপারলুপ টিউব ও পড

কিশোর স্বাস্থ্যচিন্তা

এই অংশে কিশোর বয়সের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সঠিক ভাবে চলমান রাখার জন্য নানা লেখা ও ফ্যাক্টস প্রকাশিত হয়!

রান্নাঘরের জাদুর কাঠি করছে না তো স্বাস্থ্যহানি!! ১০৬
গ্রীন টি কি সত্যিই ওজন কমায়? ১০৮
"ভরা পেটে ফল, খালি পেটে জল"– প্রবাদটি আদৌ কতটুকু কার্যকরী? ১০৯

১৩
ব্ল্যাকহোলঃ মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ ও কৃষ্ণগহবর অতিকথন

বিশেষ ধন্যবাদ

সাদিয়া সুলতানা
ফারিহা রাইসা
সায়মা সুলতানা
রিনভি নুসরাত

পরিমার্জনা ও পুনলিখন

হাসপিয়াত তোরাবী
নূরে ওয়াকিয়া
হালিমা সামিয়া
নাজিফা গওহার
রাফিদ আবরার
এনামুল হক জুয়েল
মুহাম্মদ
আফরোজা সুলতানা মনি

একাডেমিক নেতৃত্ব

হাসপিয়াত তোরাবী
নূরে ওয়াকিয়া

সম্পাদনা ও প্রচার

অংকন দে অনিমেষ
মোহাম্মদ আইমান আওসাফ
মুহাম্মদ জাওহার চৌধুরী
ক্লাব জেনারেল মেম্বারস

প্রকাশনা ও সত্ত্ব

হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব
(সংবিধান অনুযায়ী স্বত্ব প্রযোজ্য হবে)

সূচিপত্র

স্বপ্নযাত্রার গল্প

৫০

ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড ইন ইনফরম্যাটিক্স, যা কিনা বিশ্বের প্রোগ্রামাদের জন্য এক প্রেস্টিজাস কম্পিটশন, সেখানে রৌপ্য জয় করে এনেছে বাংলাদেশী মামনুন সিয়াম। এবারের সংখ্যায় কথা হচ্ছে তার সাথে...

কী, কেন, কীভাবে?

১৯

এই অংশে আমরা সাধারণত তোমাদের পাঠানো বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন সমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তর প্রদানের চেষ্টা করে থাকি। দেখে নাও এবারের প্রশ্নগুলো ও জেনে নাও তাদের উত্তর!

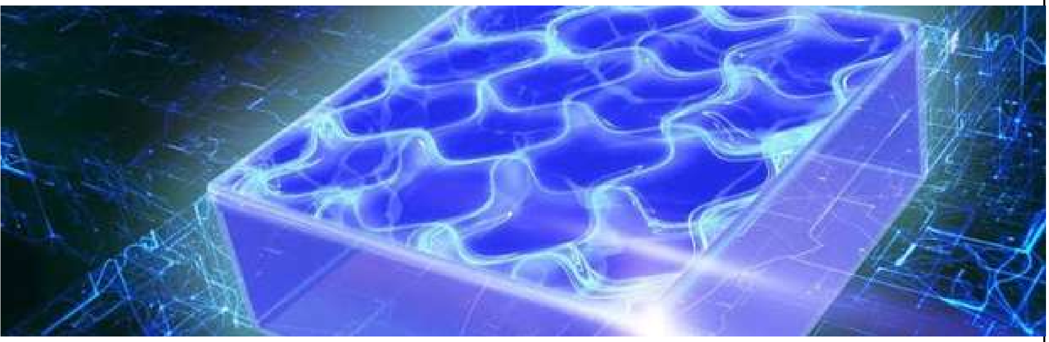

বিজ্ঞান বুলেটিন

৮৪

চট করে জেনে নাও গত ২ মাস তথা জুলাই ও আগস্টে বিজ্ঞানের জগতে কী কী ঘটে গেল, কী কী নতুন আবিষ্কার হল, কী কী ব্যর্থ হয়ে গেল, নতুন কীসের আশা পাওয়া গেল এবং আরো অনেক কিছু!

মাসিক তারাম্যাপ

৭৪

এই অংশে আমরা আকাশে তারাদের অবস্থা পর্যালোচনা এবং কীভাবে তারা দেখে চিহ্নিত করা যাবে তা নিয়ে আলোচনা করি। থাকে এস্ট্রোনমি শিখার নানা আর্টিকেল ও!

ক্লাব পরিচালক

রক্তিম বড়ুয়া

ক্লাব সহকারী পরিচালক

সোহেল বড়ুয়া

বিশেষ ভূমিকায়

হৃদিতা বণিক
হালিমা সামিয়া
নাবিলা আফনান
প্রীতম সেন
হৃদিকা বিশ্বাস
আদিবা তাসনিম
সানজিদা রহমান
সোহাইলা তাবাসসুম
ফাহিম
লাবণ্য
নাবিল বিন সাইদ
মাহমুদা আকতার
সিদরাতুল ছানিয়া
কাজী রাকিব
আঈশা নূর
নুসরাত জাহান
নোমান
সামার মাসরেকা
তনিমা দত্ত
মুহাম্মদ
আরিফ আবরার নাঈম

এছাড়াও নিয়মিত ভাবে থাকছে "আপনি কি জানেন?", বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবনালোচনা, বিজ্ঞানছবি, পরবর্তী সংখ্যার চমক সমূহের সংকেত, ও আমাদের কথা!

সাইলিট

কী এই সাইলিট? একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এটার অর্থ হচ্ছে সায়েন্স লিটারেচার, মানে হচ্ছে বিজ্ঞানের সম্পর্কিত সাহিত্যের যেকোনো রূপ। যারা এই লাইন পড়ে কনফিউজড, ওদের কে দ্রুতই বুঝাচ্ছি! সায়েন্স ফিকশন তো পড়েছ আশা করি? সায়েন্স ফিকশন একরকম সাহিত্য যেহেতু সেটা ফিকশন বা কল্পকাহিনী, আবার একই সাথে বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত! এর অর্থ সায়েন্স ফিকশন পড়বে এই "সাইলিট" ক্যাটাগরিতে। শুধু কী এটাই? একদমই নাহ! সাইলিট ছাড়াও থাকতে পারে সায়েন্স বিষয়ক পয়েট্রি বা কবিতা বা ছড়া, থাকতে পারে সায়েন্স নিয়ে তোমার লেখা রম্য রচনা, থাকতে পারে সায়েন্স নিয়ে যেকোনো সাহিত্যের রূপ! যদি সায়েন্সের পোকা হওয়ার পাশাপাশি মাথায় বইপোকা বা লেখার পোকা থাকে, তাহলে এই সেকশনে তুমি লেখা পাঠাতেই পারো।

কীভাবে লেখা পাঠাবে? আমাদের ম্যাগাজিনের ই-মেইলে গিয়ে জানাবে তোমার নাম, শ্রেণী এবং বিদ্যালয়। এরপর তুমি ডকুমেন্ট ফাইল আকারে আমাদেরকে তোমার লেখাটা প্রদান করবে, এবং ডকুমেন্ট ফাইল কী সেটা না বুঝলে গুগল ডক্স এর ফাইলের লিঙ্ক দিলেও হবে! এছাড়া যদি চাও, তাহলে লেখার সাথে যুক্ত করতে পারো বিভিন্ন ছবি! আর এরপর পরের ম্যাগাজিনে তোমার লেখার জন্য অপেক্ষা করো! এছাড়াও ইমেইলে তুমি কিন্তু তোমার লেখার উপর পেয়ে যাবে ফিডব্যাক এবং সেটার মাধ্যমে তোমার লেখাকে তুমি ইম্প্রুভ ও করতে পারবে!!

আমাদের মেইলঃ whiteorigins.wbsc@gmail.com

মৃতপৃথিবী

কার্ল আমাকে বারান্দাটিতে বসিয়ে চা আনতে চলে গেলো। এটি এস্ট্রোফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ১২ তম তলা। কার্লের গবেষণাগার, তার মূল কাজ নবিয়ন-১ হতে আসা ডাটাগুলো নিয়ে নতুন কোনো এক গ্যালাক্সির ইমেজ বানানো। বারান্দায় একটা ছোট টেবিল আর একটা মোটামুটি জটিল টেলিস্কোপ। কিন্তু বারান্দায় খোলা ছাদ থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার টেলিস্কোপটির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সন্দেহ হলো, এতো স্বচ্ছ আকাশ! কতো ছোট বিন্দু জ্বলজ্বল করছে, দেখে কেন যেন আমি খানিকটা শিউরে উঠলাম। আমাদের শহরে যে দূষণ, আজকাল চাঁদ দেখাটাও দুষ্কর। কিন্তু এখানে ফিজিক্স একাডেমী গাঁটের পয়সা দিয়ে পরিবেশ স্বচ্ছ রেখেছে। পরিবেশের জন্য কিনা জানিনা এখানে ঠান্ডাও খানিকটা বেশি, তাই আবার শিউরে উঠলাম। দেখি কার্ল চলে এসেছে চা নিয়ে, যাক শীত থেকে একটু বাঁচা যাবে। আমি কার্লকে বললাম, "এত ঠান্ডায় থাকো কি করে?" সে একটু হেসে বললো, "তুমি না দেখলেও শহরটির উপর একটি বায়ো-ডোম আছে, যা দিয়ে তাপমাত্রা, বায়ুচাপ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যদিও আজকে তা বন্ধ আছে।

আমি নড়েচড়ে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম কার্লকে, "যার কারণে বন্ধ সেটা নিয়ে কিছু বলো? শুনলাম এটা নাকি একটা নক্ষত্র?"

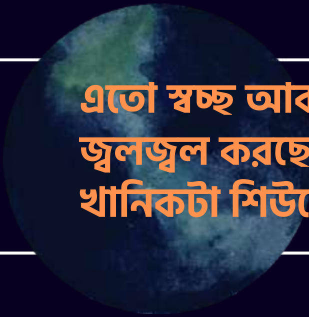

এতো স্বচ্ছ আকাশ! কতো ছোট বিন্দু জ্বলজ্বল করছে, দেখে কেন যেন আমি খানিকটা শিউরে উঠলাম

"গঠন নক্ষত্রের মতো হলেও নক্ষত্রের ধারে কাছেও নেই, সাইজটার কথাই যদি বল, মিল্ক ড্রোমিডার সব নক্ষত্র মিলেও এত ভর আনতে পারবে না! সম্ভবত কোন মেগা গ্যালাক্সির আন্তঃনাক্ষত্রিক নেবুলাগুলো নিজেদের মহাকর্ষের কারণে একে অপরের সাথে কলাপস করে এই আল্টিমেট জায়ান্ট তৈরি করেছে।" কার্লের ভয়াবহ বর্ণনা শুনে তৃতীয়বারের মতো শিহরিত হলাম। বললাম, "আচ্ছা এই ভয়াবহ কিছুর আলো পৃথিবীতে আসলে আমাদের ক্ষতি হবে না? ওই যে তুমি বলেছিলে মিল্ক ড্রোমিডার কোন গতি জানি এর মহাকর্ষের কারণে ব্যাহত হয়েছে?"

"আমাদের হিসাব অনুসারে কিছু হওয়ার কথা নয়, হয়তো মিওন একটু বেশি ফ্লো হবে, নিউট্রিনো ফ্লাস্ক বৃদ্ধি পাবে। আর কিছু নয়, যদি না-"

"যদি না কি?"

সে একটু হেসে বললো, "যদি না আমাদের হিসাব ভুল হয়।"

"তাহলে সমস্যা নেই, তোমাদের উপর সবার বিশ্বাস আছে।" কার্ল জ্যোতির্পদার্থবিদদের একটা টিমে ছিলো, সম্প্রতি তারা মহাবিশ্বে এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে বড় নক্ষত্রের ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, যার আলো পৃথিবীতে আজ এসে পৌছাবে, রাত দুটোয় পূর্বাঞ্চলে। এমন মহাবৈশ্বিক ঘটনা মানুষের ছোটো জীবনে বিরল, তাই মানুষ তা দেখতে এসেছে। এই নক্ষত্রের তীব্রতা মোটামুটি সূর্যের কাছাকাছি হবে, তাই খালি চোখে দেখা যাবে সহজে। কেউ যদি ও বাইনোকুলার নিয়ে এসেছে। একাডেমির ক্যাম্পাসে লোকজন বেশি, এখানে আকাশ স্বচ্ছ, তাই লাখ তারা দেখা যায় খালি চোখে।

এমন মহাবৈশ্বিক ঘটনা মানুষের ছোটো জীবনে বিরল, তাই মানুষ তা দেখতে এসেছে

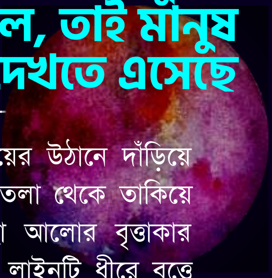

ঘড়িতে ঠিক দুইটা। উৎসুক জনতা বিল্ডিংয়ের উঠানে দাঁড়িয়ে আছে, সবার মধ্যে উত্তেজনা। আমরা ১২ তলা থেকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম উত্তর দিকে আবছা আলোর বৃত্তাকার লাইনের উদ্ভব হয়েছে, ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। লাইনটি ধীরে বৃত্তে পরিণত হচ্ছে, যেন নীল সূর্য। কয়েক মিনিটের মাথায় আকাশ আলোকিত হয়ে গেল, কিন্তু নীল আলো না, একদম লাল। যেন সারা আকাশে রক্ত। ভূমিতেও আলো পড়ছে, কেমন জানি সবুজ হলদে। কি তেজ! শীতকালেও অদ্ভুত গরম লাগছে। জিনিসটি আমি প্রথম খেয়াল করলাম, বারান্দার কাচের দরজাটি গলছে! সুষম গলন না হওয়ায় আমরা কিছু বুঝে উঠার আগেই ঠাস করে কাচটি ভেঙে গেলো। ব্যাপারটা শুধু আমাদের ফ্লোরে ঘটছে না। কারণ উপরে নিচে আরো কাঁচ ফাটার শব্দ হচ্ছে। নিচে লোকজন এই তীব্র গরমেও আতঙ্কে ছোটাছুটি করছে। কি হচ্ছে এইসব? ভিতরে এসে কার্লের দিকে আমি আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। সে ফ্যাকাশে হয়ে বলল, "মনে হয় হিসাবে সমস্যা হয়েছে, এত তীব্র আলো হবে আমরা ভাবতে পারিনি।"

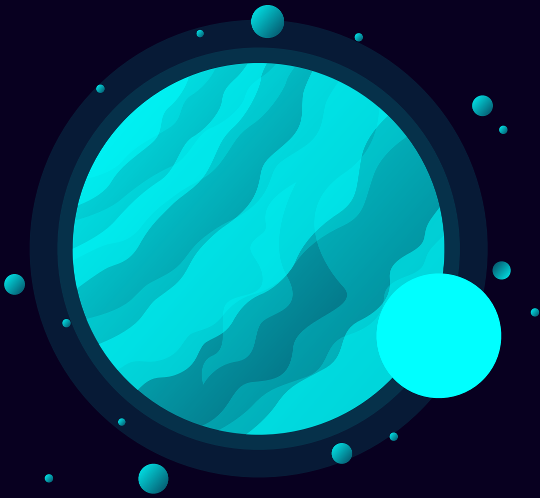

আমি চিৎকার করে বললাম, "তুমি কি তামাশা করতে চাইছো? হিসাবে সমস্যার মানে কী কার্ল?"

কার্ল একইরকম ফ্যাকাশে গলায় বলতে থাকে, "তাপের এরকম তীব্রতায় পৃথিবী বসবাসের যোগ্যতা হারাবে। সম্ভবত, ৯০% শতাংশ প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

> "তাপের এরকম তীব্রতায় পৃথিবী বসবাসের যোগ্যতা হারাবে। সম্ভবত, ৯০% শতাংশ প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। "

নক্ষত্রটি এখন পশ্চিম দিকে, তাই এখানে সূর্য থাকলেও সেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া তাপ নেই। সবাই ছোটাছুটি করছে ,ধর্মীয় উপসানালয় গুলো প্রার্থনায় ব্যস্ত, যাদের পক্ষে সম্ভব, তারা মাটির নিচে আশ্রয় নিচ্ছে। আমি ক্লান্ত হয়ে কার্লের অফিসে বসে আছি, কার্ল তার অফিসে ছোটাছুটি করে কিসব ব্যাবস্থা করছে। আমার কিছুই করার নেই।কারো খবরাখবর পাচ্ছিনা।শহরের যোগাযোগ ব্যাবস্থা মৃতপ্রায়। পৃথিবীর সবকটি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

রাস্তায় ঝলসে যাওয়া মৃতদেহ, আবার তাপে কংক্রিট গলে বিল্ডিং ধসে পড়ছে। সভ্যতা হয়তো পরবর্তী উদয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমাকে আর কার্লকে জরুরী ভিত্তিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্পেইস লঞ্চিং স্টেশনে। অন্য আরো অনেকের সাথে আমাদেরও স্পেসশিপে ওঠানো হচ্ছিলো।

পিছনে পরে রইলো মৃতপৃথিবী।

মুহাম্মদ জাওহার চৌধুরী
এসএসসি পরীক্ষার্থী,
চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

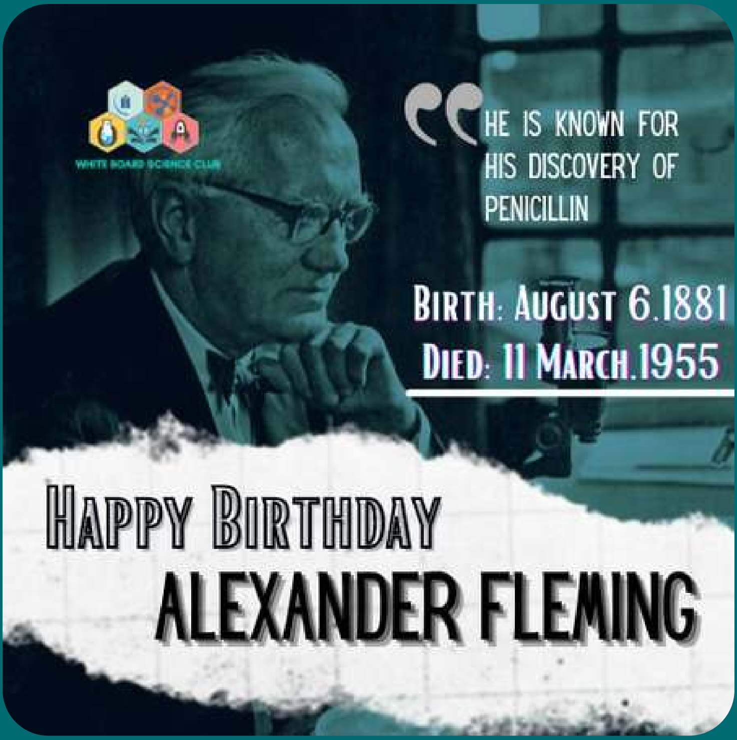

আমরা সবাই কম-বেশি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছি, তাই না? সাধারণত জ্বর হলে বেশিরভাগ মানুষ প্যারাসিটামল গ্রহণ করে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে এরপরও জ্বর না সারলে আমরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে থাকি। তখন ডাক্তার আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়ার পরামর্শ দেন। আচ্ছা কখনো কি চিন্তা করে দেখেছেন এই অ্যান্টিবায়োটিক যদি আবিষ্কার না হতো, তাহলে কেমন হতো? এর উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের একটু পিছনে যেতে হবে কারণ আজ থেকে মাত্র ১০০ বছর আগেও সংক্রমণ নিরাময়ের কোনো উপায় ছিল না। এমনকি তোমার হাটুতে সামান্য কাঁটা থাকলে যদি এটি খারাপভাবে সংক্রমিত হয়, তবে তা তোমার মৃত্যু হওয়ার মতো মারাত্মক কিছুতে পরিণত হতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানের অলৌকিকতা নিয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে বিপ্লব এসেছিল অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কারের পর; যার আবিষ্কারক ছিলেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। ১৮৮১ সালের ৬ই আগস্ট স্কটল্যান্ডের অন্তর্গত এয়ারসায়ারের লকফিল্ড নামক এক পাহাড়ী গ্রামে তাঁর জন্ম।

তাঁর চিকিৎসা জীবনের প্রথম দিকে, ফ্লেমিং রক্তের প্রাকৃতিক ব্যাকটেরিয়া ক্রিয়া এবং এন্টিসেপটিক্সে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৯২৮ সালে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস নিয়ে কাজ করার সময়, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ছাঁচটি দুর্ঘটনাক্রমে একটি স্ট্যাফিলোকক্কাস কালচার প্লেটে বিকশিত হয়েছিল এবং ছাঁচটি তার চারপাশে একটি ব্যাকটেরিয়া মুক্ত বৃত্ত তৈরি করেছিল। তিনি আরও দেখতে পান ছাঁচটি পাতলা হয়ে গেলেও স্ট্যাফিলোকক্কির বৃদ্ধি রোধ করে। তিনি সক্রিয় পদার্থের নাম দেন পেনিসিলিন বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ঘটনাকে বলা হয় *"Most Fortunate Mistake"*। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯৪৫ সালে চিকিৎসাবিদ্যায় "পেনিসিলিন আবিষ্কার" এর জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো এই পেনিসিলিনের আবিষ্কার।

শুভ জন্মদিন স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং !

আপনি কি জানেন?

কফি পানে বিষন্নতায় ভোগার ঝুঁকি কমে,বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে!

সম্প্রতি Harvard School of Public Health (HSPH) এর গবেষকদের দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়,কফি পানে নারীদের মধ্যে বিষন্নতায় ভোগার ঝুঁকি কমার সম্ভবনা।Michel Lucas এর নেতৃত্বে গবেষকরা গবেষণায় খুঁজে পান,যেসব নারী দৈনিক চার বা তার অধিক কাপ ক্যাফেইনযুক্ত কফি পান করেন তারা,
যারা কফি পান করেন না বা খুব সামান্য পরিমানে পান করেন তাদের তুলনায় ২০% কম ঝুঁকিতে থাকেন বিষন্নতায় ভোগার ক্ষেত্রে।

যারা ক্যাফেইনমুক্ত কফি(Decaf),চা,কোমল পানীয়,চকলেট এবং অন্যান্য পানীয় পান করেন যাতে ক্যাফেইনের পরিমান খুবই সামান্য তাদের ক্ষেত্রে এগুলো বিষন্নতায় ভোগার ক্ষেত্রে প্রতিরোধক্ষম প্রমাণিত হয়নি।

WHITE BOARD SCIENCE CLUB

ঘৃণা

ছোট্ট একটা শহরের এক প্রান্তে রাস্তায় বিভিন্ন বয়সের মানুষের সমাগম ঘটেছে। তাদের প্রত্যেকেরই দুটো করে হাত আর দুটো করে পা। একজন লোক একটা বাঁশিতে ফুঁ দিতেই সবাই দৌড়াতে শুরু করে। বিশাল কিছু ইমারত তৈরি হচ্ছে একটা শহরে। মানব-শ্রমিকেরা ইট-পাথর-সিমেন্টের বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছে নির্মাণাধীন অট্টালিকার নিচ থেকে উপরে। তাদের শরীর থেকে ঘাম বেয়ে পড়ছে। আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। লোকগুলো অমানবিকভাবে সেই হিম বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে।

এক জোড়া করে হাত-পা থাকা একজন মহিলাকে চলন্ত বিছানায় শুইয়ে দ্রুত গতিতে একটা ঘরে ঢোকানো হলো। এরপর ওই মহিলাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল একই রকমের পোশাক পরিহিত কয়েকজন মানুষ। মহিলাটির পেট স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বড় দেখাচ্ছে। তিনি ক্রমাগতভাবে চেঁচাচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই লোকদের একজন মহিলাটির পেট থেকে খুবই ছোট একটা বাচ্চা বের করে আনল। বাচ্চাটার শরীর অদ্ভুত ধরনের তরলে মাখানো। বাচ্চার মা নিস্তেজভাবে পরে আছেন, তাঁর মুখ থেকে হালকা গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

ছোট্ট একটা শহরের এক প্রান্তে রাস্তায় বিভিন্ন বয়সের মানুষের সমাগম ঘটেছে। তাদের প্রত্যেকেরই দুটো করে হাত আর দুটো করে পা।

পৃথিবীর এক প্রান্তে বিশাল বিলাসবহুল সরকারি কার্যালয়ে বসে কিছু মানুষ তৎকালীন তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি দেশে কি করে যুদ্ধ লাগিয়ে ফায়দা লুটে নেয়া যায় তা নিয়ে ভাবছে, আলাপ আলোচনা করছে। এরপরে দেখা গেলো পৃথিবীর একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশে কুড়ে ঘরে শুয়ে এক দুর্বল শিশু, তার মুখের কথা বনধ হয়ে গেছে, তা রুগ্ন শরীরের সাথে বেমানান বিশাল ফুলে ওঠা পেট বলে দেয় সে অসুস্থ।

"প্রফেসর, প্লিজ ক্লিপটা বন্ধ করুন, এক্ষুনি।" হঠাৎ করে বলে উঠলো সামনের বেঞ্চে বসা জিয়া। তার কণ্ঠে ফুটে উঠছে তীব্র অস্বস্তি। মি. জাইকো তার একহাতে থাকা কন্ট্রোলার দিয়ে একের পর এক ক্লিপ পাল্টাচ্ছিলেন। ছাত্রীর বিচলিত কণ্ঠ শুনে ক্লিপটি বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনো সমস্যা?"

জিয়া উঠে দাঁড়ালো। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে কণ্ঠে ক্লাসের ফার্স্টগার্লের ভাব এনে সে তাঁর চারটি হাত নেড়ে বলতে লাগল, "মি. জাইকো, আপনাকে আমার একজন শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষক হিসেবে জানি। আমার এটাও জানি যে আপনার রসবোধ প্রবল। কিন্তু তাই বলে আপনি নিজে নিজে কিছু থ্রিডি আনিমেশন ক্লিপ বানিয়ে ওগুলোকে সভ্য দাবি করে আমাদের পড়াতে পারেন না।"

'কিন্তু জিয়া, আমি তোমাদের ইতিহাস পড়াই , মিথলজি না।আমি কেন শুধু শুধু তোমাদেরকে মিথ্যা জিনিস শেখাতে যাব?', নিজেকে সমর্থন করে বললেন মি. জাইকো ।

"মিথ্যা শেখাতে যান না মানে? কে কোথায় শুনেছে যে মানুষের হাত-পা মাত্র এক জোড়া করে থাকে? এক জোড়া করে হাত-পা থাকলে আমাদের যখন প্রতিদিন স্কুলে আসতেই দেরি হতো, সেখানে ম্যারাথনে দৌড়ানো তো অনেক দূরের কথা।" জিয়ানার পেছনের বেঞ্চে বসা অ্যারো গড়গড় করে বলল কথাগুলো।স্কুলের মধ্যে একটু ঝগড়াটে হিসেবে পরিচিতি আছে ওর।

প্রফেসর জাইকো বললেন, “মানুষের আগে দুটো করেই হাত পা ছিলো অ্যারো।

একদম পেছনের দিকে বসে থাকা দ্রিকান , সচরাচর যে ক্লাসের মধ্যে হওয়া কোনো আলোচনায়ই অংশ নেয় না, সেও বলে উঠলো, "একজন মহিলা এমন কাটা পশুর মতো কাতরাচ্ছে একটা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্য, এ কেবল রূপকথার গল্পেই সম্ভব।"

কে কোথায় শুনেছে যে মানুষের হাত-পা মাত্র এক জোড়া করে থাকে? এক জোড়া করে হাত-পা থাকলে আমাদের যখন প্রতিদিন স্কুলে আসতেই দেরি হতো, সেখানে ম্যারাথনে দৌড়ানো তো অনেক দূরের কথা।

"ওদের সাথে আমিও একমত," বলল জিয়া, "অট্টালিকা বানানোর জন্য এত মানুষ লাগবে কেন? প্রতিবছর পৃথিবীতে ১৩ মিলিয়ন কট্রেরিক রোবটকে শুধু বাচ্চাদের সাথে খেলা আর বৃদ্ধদের সঙ্গ দেয়ার জন্য ম্যানুফ্যাকচার করা হয় না। এখন কেউ যদি মানুষকে দিয়ে ভারি বোঝা বহনের কাজ করিয়ে নেয় তাহলে তার শাস্তি কত ভয়াবহ হতে পারে আপনি জানেন?

তেইশ শতাব্দীর আগের মানুষেরা ছিল বর্বর আর অসভ্য। নয়তো শুধু যে মানুষকে দিয়ে এত অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ করানো হচ্ছে তাই নয়, তাদের নূন্যতম পারিশ্রমিক পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছেনা! এসব মানুষদের সব আচার আচরণই অসামাজিক আর অপরাধের পর্যায়ে পরে।"

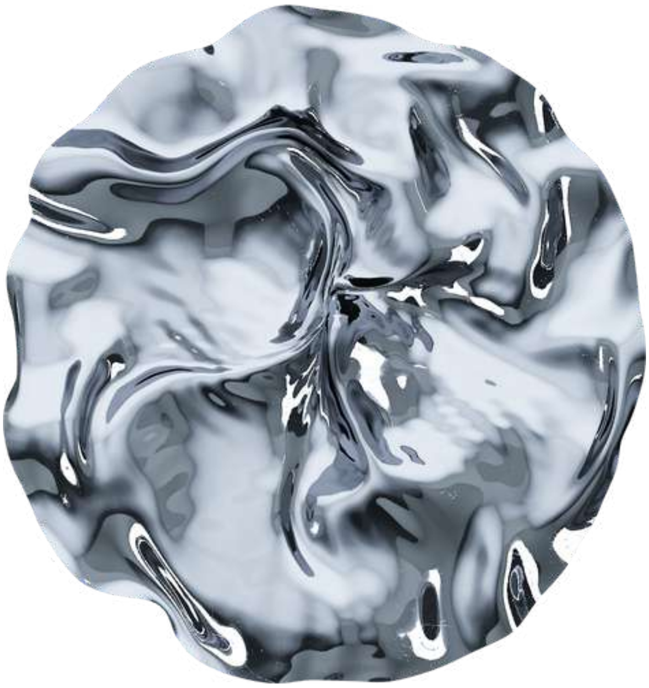

মি, জাইকো চুপ করে থাকলেন। তিনি এসবের জবাবে কি বলা উচিত জানেন না। মি. জাইকোর নীরবতাকে তোয়াক্কা না করেই জিয়া বলে চলল, "কত অমানবিকভাবে মানবজাতিরই একটা অংশ মানবজাতির অন্য অংশকে শোষণ করার তুখোড় মতলব আটঁছে। সে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শিশুরা পর্যন্ত মারা যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস হয় না এসব আপনারা সভ্যতার অংশ হিসেবে আমাদের পড়াচ্ছেন!" ছেলেমেয়েগুলোর চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মি. জাইকো বুঝলেন যে ক্লাসটা আর তার নিয়ন্ত্রণে নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সকল ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস থেকে বের হয়ে গেল। মি. জাইকো কাউকেই বাঁধা দিলেন না। বাঁধা দেওয়ার অনুমতি কিংবা ইচ্ছা-কোনোটিই তার নেই ।

"যত সব গাঁজাখুরি জিনিস পড়ানোর জন্য এই স্কুলে শুধু আমিই আছি। কত করে প্রিন্সিপালকে বললাম কোর্সের এই অংশটুকু বাদ দিতে। কে শোনে কার কথা! ভালোই হয়েছে আমাকে আজ পড়াতে হয়নি।" বিড় বিড় করে কথা-গুলো বললেন তিনি।

উত্তেজিত শিক্ষার্থীদের ক্লাস ছেড়ে যাবার ঘটনার এক সপ্তাহ পর, ৫৫৩৮ সালের ২৩ শে আগস্ট , মিনার্ভা একাডেমীর সকল ক্লাসের ইতিহাস বই থেকে 'দ্বাবিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক হামলার পূর্ববর্তী সময়কার মানবসভ্যতা' বিষয়ক সব অধ্যায় বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নতুন পৃথিবীর মানবজাতির মনে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই।

WHITE BOARD SCIENCE CLUB
বোসন বিজ্ঞান সংঘ

WHITEBOARD SCIENCE CLUB AND BOSON BIGGAN SANGHO PRESENTS
BIOLOGY OLYMPIAD
PREPARATION WORKSHOP
TOPIC: CELL DIVISION

SEPTEMBER 5-7, 2021
NO REGISTRATION FEE

OPEN FOR ALL
REGISTER NOW

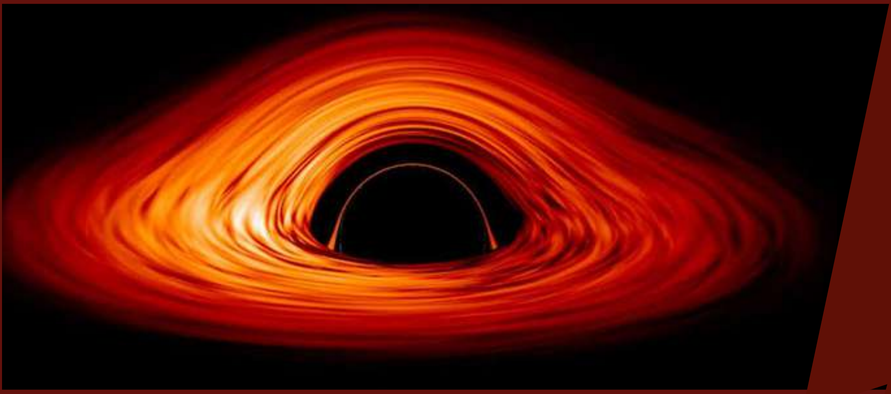

ব্ল্যাকহোল

"মহাশূন্যের নক্ষত্রপুঞ্জ ও কৃষ্ণগহ্বর অতিকথন"

আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে, "রহস্যই সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যের প্রতীক। এই অনুভূতির সাথে যার পরিচয় ঘটেনি, অনন্ত রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যার মন অপার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয় না, ধরে নিতে হবে তার চোখ এবং মন দুইয়েরই মৃত্যু হয়েছে।"

মহাকাশ হলো এক বিশাল রহস্যের আধার। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, তারা, উল্কা, ধুমকেতু, পালসার, কোয়েসার, ব্ল্যাক হোল, ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি, এলিয়েন... কি নেই মহাকাশে! প্রাচীনকাল থেকেই মহাকাশ নিয়ে অনেক অনুসন্ধানের ফলে আমরা বিভিন্ন নক্ষত্রের পরিচয় ও পরিণতি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি।

নক্ষত্রের জন্ম ও বিবর্তনঃ

সাধারণত মহাকাশে অবস্থিত যেসকল বস্তু নিজের অভ্যন্তরে থাকা পদার্থকে জ্বালিয়ে ফিউশন বিক্রিয়া ঘটাতে পারে এবং আলোক উজ্জ্বল হয় তাদেরকে নক্ষত্র বলে। বৃহৎ পরিসরে তারা বা নক্ষত্র বলতে মহাশূন্যে প্লাজমা দশায় অবস্থিত অতি উজ্জ্বল এবং সু-বৃহৎ গোলাকার বস্তুপিণ্ডকে বোঝায়। উচ্চ তাপে তারা নিউক্লিয় সংযোজন ক্রিয়ার (ফিউশন) মাধ্যমে ক্রমাগত নিজের জ্বালানি উৎপন্ন করে। নিউক্লীয় সংযোজন থেকে উদ্ভূত তাপ ও চাপ মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনকে ঠেকিয়ে রাখে।জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে একটি তারার মৃত্যু হয়ে শ্বেত বামন অথবা নিউট্রন তারা আবার কখনো কৃষ্ঞবিবরের সৃষ্টি হয়। নক্ষত্রের জন্ম হয় নেবুলায়। নেবুলা হচ্ছে পাতলা গ্যাসের মেঘ। গ্রাভিটির প্রভাবে গ্যাস জমে ঘন হলে তাপমাত্রা ও ঘনত্ব বেড়ে যায়।যখন এ তাপমাত্রা দেড় কোটি সেলসিয়াস এ পৌছে যায় তখন ফিউশন বিক্রিয়া ঘটে। আর এর সাথেই নক্ষত্রের আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়। পৃথিবী হতে সবচেয়ে কাছের তারা হচ্ছে সূর্য। তারা জ্বলজ্বল করার কারণ হচ্ছে, এর কেন্দ্রে নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা তারার পুরো অভ্যন্তরভাগ পার হয়ে বহিঃপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত হয়। হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম অপেক্ষা ভারী প্রায় সকল মৌলই তারার কেন্দ্রে প্রথমবারের মত উৎপন্ন হয়েছিল। মহাবিশ্বের শুরুর দিকে বিশাল ভরবিশিষ্ট তারারা জন্মগ্রহণ করত। এরপর জন্মানো শুরু করে মাঝারি আকৃতির তারাসমূহ (আমাদের সূর্যের মত) এবং শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাগুলো জন্মাবে। মহাবিশ্বে তারার জন্মের জন্য যে পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস মজুদ আছে, তা আগামী কয়েক ট্রিলিয়ন বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর, আর কোন নতুন তারা জন্মাবে না।

রাতের আকাশের সকল তারার আলো তৈরি হচ্ছে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে।

নিম্ন ভরের তারাঃ

নক্ষত্রের নানা প্রকার রয়েছে। আর এ প্রকারভেদ হতে পারে আকার, ভর, উজ্জ্বল্য, তাপমাত্রা প্রভৃতির উপরে ভিত্তি করে। তবে সবগুলো ফ্যাক্টর নির্ভর করে একটিমাত্র ফ্যাক্টর এর উপরে, ভর। তারা যতখানি গ্যাস নিয়ে তৈরি হয় তাই ঠিক করে দেয় এর আকার, আকৃতি, উজ্জ্বলতা, তাপমাত্রা, এমনকি এর আয়ু।

প্রথমেই কম ভরের তারার কথা আলোচনা করা যাক। আমাদের গ্যালাক্সির প্রায় ৭০% নক্ষত্রই রেড ডোয়ার্ফ। সূর্যের সবথেকে কাছের তারার নাম প্রক্সিমা সেন্টুরাই।আমাদের থেকে সে মাত্র ৪.২ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং এটি একটি রেড ডোয়ার্ফ। এর ভর সূর্যের ৮ ভাগের এক ভাগ (১২%)।এরপর আছে ব্রাউন ডোয়ার্ফ, যাদের ভর হতে পারে আমাদের বৃহস্পতি গ্রহ থেকে ১৩-৭৫ গুন। এরা নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া করতে সক্ষম নয়। কারন এদের ভর অল্প এবং ফিউশনের জন্য যথেষ্ট তাপমাত্রা তৈরি করতে পারেনা। আমাদের সবথেকে কাছাকাছি ব্রাউন ডোয়ার্ফ এর নাম Luhman-16, যা দুটি ব্রাউন ডোয়ার্ফ এর

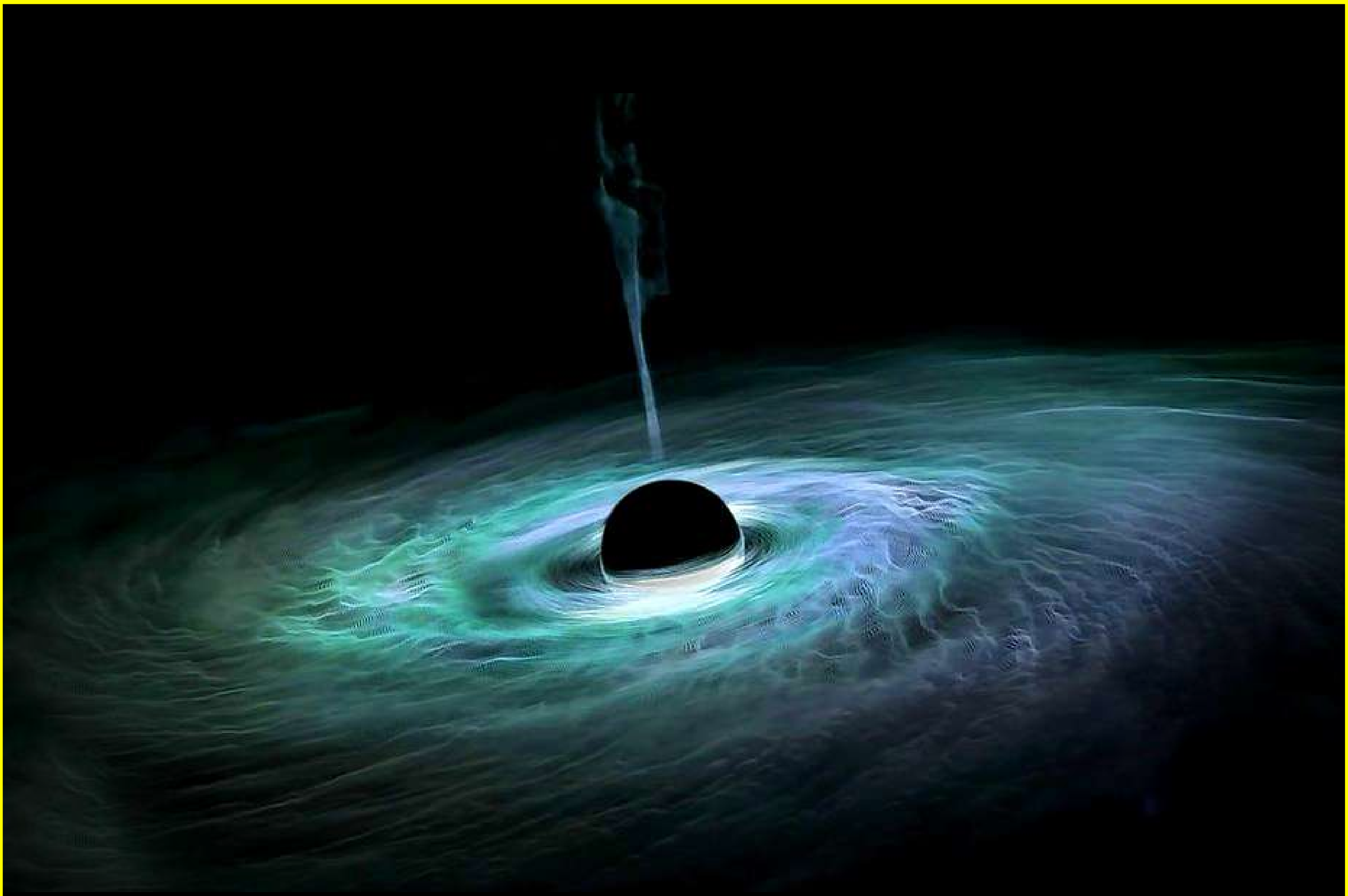

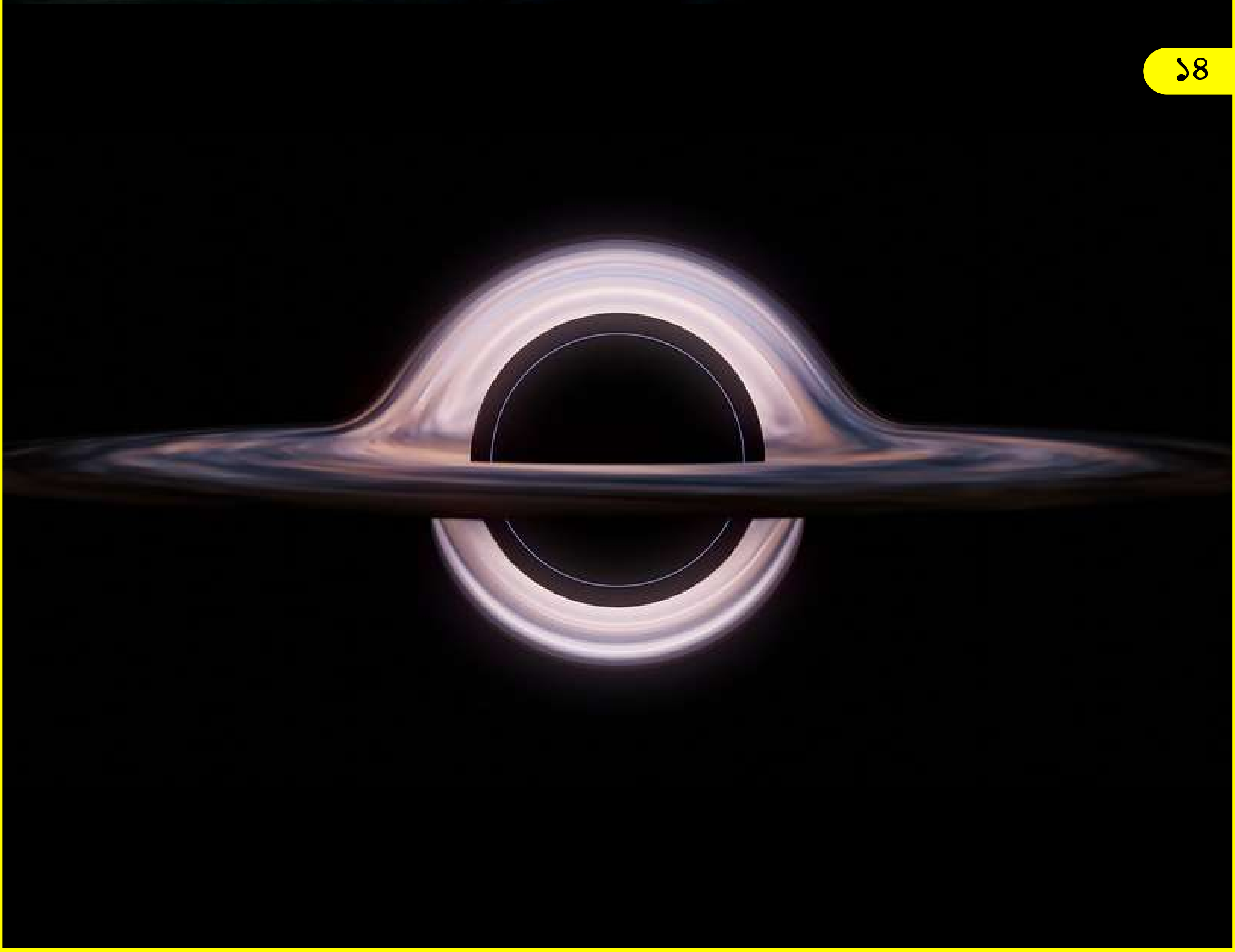

সমন্বয়ে তৈরি একটি বাইনারি সিস্টেম।

ছোট, তুলনামূলকভাবে শীতল, নিম্ন- ভরযুক্ত লাল বামনগুলি ধীরে ধীরে হাইড্রোজেন ফিউজ করে এবং কয়েকশো কোটি বছর বা তার বেশি সময় ধরে মূল সিকোয়েন্সে থাকবে, যেখানে বিশাল, গরম ও-টাইপ তারকারা কয়েক মিলিয়ন বছর পরে মূল অনুক্রমটি ছেড়ে চলে যাবে leave সূর্যের মতো একটি মাঝারি আকারের হলুদ বামন তারকা প্রায় 10 বিলিয়ন বছর ধরে মুখ্য অনুক্রমের উপর থেকে যাবে। সূর্যটিকে তার মূল অনুক্রমের মধ্যবর্তী স্থানে মনে করা হয়।

নিম্ন ভর নক্ষত্র হ'ল সবচেয়ে শীতল এবং ম্লান মেন সিক্যুয়েন্স তারকা এবং কমলা লাল বা বাদামি বর্ণের কম ভর তারারগুলি তাদের হাইড্রোজেন জ্বালানী খুব ধীরে ধীরে ব্যবহার করে যার ফলে এদের আয়ুষ্কাল ও বেশি হয়।

বেশি ভরের তারা:

নাক্ষত্রিক ক্রমবিকাশ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন নক্ষত্র সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়। নিম্নভর তারার তুলনায় দানব সাইজের ভারি, উজ্জ্বল তারার আয়ুষ্কাল কম হয় (যদিও কয়েক মিলিয়ন বছর), কারণ এদের শক্তির চাহিদা বেশি। সূর্যের চেয়ে ৫ গুণ ভারি তারার কেন্দ্রে শক্তি উৎপাদন করে কার্বন বা সি.এন.ও চক্র। এই সময় পৃষ্ঠ তাপমাত্রা হয় প্রায় ১২ থেকে ২০ হাজার কেলভিন পর্যন্ত। কয়েক কোটি বছরের মধ্যে এদের কেন্দ্রের সব হাইড্রোজেন নিঃশেষ হয়ে যায়।কেন্দ্র প্রচুর গরম থাকায় হিলিয়াম পুড়তে শুরু করে। এইসময় তারাটি লাল দানব/ Red Giant - এ পরিণত হয়। হিলিয়াম পোড়ানির ফলে ত্রি-আলফা পদ্ধতিতে কার্বন, নিয়ন, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি তৈরি করে। এ সময় কেন্দ্রের তাপমাত্রা হয়ে যায় প্রায় ৭০ কোটি কেলভিনের কাছাকাছি। একসময় ১০০ কোটি কেলভিনের কাছাকাছি পৌঁছালে সিলিকনের মতো ভারী পদার্থে পরিণত হয়। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় সূর্যের চেয়ে ১০ গুন ভারী তারার পৃষ্ঠ তাপমাত্রা হয় ৩০,০০০ কেলভিন। সাধারণত এইসব তারার অবস্থাও একই হয়ে থাকে। এইভাবে চলতে চলতে একসময় যখন কেন্দ্রে লোহা তৈরি হয় তখন কেন্দ্রিয় বিক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, এই সময় সমস্ত তাপ শোষণ হয়ে যায়। ফলে কেন্দ্রে বিরাট এর বিস্ফোরণ (Implosion) ঘটে এবং কেন্দ্রে সমস্ত ভর নিয়ে তারাটি চুপসে যায়। বাইরের গ্যাসীয় আবরণ প্রবল বেগে ছুটে যায়। এটি সুপারনোভা (SuperNova) বিস্ফোরণ। সুপারনোভা বিস্ফোরণ একটি চমৎকার মহাজাগতিক ঘটনা। সুপার নোভার বিস্ফোরণ প্রায়ই ঘটে থাকে। ১৯৮৭ সালে দক্ষিণের আকাশে একটি সুপারনোভা দেখা গিয়েছিল । ১০৫০ সালে চীনারা একটি সুপারনোভা দেখতে পেয়েছিলো যা ১৫ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো। এখন সেখানে ক্রেব বা কাঁকড়া নীহারিকার ঘাঁটি।

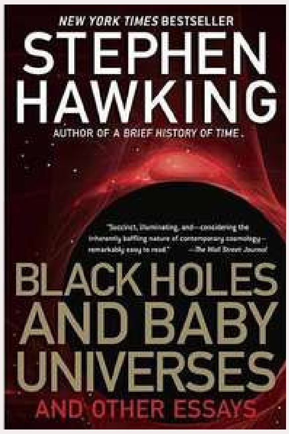
NEW YORK TIMES BESTSELLER

STEPHEN HAWKING

AUTHOR OF A BRIEF HISTORY OF TIME.

"Succinct, illuminating, and—considering the inherently baffling nature of contemporary cosmology—remarkably easy to read." —The Wall Street Journal

BLACK HOLES AND BABY UNIVERSES AND OTHER ESSAYS

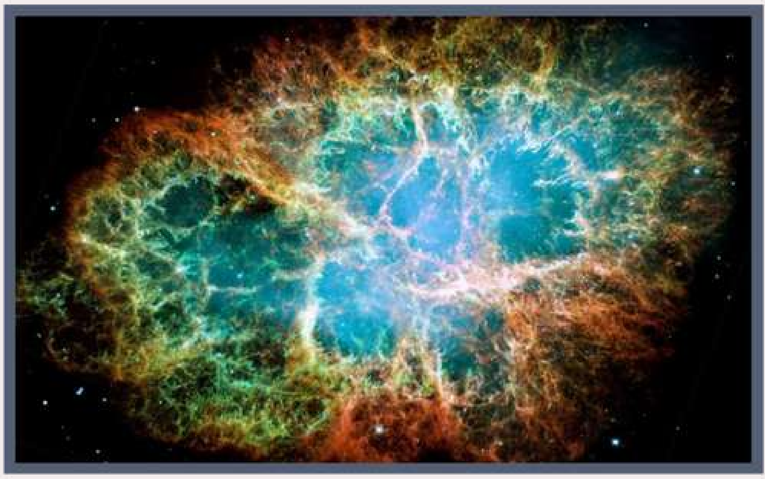

কাঁকড়া নীহারিকা

মহাজাগতিক গ্যাস এবং ধুলো মহাকর্ষীয় টানের ফলে একত্রিত হয়ে আদি-নাক্ষত্রিক অবস্থা (Prostar) গঠন করে। নিউক্লিয় ফিউশন শুরু হওয়া না পর্যন্ত নক্ষত্রটিতে মহাকর্ষীয় শক্তি সঞ্চিত হয় এবং এটি হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এরপর নক্ষত্রটির কেন্দ্রীয় আকার এবং ভর বাড়তে থাকে এবং সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের ফিউশন বিক্রিয়া যেমন হাইড্রোজেন ফিউশন, হিলিয়াম ফিউশন, কার্বন ফিউশন , অক্সিজেন ফিউশন ইত্যাদির মাধ্যমে নক্ষত্রের কেন্দ্রে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কমতে থাকে এবং একই সাথে অন্যান্য ভারী পদার্থের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

শেষ পর্যায়ে নক্ষত্রটির বাইরের স্তর গুলোতে হাইড্রোজেন পরিমাণ একদম কমে যায় এবং অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় স্থানে হাইড্রোজেন পরিবর্তে আয়রন এর পরিমাণ বেড়ে যায়। বেশি ভরের তারাগুলো তাদের জীবদ্দশায় এক পর্যায়ে "Red Giant" এ পরিণত হয়। তখন নক্ষত্রটি কমলা বর্ণের হয়ে যায়।

কম্পিউটার বিজ্ঞানী কেটি বোমে প্রথম কোনো কৃষ্ণবিবরের ছবি তুলেছিলেন।

বেশি ভরের তারাগুলোর উজ্জলতাও বেশি হয় বিধায় খালি চোখে এদেরকে ভালোভাবে দেখা যায় এবং প্রতিনিয়তই ফিউশন বিক্রিয়ার ফলে এরা ভর হারাতে থাকে। পরবর্তী সময়ে নক্ষত্রটি সাদা বর্ণ ধারণ করে এবং এর কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে নক্ষএটি বিস্ফোরিত হয়, যার পরবর্তী অংশগুলো নিউটন তারায় পরিণত হয় কিংবা নক্ষএটি ব্ল্যাকহোলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

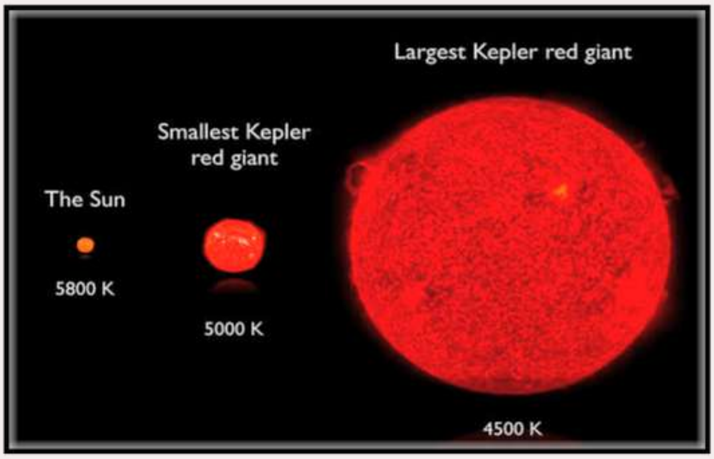

সূর্য ও লাল দানবের তুলনা

সাদা বামন তারা:

সাদা বামন তারাকে মূল ধারার নক্ষত্রদের ক্রমবিকাশের শেষ বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যাদের ভর নিউট্রন তারা কিংবা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যখন কোনো তারার কেন্দ্রের নিউক্লিয় জ্বালানি শেষ হয়ে যায় এবং কেন্দ্রের ঘনত্ব বদ্ধি পায় এবং একই সাথে ইলেকট্রনগুলো অধঃপতিত হয়ে কেন্দ্রের চাপ বৃদ্ধি করে তখন সে তারাটি সাদা বামন তারায় পরিণত হয়। সাধারণত এর অভ্যন্তরে কার্বন-অক্সিজেনের একটি গঠন থাকে, যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উপাদান যেমন, নিয়ন (Ne), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), হিলিয়াম (He) নিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সাদা বামন তারা গঠিত হয়। সাদা বামন তারার ব্যাস তার ভরের ঘনমূলের ব্যস্তানুপাতিক হয়। এদের ভর প্রায় সূর্যের ভরের সমান (1.98×10^{30}) কিন্তু ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের চেয়ে সামান্য কম, যার ফলে সাদা বামন তারার ঘনত্ব অনেক বেশি হয় (10^{9}gm/ccc) এবং চাপও বেশি হয় যা এটির মহাকর্ষীয় সংকোচনকে ঠেকিয়ে রাখে। যেহেতু এর অভ্যন্তরে কোন জ্বালানি শক্তি নেই তাই এর সমস্ত বিকিরণ আসে এর জমাকৃত তাপীয় শক্তি থেকে। সাদা বামন তারা গঠনকালে খুবই উত্তপ্ত থাকে প্রায় (১০০,০০০ কেলভিন পৃষ্ট তাপমাত্রা) যদিও সময়ের সাথে সাথে তাপ বিকিরণের মাধ্যমে এটি শীতল হয়ে পড়ে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় (আনমুানিক 13.8 বিলিয়ন বছরেরও বেশি সময়) পর হয়তো শীতল কালো বামনে পরিণত হবে, যদি ও কালো বামন তৈরি হওয়ার মত তাপমাত্রা আমাদের মহাবিশ্বের এখনো হয়নি। প্রথম আবিষ্কৃত তিনটি সাদা বামন তারা হলো 40 Eridani B, Sirius B, Van Maanen's Star যাদের একত্রে ক্লাসিক্যাল সাদা বামন তারা হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিউট্রন তারাঃ

সুপারনোভার পরবর্তী দশাই হলো নিউট্রন তারা বা কৃষ্ণবিবর (BlackHole)। তারার ভর সূর্যের ভর থেকে ১.৫ থেকে ৩ গুণের মধ্যে হলেই এটি নিউট্রন তারায় পরিণত হবে। এক্ষেত্রে চাপ ও ঘনত্ব খুব বেশি বেড়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে ইলেকট্রন প্রচন্ড বেগে চলাচল শুরু করে। একসময় ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের সাথে মিলে নিউট্রন তৈরি করে। নিউট্রন তারা আসলে একটা বিশাল বড় নিউট্রনের খন্ড। এর ঘনত্ব এতই বেশি যে এর এক চামচ পদার্থের ভর পৃথিবী তে হবে দশ কোটি টন। ১৯৬৭ সালে একটি নিউট্রন তারা আবিষ্কৃত হয় যা দ্রুত ঘূর্ণায়মান এবং বেতার সংকেত প্রেরণ করে। এধরণের নিউট্রন তারাগুলোকে বলা হয় পালসার। কাঁকড়া নীহারিকায় একটি পালসার আছে, যেটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হয়েছে। পাল সারের মেরু ও বিষুবীয় অঞ্চলের মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকে প্রায় ১০০০০ মিলিয়ন মিলিয়ন ভোল্ট। পালসার অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পর্যায় পুনরাবৃত্তি করে। ফলে মহাজাগতিক ঘড়ি হিসেবে এদের ব্যবহার করা যায়। যদি কোন জোড়া তারা ব্যবস্থায় নিউট্রন তারা থাকে, তাহলে অন্য তারা থেকে পদার্থ গুলি নিউট্রন তারায় ছুটে যায়। ফলে এক্স-রে পাওয়া যায়। এভাবে নিউট্রন তারা চিনতে পারা যায়।

ব্ল্যাকহোলঃ

ব্ল্যাক হোল তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও রহস্যময় বিষয়গুলোর একটি। ব্ল্যাকহোল হল মহাবিশ্বের এমন একটি বস্তু যা এত ঘন সন্নিবিষ্ট বা এর ক্ষুদ্র আয়তনে ভর এত বেশি যে এর মহাকর্ষীয় শক্তি কোন কিছুকেই এর ভেতর থেকে বের হতে দেয় না। এমনকি আলোও না। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানে সাধারণ মহাকর্ষীয় বলের মান এত বেশি হয়ে যায় যে এটি মহাবিশ্বের অন্য সকল বলকে অতিক্রম করে। ফলে এ থেকে কোন কিছুই পালাতে পারে না। জন মিচেল নামের এক ব্রিটিশ জ্যোর্তিবিদ ১৭৮৪ সালে প্রথম ব্ল্যাক হোলের সম্ভাবনার কথা বলেন। মিচেল এদের নাম দেন অন্ধকার নক্ষত্র। উনি দেখান যে যদি এমন নক্ষত্র থাকে, যার ঘনত্ব প্রায় সূর্যের মতো, কিন্তু যা আকৃতিতে সূর্যের ৫০০ গুণ বড়,

M-87 সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের ছবি

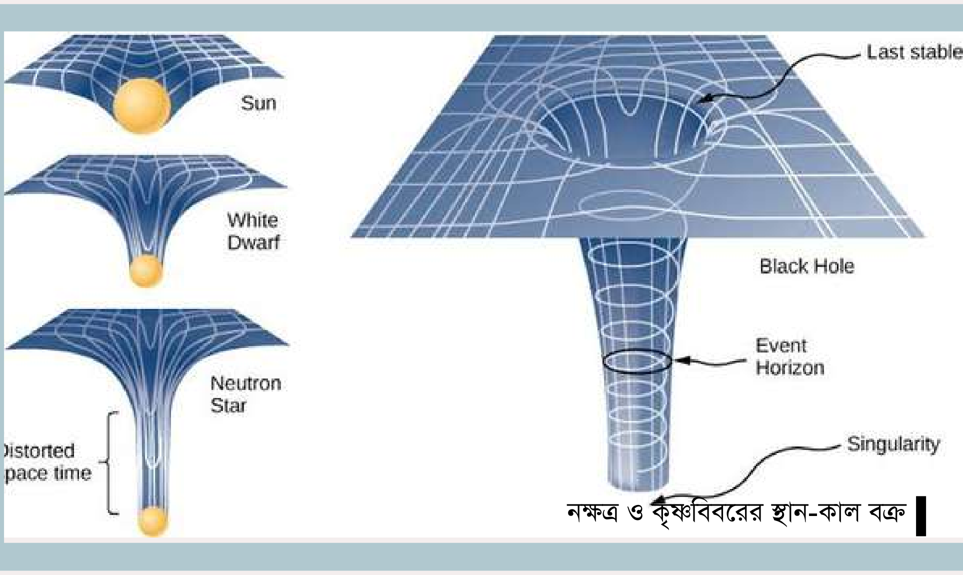

নক্ষত্র ও কৃষ্ণবিবরের স্থান-কাল বক্র

তাহলে তার পৃষ্ঠের মুক্তি বেগ আলোর গতির থেকে বেশি হবে। এবং এই বেগে কোনো গ্রহ বা নক্ষত্রের পৃষ্ঠের ওপর থেকে কোনো বস্তুকে ছুড়ে দিলে তা আর ওই গ্রহ বা নক্ষত্রে ফিরে আসবে না।

কৃষ্ণগহ্বর শব্দের অর্থ কালো গর্ত। এই নামের পেছনের কারণ হলো এটি এরদিকে আসা সকল আলোকরশ্মিকে নিজের দিকে শুষে নেয়। কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোন আলোকবিন্দুই ফিরে আসতে পারে না। এটা তৈরি হয় খুবই বেশি পরিমাণ ঘনত্ববিশিষ্ট ভর থেকে। কোন অল্প স্থানে খুব বেশি পরিমাণ ভর একত্র হলে সেটা আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। আমরা মহাবিশ্বকে একটি সমতল পৃষ্ঠে কল্পনা করি এবং মহাবিশ্বকে চিন্তা করি একটি বিশাল কাপড়ের টুকরো হিসেবে এবং তারপর যদি কাপড়ের উপর কোন কোন স্থানে কিছু ভারী বস্তু রাখি তাহলে যেইসব স্থানে ভারি বস্তু রয়েছে সেইসব স্থানের কাপড় একটু নিচু হয়ে যাবে।এই একই বাপারটি ঘটে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে। যেসব স্থানে ভর অচিন্তনিয় পরিমাণ বেশি সেইসব স্থানে গর্ত হয়ে আছে। এই অসামাণ্য ভর এক স্থানে কুন্ডলিত হয়ে স্থান-কাল বক্রতার সৃষ্টি করে। প্রতিটি গালাক্সির স্থানে স্থানে কম-বেশি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিতের কথা জানা যায়। সাধারণত বেশীরভাগ গ্যালাক্সিই তার মধ্যস্থ কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণয়মান।

মহাশূন্য সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষের কৌতূহলের বিষয়। প্রত্যেক সভ্যতা ও মানুষ সবসময় মহাকাশকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখেছে।

আমাদের এই মহাবিশ্ব বেশ অদ্ভুত আর রহস্যে ঘেরা। পৃথিবী নামের গোল বলের উপরিভাগে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন রকমের গাছপালা, আর চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে প্রাণীরা। প্রায় গোলাকৃতির এই বলের ওপর পাহাড় আছে, আছে সমুদ্র। আবার এই বল মানে পৃথিবীর বাইরের দুনিয়া তো আরও জটিল। মহাশূন্য সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষের কৌতূহলের বিষয়। প্রত্যেক সভ্যতা ও মানুষ সবসময় মহাকাশকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখেছে। প্রাচীন সভ্যতা সমূহ ও মানুষেরা মহাশূন্যের ব্যাপারে নানা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিত। পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছে বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র ও অন্যান্য বামন গ্রহ , নীহারিকা, ধূমকেতু ও কৃষ্ণগহ্বর ।বিজ্ঞান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে শক্তিশালী কৃত্রিম উপগ্রহ, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ইত্যাদি। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাবিশ্বকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। তবে মহাবিশ্বের অনেক কিছুই আমাদের কাছে এখনো অজানা। বিজ্ঞানীরা সেসব নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছুই জানতে পারব বলে আশা করা যায়।

সোর্সঃ
"Space exploration | History, Definition, & Facts | Britannica"
"Black Holes | Science Mission Directorate"
“BBC News বাংলা "

লেখায়ঃ
নুসরাত জাহান
ইমতিয়াজ উদ্দিন
অপূর্বা চৌধুরী

পরের সংখ্যাগুলোতে যা আসতে চলেছে...

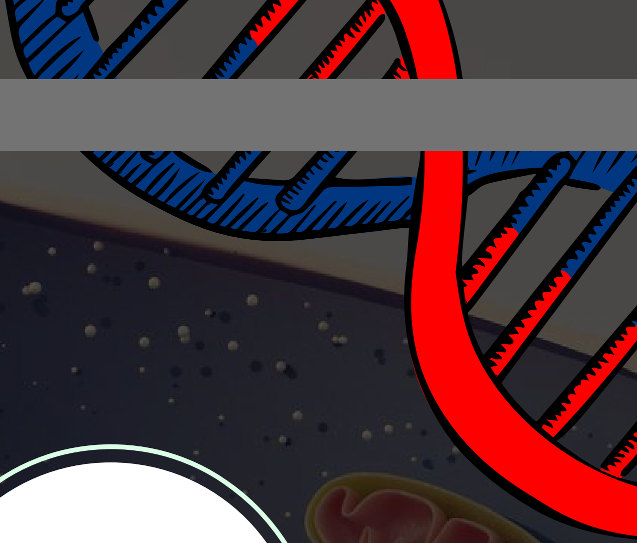

জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের প্রিপারেশন সিরিজ

দেশের অন্যান্য অলিম্পিয়াডের তুলনায় জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড মতোই অনেক তরুণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে বেশ অচেনা। অথচ প্রতি বছর-ই যেমন জাতীয়ভাবে এই অলিম্পিয়াড আয়োজিত হচ্ছে, তেমন-ই আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকেও আসছে সাফল্য। নতুন প্রজন্মের মাঝে জীববিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে ও আগামীদিনের জীববিজ্ঞানী খুঁজে আনা-ই এই অলিম্পিয়াডের মূল লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্য পূরণে-ই হোয়াইট অরিজিন্সের এই সিরিজ।

জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে ভালো করতে প্রয়োজনীয় প্রিপারেশন-সাজেশন দেওয়া হবে এই সিরিজে। আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, সকল পর্যায়ের প্রশ্ন নিয়ে বিস্তর আলোচনা এবং তুমি কেমনে হতে পারো পরবর্তী অলিম্পিয়াডের চমক, তা নিয়ে গাইডলাইন। সিরিজটি শুরু হতে যাচ্ছে পরবর্তী সংখ্যা থেকে, তাই খুব দ্রুত-ই দেরি না করে নিচের ঠিকানাগুলোতে আমাদেরকে জানিয়ে দাও কি কি চাও তা নিয়ে তোমাদের বিস্তারিত মতামত।

ইমেইলঃ whiteorigins.wbsc@gmail.com

কী, কেন, কীভাবে?

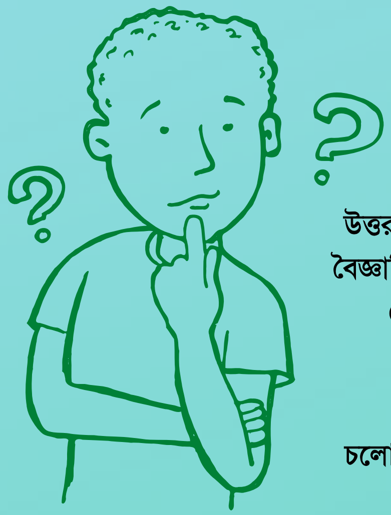

ম্যাগাজিনের এই অংশে থাকছে তোমাদের বেশ কিছু প্রশ্নের জবাবে আমাদের এক্সপার্ট প্যানেলের উত্তরসমূহ। কী কী ধরণের প্রশ্ন হতে পারে, তার কিন্তু কোনো শেষ নেই। তোমাদের কিশোরমনে যতরকম বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তার সব রকমের প্রশ্নেরই উত্তর থাকবে। আর যদি তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেখতে চাও ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে, তাহলে এখনই ই-মেইল করে তোমার প্রশ্ন পাঠিয়ে দাও!

(ই-মেইলের ঠিকানাঃ *whiteorigins.wbsc@gmail.com*, **মেইলে নাম, শ্রেণী, বিদ্যালয়ের নাম লিখবে)**

চলো দেখে নেওয়া যাক তোমার মত কিশোর-কিশোরীরা কী প্রশ্ন করেছে এবং জেনে নেওয়া যাক উত্তরও!

১) হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান হলে, আমরা কি কোনো কাজ করতে পারতাম না?

-নূরে ওয়াকিয়া
এসএসসি পরীক্ষার্থী, ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তরঃ না,পারতাম না। আমাদের হাতের আঙ্গুলগুলি কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে আজ এমন একটি রুপ নিয়েছে।আমাদের হাতের পাঁচ আঙ্গুলের উচ্চতা সমান নয় বলেই আমরা সুন্দরভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারি। যদি আমাদের ছবি আঁকতে ইচ্ছা হয় কিংবা কোনো গোল বস্তু হাতে নিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমরা অনায়াসে তা আঁকতে পারি কিংবা নিতে পারি কারণ আমাদের হাতেয় পাঁচ আঙ্গুল আমাদেরকে এই কাজে সবচেয়ে বড় সাহায্য করে। মনে করো তুমি খুব ছোট একটি সুতার টুকরো হাতে নিতে চাও কিন্তু তোমার হাতের সকল আঙ্গুলের উচ্চতা যদি সমান হতো, তাহলে সুতাটি তোমার পক্ষে নেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম হতো।তুমি সুতাটি ধরতে পারলেও সুতাটি হাতের মধ্যে শক্তভাবে ধরতে পারতে না।তেমনি ক্রিকেট খেলার সময়ও যদি বল করতে চাও তাহলে সমান উচ্চতার হাতের আঙ্গুল তোমাকে তেমন একটা সাহায্য করবে না। তাই দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ করতে আমাদের হাতের পাঁচ আঙ্গুলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

আঙুলগুলোর আকার আমাদের প্রয়োজনেই ভিন্ন।

halange
Medial Phalange
Proximal Phalange
Phalang
Metacarpal Bo
Carpal Bon
Radius
Ulna

২) উঠতি বয়সে শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আমি চুল পড়া ও ব্রণ এর ব্যাপার টা বেশি ফেইস করি কেন? এটা কি হরমোনাল কোন প্রব্লেম?

-আফরোজা সুলতানা মনি
এসএসসি পরীক্ষার্থী, ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তরঃ ব্রণ ত্বকে অতিসক্রিয় তেল গ্রন্থি এবং তেল, মৃত ত্বকের কোষ, এবং ব্যাকটেরিয়া একটি বিল্ড আপ দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং ত্বকে প্রদাহ তৈরি করে যাকে ব্রণ বলে। বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনগুলি সক্রিয় হয়ে উঠলে তেল গ্রন্থি উদ্দীপিত হয়, এ কারণেই কিশোর বয়সে লোকেরা ব্রণ হওয়া সম্ভাবনা থাকে। কারণ ব্রণ বিকাশের প্রবণতা আংশিক জেনেটিক।চুল পড়া একেবারেই সাধারণ। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, একজন ব্যক্তির পক্ষে প্রতিদিন 100 স্ট্র্যান্ড চুল হারানো একেবারেই সাধারণ। কৈশোরে অস্বাভাবিক চুল পড়ার মূল কারণ দেখা যায় পুষ্টি অভাব। তাছাড়া একজন ব্যক্তি অসুস্থ হতে পারেন বা কিছু ওষুধ বা চিকিৎসাও (যেমন কেমোথেরাপি) চুল পড়াও ঘটায়। কিছু চুলের স্টাইল এবং স্টাইলিং পণ্যগুলি চুলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

৩) আমাদের এই কৈশোর বয়সে আমরা আমাদের আবেগ কে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা কেন?

-আফরোজা সুলতানা মনি
এসএসসি পরীক্ষার্থী, ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তরঃ উঠতি বয়সে ব্রেইনের হরমোন নি:সরণ হবার জায়গাগুলো অপরিপক্ক থাকে। এগুলা পরিপক্ক হওয়ার কাজ হয় কৈশোরে; অর্থাৎ উঠতি বয়সে। তখন আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন (টেস্টোস্টেরন, এস্ট্রোজেন, থাইরয়েড ইত্যাদি) নি:সরণের ওঠানামা হয়ে থাকে; যার কারণে আবেগ নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পরে। কৈশোর পার করতে করতে মস্তিষ্কের হরমোন নি:সরণকারী অংশগুলো (হাইপোথ্যালামাস, এমিগডালা, থ্যালামাস ইত্যাদি) পরিপক্ব হয়ে ওঠে। এবং নিজের আবেগের ওপরেও ব্যক্তি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

৪) তেলাপোকার মাথা কেটে শরীর থেকে আলাদা করে ফেলা হলেও সে কিভাবে আরো কয়েকদিন বেঁচে থাকতে পারে?

-নাজিফা গওহার
একাদশ শ্রেণী, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

উত্তরঃ তেলাপোকার ক্ষেত্রে তার রক্তচাপ, খাদ্যাভ্যাস, হৃদযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ এমনকি শরীরের রক্ত সরবরাহকারী কোষগুলোর সংযোগও মাথার সঙ্গে সংযুক্ত না হওয়ায় তেলাপেকার মাথা কাটা গেলে তার গলার কাছে খুব সহজেই রক্ত জমাট বেঁধে যায় ফলে অন্য কোনো তেলাপোকা তাকে খেয়ে না ফেলা বা পিঁপড়ার দল চেপে না বসা পর্যন্ত তার দেহ থেকে প্রাণ যায় না। তবে মাথা কাটা যাওয়া তেলাপোকার শরীর ২০ দিনের মধ্যে ব্যাক্টেরিয়া অথবা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়েই আস্তে আস্তে এর মৃত্যু হয়।

৫) কুকুরদের ভাষা থাকা না সত্ত্বেও মানুষদের দেওয়া নির্দেশ তারা বুঝে কীভাবে?

-মুহাম্মদ জাওহার চৌধুরী
এসএসসি পরীক্ষার্থী, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তরঃ বুদাপেস্টের Eotvos Lorand University -এর একদল স্নায়ুবিজ্ঞানীর গবেষণার মতে, মানুষ যেভাবে শব্দ ও স্বরের ওঠানামা দিয়ে অন্যের ভাষা বুঝতে পারে কুকুরও সেটা করতে সক্ষম।মানুষ যেমন মস্তিষ্কের বাম অংশ দিয়ে উচ্চারিত শব্দ বুঝতে পারে এবং ডান অংশ দিয়ে বুঝতে পারে স্বরের ওঠানামা ও ইঙ্গিতের অর্থ।কুকুরও এদুটো কাজে মস্তিষ্কের বাম ও ডান অংশকে অবিকল মানুষের মতোই ব্যবহার করে থাকে। এভাবে তারা মানুষের ইঙ্গিত বুঝতে সক্ষম হয়।

৬) অমর কোন জীব কি পৃথিবীতে আছে?

-নাবিল বিন সাঈদ
এসএসসি পরীক্ষার্থী, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তরঃ এখন পর্যন্ত একটিমাত্র অমর জীবই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সেটি হলো এক প্রকার জেলিফিশ যার বৈজ্ঞানিক নাম *Turritopsis dohrnii*. ১৮৮৩ সালে ভূমধ্যসাগরে প্রথম এই প্রাণীটির সন্ধান পায় বিজ্ঞানীরা। এটি মাত্র ৪.৫ মিলিমিটার লম্বা। ডিম ফুটে প্রথমে এর প্লানুলা লার্ভা দশা তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে পলিপ ও পলিপ থেকে মেডুসা দশায় পৌঁছায়।

যখনই এর কোষগুলো জরাগ্রস্থ হয় তখনই এটি পলিপ দশায় ফেরত যায়। অর্থ্যাৎ পুনরায় কোষগুলোর নবায়ন করতে পারে। মাসল সেলগুলো পরিবর্তিত হয় স্পার্ম বা ডিম্বাণুতে। নার্ভ রূপান্তরিত হয় মাসল সেলে। আর এভাবেই এটি দেহের টিস্যুর বুড়িয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ঠেকিয়ে অমর হয়ে থাকে।

তবে এই কোষবদলের ক্ষমতা তারা পায় পূর্ণবয়স্ক অবস্থায়।এর আগেই যদি কোনো প্রাণী এদের ভক্ষণ করে তবে তাদের মৃত্যু হবে।

Turritopsis dohrni বা 'ইমমোর্টাল জেলিফিশ'।

৭) সম উচ্চতার ছেলের থেকে মেয়েদের লম্বা লাগে কেন?

-রাগীব মাজেদ চৌধুরী
এসএসসি পরীক্ষার্থী, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

একটা মেয়ে পাঁচ ফুট হলেই খাম্বা বলে,
একই উচ্চতায় একটা ছেলেকে বলে লিলিপুট, কারণ হলো কাধঁ আর মাসল ফর্মেশন।
একটা ছেলের কাধঁ প্রশস্ত হয়, মাসল হয় মোটা মোটা,পাশে বাড়ন্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটাই স্বাভাবিক। ছেলেদের মাসল ফর্মেশন হাতের কাছে হয়। তাদের বাইসেপ ট্রাই সেপ থাকে বড় এবং
সাথে থাকে কাধঁ আর কার্ভড ব্রেস্ট, এই পুরাটা মাসল, অন্যদিকে সাধারণত সমউচ্চতার মেয়েদের শরীর সে তুলনায় কাধঁ ছোট, মাসল কম, বডি স্ট্রাকচার পাতলা টাইপের হওয়ায় বেশ চিকন দেখায়। মূলত শারীরিক গঠনের ভিন্নতার জন্য সমউচ্চতার একটি ছেলের তুলনায় সমউচ্চতার একটি মেয়েকে বেশি লম্বা দেখায়। মস্তিষ্ক যখন একজন পুরুষকে দেখে, তখন উচ্চতার চেয়ে প্রশস্ততাকে বেশি প্রক্রিয়া করে।

উচ্চতা কনসার্নে নেয় না, মস্তিষ্ক একটা পুরুষকে তার মাসল দিয়ে বিচার করে, হোক মস্তিষ্কটা পুরুষের বা মহিলার! সবাই পুরুষের মাসল দিয়ে বিচার করে, প্রকৃতপক্ষে এটা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

এছাড়াও আদিকাল থেকে তাকেই বেশি মূল্যায়ন করা হয় যে বেশি শক্তিশালী। কারণ টিকে থাকতে হলে শক্তি আবশ্যক। এই জিনিসটা এখনো আমরা জিনে রয়ে গেছে, কারণ আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এভাবেই বিচার করে এসেছেন। আদি কাল থেকেই ছেলেদের কে পাওয়ার হাউজ মনে করা হতো, অথচ মেয়েদের মনে করা হতো ফার্টিলিটি জোন অনলী। মেয়েদের শরীর কতো সুন্দর এটাই মুখ্য। এই বিষয়টা বিচার করতে গিয়ে মস্তিষ্ক অনেক খুঁটিয়ে দেখে, যার কারণে সামান্য লম্বা হলেই মস্তিষ্ক সেটাকে অনেক লম্বা ধরে বসে থাকে।
মজার বিষয় হলো দুইজনকে পাশে দাড় করানো হলে মস্তিষ্ক আর যুক্তি খুঁজে পায় না, যখন ছেলে-মেয়ে সমান সমান দুজনই তখন এটাকে দেখার ভুল বলে চালিয়ে দেয়।

৮) Whitehole এর অস্তিত্ব কি সত্যিই আছে?

-কাজী ছদরুল্লাহ রাকিব
এসএসসি পরীক্ষার্থী, কলেজিয়েট স্কুল

উত্তরঃ হোয়াইট হোল হলো ব্ল্যাক হোলের বিপরীত। ব্ল্যাক হোল সবকিছুকে নিজের ভিতরে টেনে নেয় আর হোয়াইট হোল সবকিছুকে তার ভিতর থেকে বাইরে বের করে দেয়।এজন্য এটি খুব উজ্জ্বল।হোয়াইট হোল সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্রগুলোর একটি সম্ভাব্য সমাধান। এই তত্ত্বানুসারে যদি মহাবিশ্বে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব থাকে তাহলে হোয়াইট হোলও থাকা উচিত। গাণিতিক ভাবে হোয়াইট হোলের অস্তিত্ব প্রমাণ করা গেলেও বাস্তবে এর কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। কারণ এটি তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের বিরোধিতা করে। দ্বিতীয় সূত্র বলতে তাপগতীয় ব্যবস্থা হয় স্থির থাকবে না হয় বৃদ্ধি পাবে কিন্তু হ্রাস পাবে না।কিন্তু নতুন গবেষণা বলছে যদি “লুপ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি”- তত্ত্বটি যদি সত্যি হয় তাহলে হোয়াইট হোলের অস্তিত্বও সত্যি হতে পারে- এমনকি হোয়াইট হোল দেখার সম্ভাবনাও আছে। ব্ল্যাকহোল নিয়ে যে বিতর্কগুলো রয়েছে, তাঁর একটি সমাধান হতে পারে এই হোয়াইট হোল। কিন্তু এখনো অব্দি এই পুরো ব্যাপারটা একটি হাইপোথিসিস। প্রমাণিত সত্য নয়।

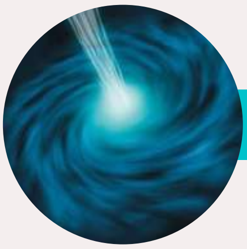

শিল্পীর কল্পনায় 'হোয়াইটহোল'

৯) চার্জ দিয়ে মোবাইল কিংবা অন্য ডিভাইস চালালে তা বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?

-মুহাম্মদ জাওহার চৌধুরী
এসএসসি পরীক্ষার্থী, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তরঃ "চার্জ দিয়ে মোবাইল চালালে তা বিস্ফোরিত হয়ে যাবে", এমন কথা আমরা সকলেই কমবেশি শুনেছি এবং অনেকে হয়তো তা সঠিক বলেই মনে করি। কিন্তু এই কথা ঠিক কতখানি সত্য? চার্জে চালানোর সময়

মোবাইল বিস্ফোরণ হয় এমন যুক্তির উৎপত্তি ২০১৩ সালে চীনের একজন ফ্লাইট এটেন্ডেন্ট থেকে, যাঁর আইফোন ৪ চার্জে দিয়ে চালানোর সময় হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়।কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায়, তিনি আইফোনের বক্সে থাকা কিংবা অফিশিয়াল চার্জারের জায়গায় অন্য নিম্নমানের চার্জার ব্যবহার করছিলেন এবং মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই ধরা হয়, বিস্ফোরণের কারণও সেই ভিন্ন চার্জারটি। সুতরাং মোদ্দাকথা হচ্ছে যে, আপনার ডিভাইস ব্যাটারি এবং চার্জার যদি অনুমোদিত ও অফিশিয়াল ব্র্যান্ডের হয়,তবে তা চার্জ দিয়ে চালালে বিস্ফোরণের আশংকা নেই বললেই চলে।তাই এবার চার্জ দিয়ে মোবাইল চালানোর আগে চার্জারটি চেক করতে ভুলবেন না!

চার্জে চালানোয় বিস্ফোরিত হওয়া সেই আইফোন ৪

১০) আলোর ভর না থাকা সত্ত্বেও আলোর উপর ব্ল্যাকহোলের মাধ্যাকর্ষণ কাজ করে কেন?

-নাবিলা আফনান
এসএসসি পরীক্ষার্থী, ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তরঃ একটি ব্ল্যাকহোল নিজে কোনো আলো দেয় না। এজন্য একে কৃষ্ণ গহ্বর বলা হয়। তবে যে বস্তুটি ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি রয়েছে তা মহাকর্ষের প্রতিক্রিয়ায় আলো দিতে পারে। একটি কৃষ্ণগহ্বর স্থানের এমন একটি অঞ্চল যেখানে মধ্যাকর্ষণ এতটাই শক্তিশালী যে ব্ল্যাকহোলের ভেতর থেকে কিছুই বের হতে পারে না। এমনকি আলোও না। শুনতে অবাক লাগতে পারে যে মধ্যাককর্ষণ বল আলোককে প্রভাবিত করতে পারে যদিও আলোর কোন ভর নেই। মহাকর্ষ যদি নিউটনের সাধারণ সার্বজনীন মধ্যাকর্ষন নিয়ম মেনে চলতো তাহলে আলোর উপর সত্যই মহাকর্ষের কোন প্রভাব থাকতো না। তবে বাস্তবে মহাকর্ষ সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বর চেয়ে আরও আধুনিক নিয়ম মেনে চলে। জেনারেল রিলেটিভিটি তত্ত্ব অনুযায়ী গ্র্যাভিটির কারণে স্থান আর সময় (স্পেসটাইম) বেকে যায়। পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রে তা বোঝা দুষ্কর,যেহেতু এখানকার গ্র্যাভিটি খুব দুর্বল।কিন্তু ব্ল্যাকহোলের অচিন্তনীয় মধ্যাকর্ষণের কারণে তার ধারে কাছে দিয়ে যাওয়া আলো এমনভাবে বেকে যায় যে তা সরাসরি ব্ল্যাকহোলেই প্রবেশ করে।আর ফেরত আসতে পারেনা।

এখন প্রশ্ন হলো আলোর তো ভর নেই, তাহলে তাঁকে ব্ল্যাকহোল কিভাবে আকর্ষণ করে? আলোর ভর নেই ঠিকই কিন্তু যা বললাম, ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণে স্পেসটাইম (স্থান আর সময়) বেকে যায়। আলোর ধর্ম চলার পথের সবচেয়ে ছোট রাস্তাটা নেওয়া।এখন আলো যে ব্ল্যাকহোলের কাছ দিয়ে যে স্পেস্টাইম দিয়ে যাচ্ছে, তা নিজেই বেকে আছে, আলোও তারসাথে সাথে তাই বেকে যায়।আর ফলাফল? আলোও ব্ল্যাকহোলের ভেতর ঢুকে চিরতরে হারিয়ে যায়!

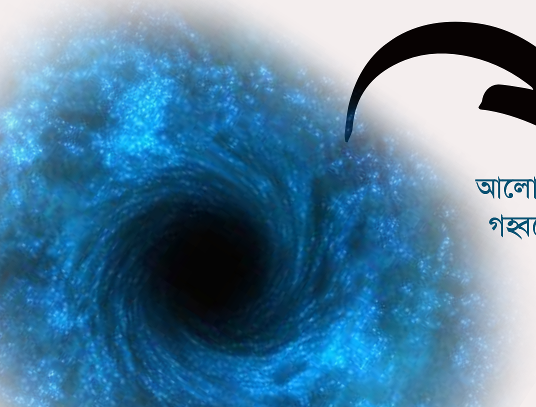
আলো পর্যন্ত বাঁচে না কৃষ্ণ গহ্বরের আকর্ষণ থেকে!

১১) গিরগিটি রং বদলায় কেন?

-মোবারক হোসেন
দশম শ্রেণী, গভ.মুসলিম হাই স্কুল

উত্তরঃ গিরগিটি নিজের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ তৈরি করতে পারে না, তাই ত্বকের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি জুতসই তাপমাত্রা ধরে রাখে। তাছাড়া পরস্পরের সাথে যোগাযোগের জন্যও গিরগিটি রঙ বদলিয়ে থাকে।

১২) একজায়গায় অনেকক্ষণ বসে থাকলে অনেক সময় পা ঝিমঝিম করে কেন?

-সিদরাতুল মুনতাহা ছানিয়া
এসএসসি পরীক্ষার্থী, ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তরঃ সাধারণত হাত বা পায়ে লম্বা সময় ধরে চাপ পড়লে এক ধরনের অসার অনুভুতির সৃষ্টি হয় যাকে আমরা ঝি ঝি করা বলি।

আমাদের সারা দেহে নিউরন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যারা প্রতি নিয়ত মস্তিষ্ক এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে থাকে। হাত বা পায়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য চাপ পড়লে স্নায়ু এবং রক্তনালিতে বাধা সৃষ্টি হয়। স্নায়ুতে চাপ পড়ার ফলে ওই স্থান থেকে যেসব তথ্য সংকেত মস্তিষ্কে যাওয়ার কথা তা বাধাগ্রস্ত হয়।আবার হৃদপিণ্ড থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ওই স্থানে আসতে পারে না।

কিছুক্ষণ পর চাপ সরে গেলে হঠাৎ করে সেই অংশের রক্তনালিতে অক্সিজেন সরবরাহ বেড়ে যায় আর সেই জায়গার স্নায়ু মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়। মস্তিষ্ক হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার হঠাৎ ফিরে আসা সংবেদনকে ভুল করে এক ধরনের পিনপিনের মতো অনুভূতি দেয়।ফলে আমাদের সাময়িক হাত পা ঝি ঝি করে।

১৩) রোদের মধ্যেও বৃষ্টি হয় কেন?

-হাসপিয়াত তোরাবি
একাদশ শ্রেণি, বাকলিয়া সরকারি কলেজ

উত্তরঃ রোদ আর বৃষ্টি একসাথে হওয়াকে বলে সৌরঝর্ণা।

কোনো স্থানে সৌরঝর্ণা হওয়া মানে হলো সেই স্থান থেকে বেশকিছুটা দূরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির কণাগুলোর বেগ বাতাসের বেগের চেয়ে কম হওয়ায় প্রবল বাতাসের সাথে সাথে বৃষ্টি এমন একটি অঞ্চলে প্রবাহিত হয় যেখানে কোনো মেঘ নেই।এর ফলে রোদ-বৃষ্টি একসাথে হতে পারে। আবার অনেক সময় সৌরঝরণা হয় যখন আকাশে খন্ড খন্ড মেঘ থাকে।তখন খন্ড খন্ড মেঘের মধ্য দিয়েও সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারে।ফলে রোদ ও বৃষ্টি একই সাথে দেখা যায়।

অর্থ্যাৎ, সৌরঝর্ণা হয় মূলত বায়ুমণ্ডলে টুকরো টুকরো মেঘের উপস্থিতির জন্য। তাপমাত্রার ভিন্নতার জন্য বায়ুমণ্ডলের কিছু স্থানে মেঘ জমতে থাকে আর কিছু স্থানে মেঘ জমতে পারে না। এই সময় বায়ু উলম্বভাবে চলে এবং যে অংশের তাপমাত্রা বেশি ও আর্দ্রতা কম সেই স্থানের বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে।এই প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে। আবার যে স্থানে বায়ুর আর্দ্রতা বেশি এবং তাপমাত্রা কম সেই স্থানে মেঘ জমতে পারে না।একারণে বায়ুমণ্ডলের কিছু কিছু স্থানে মেঘ থাকে না; ফলে রোদ-বৃষ্টি একসাথে দেখা যায়। অর্থাৎ, রোদের মধ্যেও বৃষ্টি হয়।

তবে সূর্য যদি একদম মাথার উপর থাকে তখন এই ঘটনা দেখা যায় না। সৌরঝরণা দেখা যায় মধ্যাহ্নের দিকে যখন সূর্য দিগন্তে কম আলো দেয়। এই সময় সূর্যের অবস্থানের জন্য মেঘের ফাঁকে দিয়েও সূর্যের আলো দেখা যায়। সৌরঝর্ণা এর কারণে অনেক সময় আকাশে রংধনুও দেখা যায়।

১৪) কথা বেশি বললে মুখ ব্যাথা হয় না কেন?

-হালিমা সামিয়া
একাদশ শ্রেণি, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

উত্তরঃ যারা বেশি কথা বলে তারা ছোট থেকেই টকেটিভ কিংবা কথ্যপ্রিয়; তাই মাসল গুলো অনেক খোলা হয়, যেমন-প্রতিদিন ব্যায়াম করলে মাসল খুলে তেমন।

এটা লাইফ টাইম প্রসেস তাই মাসল ক্লান্ত হয়ই না। আর একারণেই কথা বেশি বললে মুখ ব্যথা হয় না।

১৫) আকাশ মেঘলা হলে মাইগ্রেন এর ব্যাথা বেড়ে যায় কেন?

-হালিমা সামিয়া
একাদশ শ্রেণি, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

উত্তরঃ ব্যারোমেট্রিক চাপ বলতে বাতাসের চাপ বা বাতাস থেকে আপনার শরীরে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তা বোঝায়। আকাশ মেঘলা থাকার মানে বায়ু জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি, অর্থাৎ বাতাস স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কিছুটা ভারী। যেহেতু আমাদের সাইনাসগুলি বাতাসে পূর্ণ, তাই সেই চাপের যে কোনও পরিবর্তন মাথাব্যথাকে প্রভাবিত করতে পারে।

১৬) মানুষের ঘুম যেতে হয় কেন?

-মোবারক হোসেন
দশম শ্রেণী, গভ.মুসলিম হাই স্কুল

উত্তরঃ রাতের অন্ধকার নেমে আসলেই আমাদের চোখে নেমে আসে ঘুম। শরীর যেন আপনাআপনি বুঝে কখন রাত হলো, কখন ঘুম যাওয়া দরকার। কিন্তু কেন? নিয়মিত ও পর্যাপ্ত ঘুম একজন মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কেননা ঘুম যাওয়ার সময় মস্তিষ্কের গ্লিমফেটিক নানা বিষাক্ত বর্জ্য অপসারণ করে, এছাড়া গবেষণা বলে ঘুম চিন্তন দক্ষতা, সৃজনশীলতা, মনে রাখার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। এছাড়া ইনসুলিন প্রবাহ, প্রতিরক্ষা ক্ষমতাসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় কাজ চালাতে ঘুম দরকারি। রাতে আলোর অভাব থাকায় দৈনন্দিন কাজ খুব একটা করা যায় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের জন্য শরীর রাতকেই উপযুক্ত সময় হিসেবে বেছে নিয়েছে।তেমন-ই বাঁদুরের মতো যেসকল প্রাণী দৈনন্দিন জীবনে আলোর উপর নিভর্রশীল না, তারা রাতে খাবার খোঁজাসহ অন্য কাজ করে দিনে ঘুমায়। ঘুমের জন্য মস্তিষ্ক রাত হতে থাকলেই নিয়মিত দেহঘড়ি অনুসারে মেলাটনিন ছাড়তে থাকে যা আমাদের ঘুমভাব আনে। আবার একইভাবে আলো পেয়ে মস্তিষ্ক মেলাটনিন নিঃসরণ কমাতে থাকে। তাই ভালো ঘুমের জন্য বেশি মেলাটনিন নিঃসরণ অর্থাৎ অন্ধকার রুম এবং সকালে ঘুমভাব কমাতে যথাসম্ভব রুম আলোকিত করা উচিত।

১৭) ব্ল্যাকহোলে হারিয়ে যাওয়া তথ্য কি কখনো ফিরিয়ে আনা সম্ভব?

-মুহাম্মদ জাওহার চৌধুরী
এসএসসি পরীক্ষার্থী, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

ব্ল্যাক হোল সবকিছুকে নিজের ভিতরে টেনে নেয়। যখন কোন কণা বা তরঙ্গ ব্ল্যাক হোলের ভিতরে পতিত হয় তখন সেটি আর কখনোই মহাবিশ্বের কোথাও ফিরে আসে না। কণা, তরঙ্গ বা যেকোনো কিছুই তথ্য বহন করে। একটি কণা অবস্থান ও ভরবেগের তথ্য বহন করে যখন ব্ল্যাক হোলে পতিত হয় তখন সেই তথ্যগুলো চিরতরে হারিয়ে যায়।এই তথ্যগুলো ফিরিয়ে আনা তথা তথ্য পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।ভবিষ্যত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি দ্বারা তা করা সম্ভব হলেও হতে পারে।

১৮) আকাশ কি আসলেই নীল? তাহলে বিভিন্ন রঙচঙে আলোর আবির্ভাব ঘটে কেন?

-আঈশা নূর
এসএসসি পরীক্ষার্থী, ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তরঃ আকাশ নীল দেখায় আলোর বিক্ষেপণের কারণে।কোন কণিকার ওপর আলো পড়লে সেই কণিকা আলোকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়, যাকে আলোর বিক্ষেপণ বলে। যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম, সেই আলোর বিক্ষেপণ তত বেশি হয়। আলোর বিক্ষেপণ এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চতুর্ঘাতের ব্যস্তানুপাতিক।

আমরা সূর্যের আলোকে সোনালি রঙের দেখি, কিন্তু এটা আসলে রংধনুর সাতটা রঙের মিশ্রণ।সূর্যের আলোয় রংধনুর সাতটা রংই আছে।এগুলো হলো- বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।প্রিজম নামে এক ধরনের বিশেষ আকৃতিতে তৈরি ক্রিস্টাল রয়েছে। এর সাহায্যে সূর্যের আলো যে সাতটা রঙে ভাগ হয়ে যায় তা স্পষ্ট দেখা যায়।

আমরা আকাশের যে নীল রংটা দেখি এটা মূলত সূর্যের আলোর নীল রং। অন্যান্য রঙের তুলনায় নীল রংটা ক্ষুদ্রতর তরঙ্গের মাধ্যমে ছড়াতে পারে, সেজন্য এই রংটা বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। অর্থ্যাৎ,নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম, তাই আকাশে এই আলোর বিক্ষেপণ বেশি হয় এবং আকাশ নীল দেখায়।

মেঘের অণু বেশ বড় হয় এবং তখন তা নীল ছাড়া অন্য আলোকেও বিক্ষেপিত করে। যার ফলে মেঘের বর্ণ অনেকটা সাদাটে হয়।

এই বিক্ষেপণের কারণেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালীন সময় আকাশ লাল দেখায়। এসময় সূর্য দিগন্তরেখার কাছে অবস্থান করে। তাই সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে আসতে পুরু বায়ুমণ্ডল ভেদ করে। তখন নীল আলো বিক্ষেপিত হয়ে বিভিন্ন দিকে চলে যায় কিন্তু লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় তা কম বিক্ষেপিত হয় এবং পৃথিবীতে আসে।

১৯) মিষ্টি খাওয়ার পর চা খেলে মিষ্টি লাগে না কেন?

-হাসপিয়াত তোরাবী
একাদশ শ্রেণি, বাকলিয়া সরকারি কলেজ

উত্তরঃ যখন কেউ তীব্র স্বাদের মিষ্টি খেয়ে থাকে তার স্বাদ কোরকগুলি সেই পরিমাণ মিষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একে সংবেদক ক্লান্তি বলা হয় এবং এটি কেবল আপনার স্বাদ কোরকের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাথে ঘটে।আমাদের মস্তিষ্কের কিছু বৈশিষ্ট্য এর জন্য দায়ী। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সংবেদন গ্রাহক অঙ্গ থেকে সংবেদন গ্রহণ করে এবং মস্তিষ্কে সংকেত প্রেরণ করে। একবার মস্তিষ্ক একটি নির্দিষ্ট মাত্রার সংকেতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, এর চাইতে কম মাত্রার সংকেতে এবং আরও প্রকট সংকেত না পেলে সাড়া দেয় না।তীব্র মিষ্টি কিছু খাওয়ার পরে অপেক্ষাকৃত কম মিষ্টতার চা এই জন্যই স্বাদ কোরকের মাধ্যমে যে সংকেত প্রেরণ করে মস্তিষ্ক তাতে সাড়া দেয় না।

২০) সূর্য কি কেবল নিজের ভরকেন্দ্রকে কেন্দ্র করেই ঘুরতে থাকে নাকি এটি কোনো ভাবেও নড়াচড়া করে? করলে কীভাবে করে?

-কাজী ছদরুল্লাহ রাকিব
এসএসসি পরীক্ষার্থী, কলেজিয়েট স্কুল

উত্তরঃ একে অপরকে প্রদক্ষিণকারী দুই বা ততোধিক বস্তুর ক্ষেত্রে সাধারণত ক্ষুদ্রতর ভরের বস্তুগুলো বৃহত্তর ভরের বস্তুর এক্সেক্ট পজিশনকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে না। বরং বস্তুসমূহের সমন্বিত সেন্টার অফ ম্যাস বা ব্যারিসেন্টারকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন করে।
উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা পৃথিবী ও সূর্যের কথা ধরি,পৃথিবীও কিন্তু এ দুই বস্তুর সেন্টার অফ ম্যাসকে কেন্দ্রকরেই ঘুরে, কিন্তু পৃথিবীর ভর সূর্যের তুলনায় নগণ্য হওয়ায় সেন্টার অফ ম্যাস হিসেবে আমরা সূর্যের অবস্থানটিকেও ধরে নিতে পারে উল্লেখ-যোগ্য কোন ত্রুটি ছাড়া। কিন্তু আবার বৃহস্পতি গ্রহের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পৃথিবী থেকে অনেক বেশি ভর হওয়ায় জুপিটার ও সূর্যের ব্যারিসেন্টার সূর্যের কিছুটা বাহিরে অবস্থান করে।
এখন পুরো সৌরজগতই যেহেতু আবর্তনশীল, আবার বিভিন্ন গ্রহের উপর বিভিন্ন গ্রহের মহাকর্ষ কাজ করে, তাই একেক মুহূর্তে সোলার সিস্টেমের ব্যারিসেন্টার পরিবর্তনশীল থাকে।

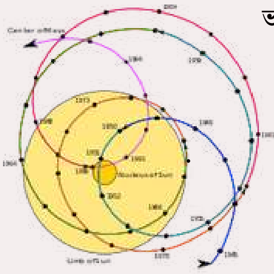

আমাদের সূর্য আবার সৌরজগতসহ এই গ্যালাক্সির সেন্টার অফ ম্যাসকে কেন্দ্র করে ঘুরে।কেন্দ্রতে অবস্থান করে একটু সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল। উল্লেখ্য যে ব্ল্যাক হোলটি কিন্তু স্থানটি সেন্টার অফ ম্যাস হওয়ার মূল কারণ নয়।মিল্কিওয়েতে অগণিত নক্ষত্র ও গ্রহ আছে যাদের মিলিত ভর সেই ব্ল্যাক হোলের তুলনায় অনেক বেশি।তাই ব্ল্যাক হোলকে এই ভরের মূল উৎস হিসেবে গণ্য করা যাবে না। এমনকি ব্ল্যাক হোলটিকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে নিলেও (সহজ ভাষায়, গায়েব করে দিলে) পুরো গ্যালাক্সির প্রায় সব গ্রহের আবর্তনের কক্ষপথ প্রায় একই থাকবে। যদিও ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি থাকা গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে পারে।

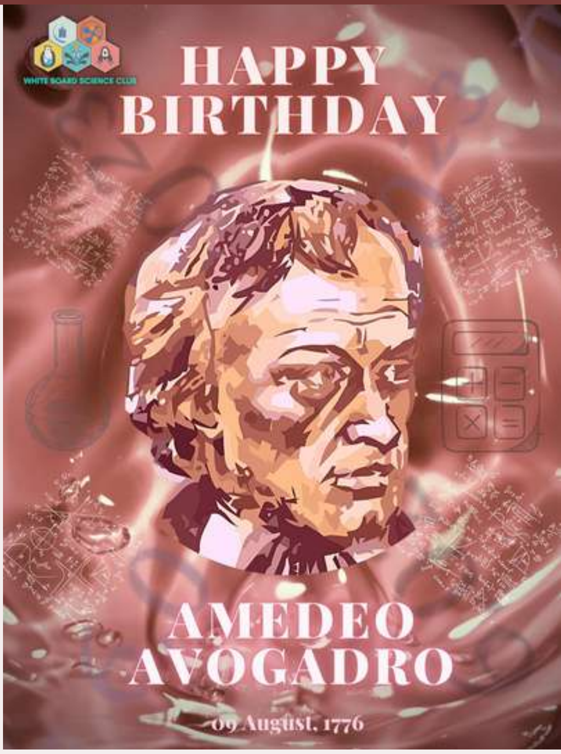

লরেঞ্জো রোমানো অ্যামেডিও কার্লো অ্যাভোগাড্রো, কেমিস্ট্রি নিয়ে গভীরে না গেলেও এই নামটি শোনেনি এমন মানুষ বোধহয় পাওয়া যাবে না। এই ইতালিয়ান বিজ্ঞানী এক্লেজিয়াস্টিক্যাল ল, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত নিয়ে পড়াশোনা করলেও আমাদের কাছে স্মরণীয় অ্যাভোগাড্রো'স ল এবং অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্ট দিয়ে।
১৮০৩ সালে জন ডাল্টন এর প্রকাশিত পরমাণুবাদ এবং ১৮০৮ সালের জোসেফ লুই গে-লাসাক এর গ্যাস আয়তন সূত্রের একত্রীকরণের চেষ্টায় বার্জেলিয়াসের প্রদত্ত প্রস্তাবের সংশোধনী ব্যাখ্যা দিয়ে ১৮১১ সালে অ্যাভোগাড্রো যে মতবাদ দেন তা প্রথমদিকে অ্যাভোগাড্রোর হাইপোথিসিস হিসেবে পরিচিত হলেও পরে তা মলিকিউলার থিওরি, অতপর অ্যাভোগাড্রো'স ল নামে সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃতি পায়। এই থিওরির মাধ্যমেই 'অণু' ধারণার প্রবর্তন হয় এবং পরমাণু এবং অণুর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশিত হয়।এই সূত্রের সাহায্যে যে কোনো গ্যাসের আনবিক ভর বের করাও সম্ভব হয়েছে।
অ্যাভোগেড্রোর সূত্র মতে-
"সকল মৌলের এক মোল পরিমাণে সমান সংখ্যক অণু থাকে "যা কঠিন, তরল,গ্যাসীয় সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
এক মোল পরিমাণে কি পরিমাণ অণু থাকবে তা সর্বপ্রথম বর্ণনা করে স্ট্যানিসলাও ক্যানিজারো, ১৮৬০ সালে। জোসেফ লশমিডট ১৮৬৫ সালে কাছাকাছি মান নির্ণয় করে যা লশমিডট কনস্ট্যান্ট এর সাথে সামঞ্জস্য।তবে সবচেয়ে বেশি যে নামটি অ্যাভোগেড্রো নাম্বারের সাথে সেটে রয়েছে, তাঁর নাম হলো জিন ব্যাপটিস্ট পেরিন। ১৯০৯ সালে তিনিই প্রথম এই সংখ্যার নামকরণ করেন "অ্যাভোগাড্রো'স নাম্বার"। আর ২০ মে,২০১৯ সালে বি.আই.পি এম কর্তৃক যে অ্যাভোগেড্রো নাম্বার স্বীকৃতি পায় তার মান- $N_0=6.02214076\times10^{23}\text{mol}^{-1}$
ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণ সূত্র থেকে পাওয়া1 মোল ইলেক্ট্রনের আধান তথা 96500 C কে একটি ইলেক্ট্রনের আধান তথা 1.602×10^{-19}C দিয়ে ভাগ করলেই অ্যাভোগেড্রো নাম্বার পাওয়া যায়। অ্যাভোগেড্রো নাম্বার এর মাধ্যমেই অনেক সমীকরণ গঠন সম্ভবপর হয়েছে যার মাধ্যমে মোল সংখ্যা,মৌলের পরিমাণ, আয়তন,অণুর সংখ্যা ইত্যাদির মান নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায়।
আজ ৯ই আগস্ট, এই কীর্তিমান ব্যক্তির ২৪৫ তম জন্মদিনে, আমরা তাঁকে স্মরণ করছি বিনম্র শ্রদ্ধায়।

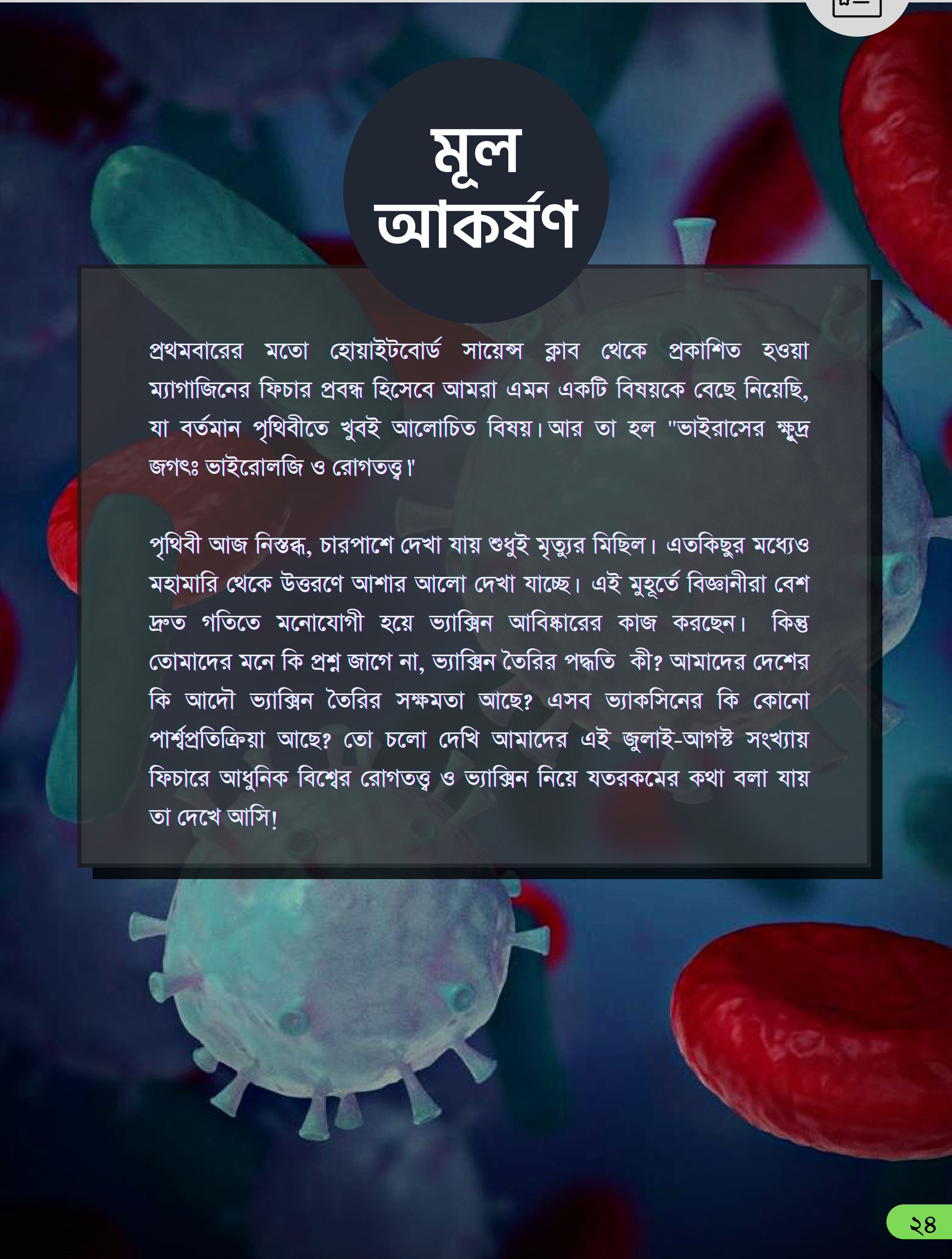

মূল আকর্ষণ

প্রথমবারের মতো হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব থেকে প্রকাশিত হওয়া ম্যাগাজিনের ফিচার প্রবন্ধ হিসেবে আমরা এমন একটি বিষয়কে বেছে নিয়েছি, যা বর্তমান পৃথিবীতে খুবই আলোচিত বিষয়। আর তা হল "ভাইরাসের ক্ষুদ্র জগৎঃ ভাইরোলজি ও রোগতত্ত্ব।"

পৃথিবী আজ নিস্তব্ধ, চারপাশে দেখা যায় শুধুই মৃত্যুর মিছিল। এতকিছুর মধ্যেও মহামারি থেকে উত্তরণে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা বেশ দ্রুত গতিতে মনোযোগী হয়ে ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের কাজ করছেন। কিন্তু তোমাদের মনে কি প্রশ্ন জাগে না, ভ্যাক্সিন তৈরির পদ্ধতি কী? আমাদের দেশের কি আদৌ ভ্যাক্সিন তৈরির সক্ষমতা আছে? এসব ভ্যাকসিনের কি কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে? তো চলো দেখি আমাদের এই জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় ফিচারে আধুনিক বিশ্বের রোগতত্ত্ব ও ভ্যাক্সিন নিয়ে যতরকমের কথা বলা যায় তা দেখে আসি!

করোনার হাতিয়ার : ভ্যাক্সিন

বর্তমান সময়ের এই করোনা মহামারীতে ভ্যাক্সিন নামক বস্তুটি যেন এক বুক আশ্বাসের নাম। কিন্তু আমাদের অনেকের ধারণাই নেই কীভাবে ভ্যাক্সিন আমাদের দেহকে কাজে লাগিয়ে আমাদের শরীরের রক্ষার কাজ করে থাকে।

আমাদের দেহের রক্ষাকবচ হিসেবে সর্বদা উপস্থিত থাকে শ্বেতরক্তকণিকা। প্রতি ঘনমিলিমিটারে শ্বেতরক্তকণিকার পরিমাণ প্রায় ৫-৮ হাজার। শ্বেতরক্তকণিকা অনেক ধরনের হয়ে থাকে - নিউট্রোফিল, ইউসিনোফিল, বেসোফিল হলো দানাদার শ্বেতরক্তকণিকা; মনোসাইট, লিম্ফোসাইট হলো অদানাদার শ্বেতরক্তকণিকা। প্রতিটি ধরণই কোনো না কোনো ভাবে দেহের রক্ষার কাজে ব্যস্ত। কেউ ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায়, কেউ হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ক্ষরণ করে, কেউ অ্যান্টিবডি তৈরি করে দেহ রক্ষার কাজে শামিল হয়। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি রয়েছে তা হলো অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করা। কেননা, এটি দীর্ঘসময়ের জন্য দেহকে নির্দিষ্ট কোনো ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ইত্যাদি জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে রাখে।

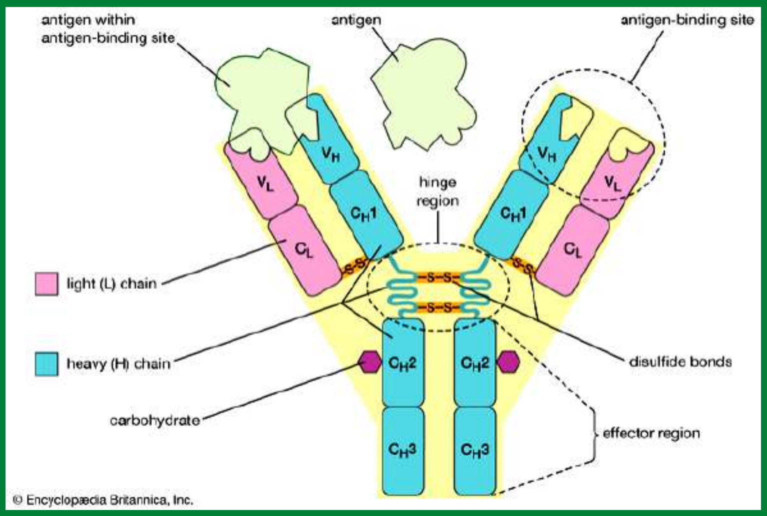

© Encyclopædia Britannica, Inc.

Antibody

ভ্যাক্সিনের কথায় যাওয়ার আগে আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা নিয়ে কিছু জানা উচিত। মানবদেহে প্রতিরক্ষা দুই ধরণের - সহজাত প্রতিরক্ষা এবং অর্জিত প্রতিরক্ষা।সহজাত প্রতিরক্ষা আমাদের দেহে জন্মের সময় থেকেই বিদ্যমান থাকে, যেমন: ত্বক, পৌষ্টিকনালির হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কম্পপিমেন্টারি সিস্টেম, ইন্টারফেরন, সহজাত মারণকোষ ইত্যাদি। আর অর্জিত প্রতিরক্ষার হলো জন্মের পর কোনো নির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে সাড়া দেওয়ায় কিংবা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হলো *B* সেল এবং *T* সেল। বি সেল এবং টি সেল নিয়ে জানার আগে অ্যান্টিবডি মানেটা কী জেনে আসা যাক। অ্যান্টিবডি হলো দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্র থেকে উৎপন্ন একধরনের দ্রবণীয় গ্লাইকোপ্রোটিন যা নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করে।প্রতিটি অ্যান্টিবডিই হলো একেকটি ইমিউনোগ্লোবিউলিন (*Ig*) নামে বিশেষ প্রোটিন। শ্বেতরক্তকণিকার মধ্যে অন্যতম হলো লিম্ফোসাইট। এই লিম্ফোসাইট দু'ধরনের - *T* কোষ এবং *B* কোষ। *B* লিম্ফোসাইটের কয়েকটি ধরনের মধ্যে একটি হলো 'প্লাজমা *B* কোষ' সংক্ষেপে 'প্লাজমা কোষ'। এবং এই প্লাজমা কোষগুলোই প্রয়োজনে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে।এই *B* কোষগুলো অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে কেবল কার্যকরী কোষই (*Effector cells*) তৈরি করে না এরা স্মৃতিকোষও (*Memory cells*) তৈরি করে এর ফলে প্রথমবার কোনো জীবাণু দেহকে আক্রান্ত করলে এবং দেহ যদি কোনো ভাবে সেই রোগকে নিরাময় করতে পারে তবে ঐ অ্যান্টিজেনকে দেহ সবসময় মনে রেখে দেয়। ফলে পরে যখনি ঐ অ্যান্টিজেন আবার অ্যাটাক করে তখন দেহ অতিদ্রুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে।

এবার দেখা যাক ভাইরাস কিভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করে? আমাদের দেহ যে ত্বক নামক পর্দা দ্বারা আবৃত তার প্রতিটি কোষে কিছু রিসিপ্টর প্রোটিন থাকে।

> **"আমাদের দেহের রক্ষাকবচ হিসেবে সর্বদা উপস্থিত থাকে শ্বেত রক্তকণিকা। প্রতি ঘনমিলিমিটারে শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ প্রায় ৫-৮ হাজার"**

How Protein receptor works

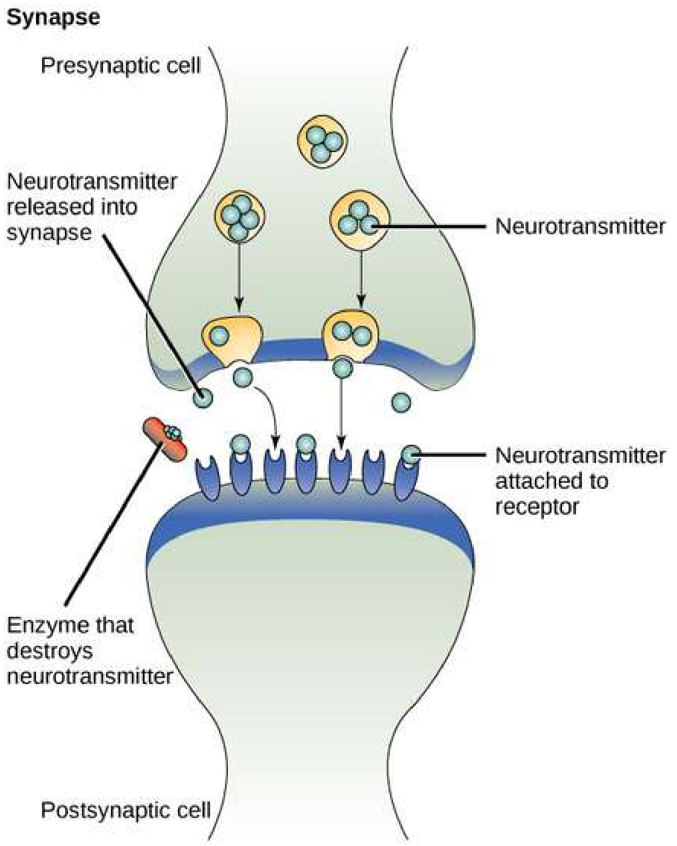
Synapse
Presynaptic cell
Neurotransmitter released into synapse
Neurotransmitter
Neurotransmitter attached to receptor
Enzyme that destroys neurotransmitter
Postsynaptic cell

এইসব রিসিপ্টর বা গ্রাহক প্রোটিনে যদি কোনো ভাইরাস (এক প্রকার লিগেন্ড) যুক্ত হয় তবে রিসিপ্টর প্রোটিনটি তার কনফিগারেশন বা গঠন বদলে ফেলে, ফলে কোষে ঢুকার পথ খুলে যায় এবং ভাইরাসটি কোষে ঢুকে পড়ে কোষের উপাদান ব্যবহার করে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে ; অতঃপর শরীরকে অসুস্থ করে ফেলে। ঠিক তখনই শুরু হয় অর্জিত প্রতিরক্ষার কাজ।দেহে ভাইরাস ঢুকার পর দেহে একটা সতর্কবার্তা পৌছে যায় এবং দেহের প্লাজমা কোষ অ্যান্টিবডি তৈরির কাজ শুরু করে দেয়। মোটামুটি এই হলো ভাইরাস ঢুকা এবং অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া। ঠিক এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়েই ভ্যাক্সিন কাজ করে। চলুন এবার ভ্যাক্সিনের তরলে ডুব দেয়া যাক!

ভ্যাক্সিনের প্রধান কাজই হলো দেহকে আগে থেকে সাবধান করে রাখা এবং সম্ভাব্য রোগের বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়া তোলা।বর্তমানে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে তিন ধরনের ভ্যাক্সিন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি এখনো প্রক্রিয়াধীন হলেও অপর দুইটি - mRNA ভ্যাক্সিন এবং DNA ভ্যাক্সিন ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়ে গেছে। mRNA ভ্যাক্সিন ব্যবহার করছে মডার্না এবং ফাইজার। আর অক্সফোর্ডের অ্যাস্ট্রাজেনেকা উৎপাদন করছে DNA ভ্যাক্সিন।

How vaccines work

করোনা ভাইরাসের যে স্পাইক প্রোটিন রয়েছে (উপরে কাঁটা কাঁটা জিনিসগুলো) এগুলোকে বলা হয় *S* প্রোটিন। এই *S* প্রোটিনসমূহ আমাদের দেহের কোষের *ACE2* (*Angiotensin Converting Enzyme,2*) নামক রিসিপ্টর বা গ্রাহক প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয় এবং দেহকোষে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করে।

মডার্না এবং ফাইজারের *mRNA* ভ্যাক্সিনে ব্যবহৃত *mRNA* গুলো লিপিডের দুটো স্তরে মোড়ানো থাকে। এমআরএনএ গুলো খুবই ভংগুর, আমাদের শরীরের এনজাইম এদের ভেঙে ফেলতে পারে। কিন্তু লিপিডের স্তরে মোড়ানো থাকার ফলে এরা ভেঙে যাবে না। নিরাপদে শরীরে প্রবেশ করে স্পাইক প্রোটিন তৈরি করতে পারবে। এমআরএনএ ভ্যাক্সিন এই স্পাইক প্রোটিন তৈরি করে তাদের কোষের বাইরের দেয়ালে স্থাপন করে *ACE2* প্রোটিনের কাছে।

> "ভ্যাক্সিনের প্রধান কাজই হলো দেহকে আগে থেকে সাবধান করে রাখা এবং সম্ভাব্য রোগের বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়া তোলা। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে তিন ধরনের ভ্যাক্সিন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে"

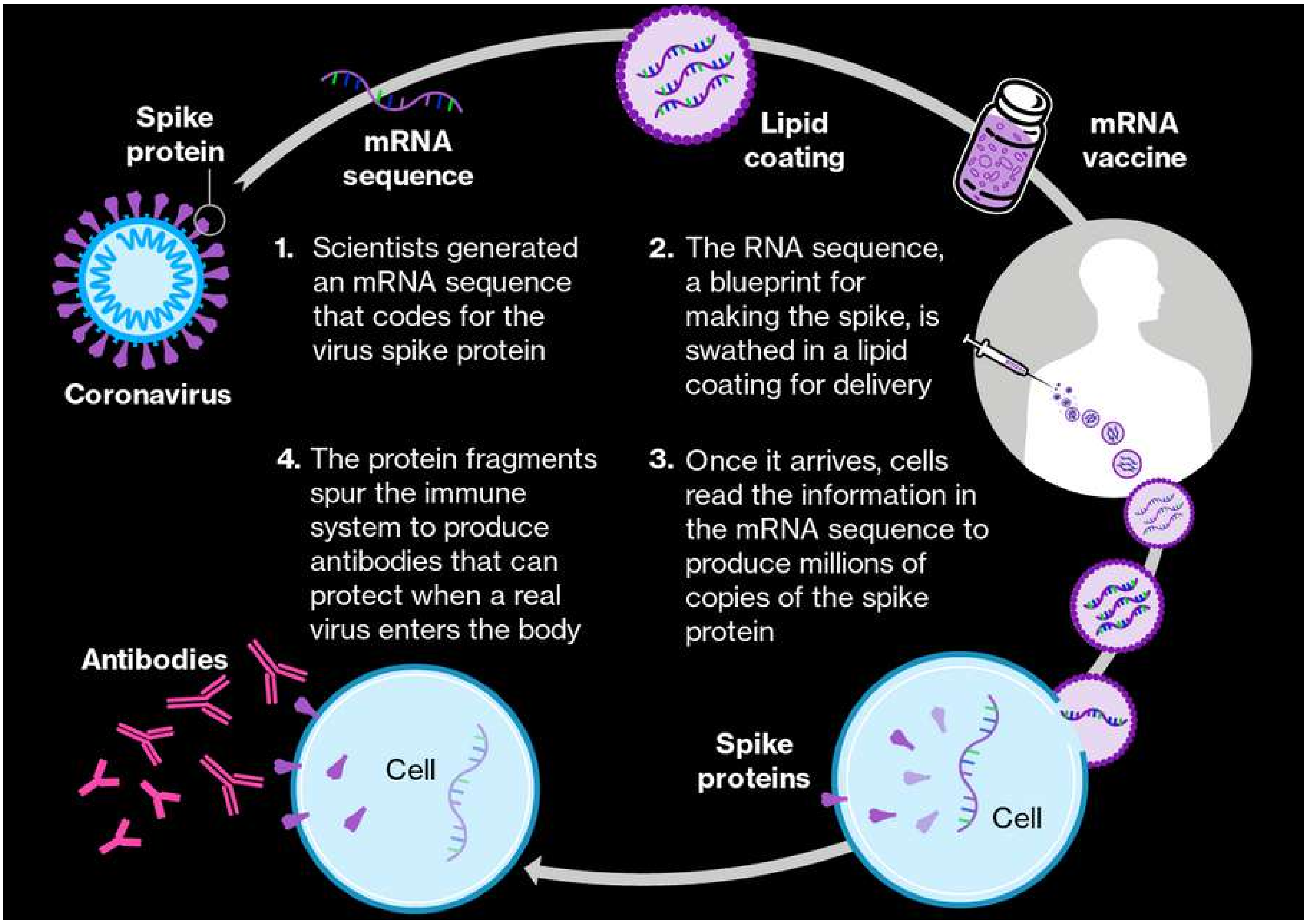

1. Scientists generated an mRNA sequence that codes for the virus spike protein
2. The RNA sequence, a blueprint for making the spike, is swathed in a lipid coating for delivery
3. Once it arrives, cells read the information in the mRNA sequence to produce millions of copies of the spike protein
4. The protein fragments spur the immune system to produce antibodies that can protect when a real virus enters the body

How vaccines work

যেহেতু এই প্রোটিন দেহের কাছে অচেনা তাই দেহে একটি সতর্কবার্তা পৌছে যায় এবং দেহ এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরির নির্দেশ দেয়। যেহেতু স্পাইক প্রোটিনটি ছিল করোনা ভাইরাসের, তাই দেহে করোনা প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি প্রস্তুত হয়ে যায়। যা মানুষকে করোনার হাত থেকে বাঁচার সাহায্য করে।

Life Cycle of SARS-Cov-19

আরেক ধরনের ভ্যাক্সিন যা অ্যাস্ট্রাজেনেকা উৎপাদন করছে তা DNA ভ্যাক্সিন। অ্যাডেনোভাইরাস ভেক্টরে (একধরনের বাহক) কোভিড-১৯ ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের ডিএনএ সংযুক্ত করে শরীরে প্রবেশ করানো হয়। অ্যাডেনোভাইরাস মানুষের সর্দি,কাশির সমস্যা করতে পারে বলে এক্ষেত্রে ওরা শিম্পাঞ্জি এবং বানর প্রজাতিকে আক্রান্ত করে এমন অ্যাডেনোভাইরাস ব্যবহার করেছে। এই অ্যাডেনোভাইরাস ব্যবহারের অন্যতম কারণ এরা অত্যন্ত দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। ফলে দেহে প্রবেশের পর অ্যাডেনোভাইরাসগুলো স্পাইক প্রোটিন উৎপন্ন করতে থাকে এবং দেহের প্রতিরক্ষা প্রতিরক্ষা সিস্টেমকে সতর্ক করে দেয় যে এইরকম অ্যান্টিজেন তোমার চারপাশে আছে প্রস্তুত হয়ে নাও।

উল্লেখ্য ভ্যাক্সিনে যে স্পাইক প্রোটিন বা ডিএনএ সমূহ ব্যবহৃত হয় তা অত্যন্ত পরিশোধিত।

বর্তমানে বাজারে যে সকল ভ্যাক্সিন পাওয়া যাচ্ছে তার একটা ধারণা নেয়া যাক -

১. *BNT162b2* - প্রস্তুতকারক হলো ফাইজার (*Pfizer*) এবং বায়োএনটেক (*BioNtech*)
২. *Corona Vac* - প্রস্তুতকারক হলো সিনোভ্যাক (*Sinovac*)
৩. *Sputnik V* - প্রস্তুতকারক : গামালিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
৪. *mRNA-1273* - প্রস্তুতকারক : মডার্না
৫. *AZD1222* - প্রস্তুতকারক : ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড, আইকিউভিআইএ এবং সেরাম ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া।

সাধারনত ১৮+ মানুষদের জন্য এইসব ভ্যাক্সিন এখন পর্যন্ত সুবিবেচিত হয়েছে। তবে ফাইজারের ভ্যাক্সিন ১২+ বয়সীদের দেয়া যাবে। যদি আমরা কার্যক্ষমতার দিকে দেখি, তবে ফাইজারের টিকার কার্যক্ষমতা ৯১.৩ % প্রায়, মডার্নার টিকা ৯০%, অক্সফোর্ডের টিকা ৮৫%, সিনোফার্মের টিকা ৭৯% ইত্যাদি।

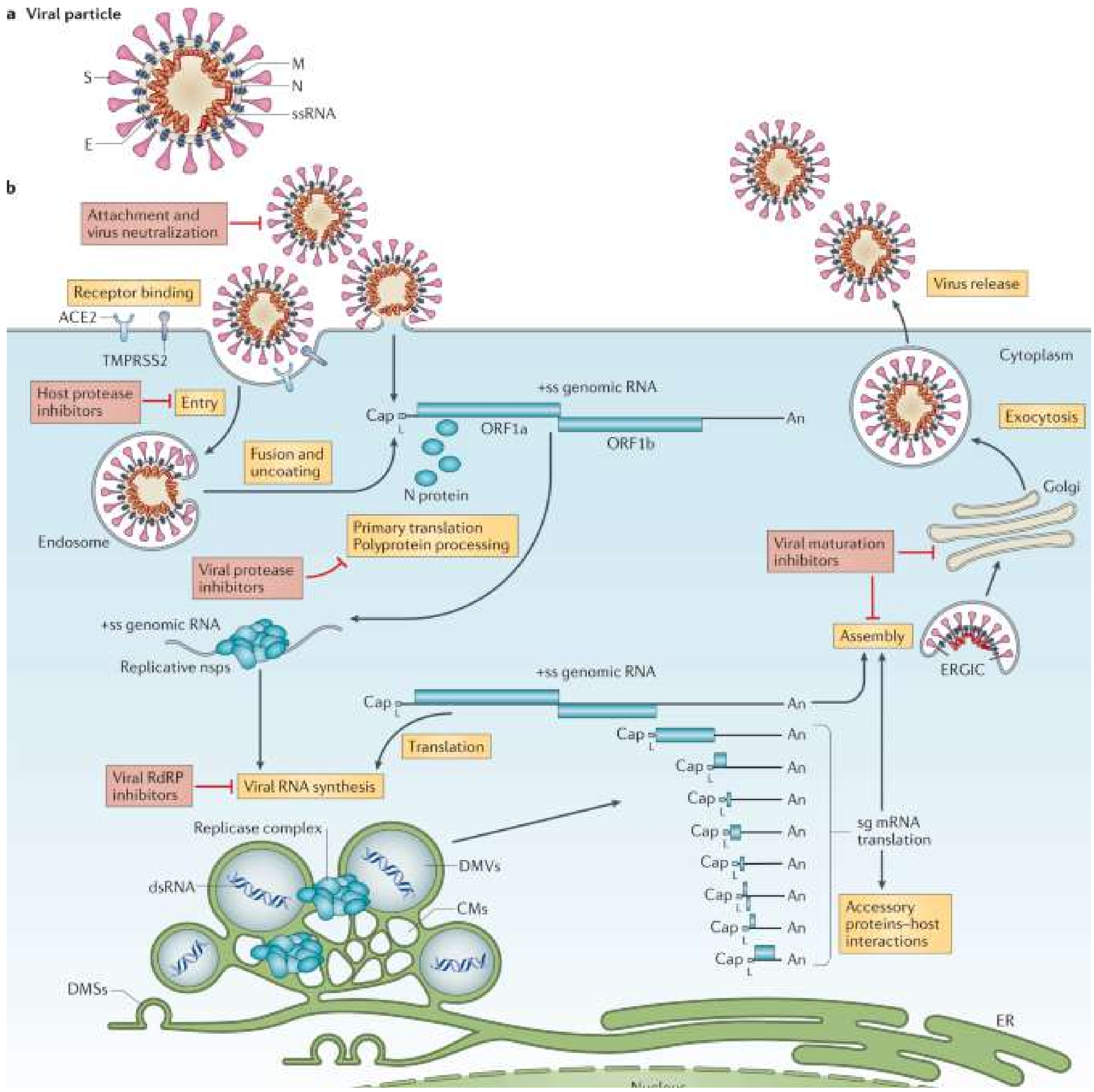
a Viral particle
S
M
N
ssRNA
E
b
Attachment and virus neutralization
Receptor binding
ACE2
TMPRSS2
Host protease inhibitors
Entry
Endosome
Fusion and uncoating
Cap
L
+ss genomic RNA
ORF1a
ORF1b
An
N protein
Primary translation Polyprotein processing
Viral protease inhibitors
+ss genomic RNA
Replicative nsps
Translation
Viral RdRP inhibitors
Viral RNA synthesis
Replicase complex
dsRNA
DMVs
CMs
DMSs
sg mRNA translation
Accessory proteins–host interactions
Assembly
ERGIC
Viral maturation inhibitors
Golgi
Exocytosis
Cytoplasm
Virus release
ER
Nucleus

[Life Cycle of SARS-Cov-19]

তবে নতুন ডেল্টা ভ্যারিয়েন্সের বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিনগুলো কতটুকু কার্যকর তা দেখার বিষয়, যদিও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তাদের টিকা ভালোই সুরক্ষা দিবে ডেল্টার বিপক্ষে।

বাংলাদেশও কিন্তু পিছিয়ে নেই ভ্যাক্সিন যুদ্ধে। করোনা ভাইরাসের একটি পরিবর্তন *D614G* নামে পরিচিত, যা বাংলাদেশে সিকোয়েন্স করা সব নমুনায় পাওয়া যাচ্ছে। এই ধরনটি রিসিপ্টরের সাথে প্রায় ১১ গুণ বেশি দৃঢ়ভাবে বন্ধন গঠন করতে পারে। এই ক্ষেত্রে আশার আলো নিয়ে মাঠে নামে গ্লোববায়োটেক নামের একটি প্রতিষ্ঠান। তারা *D614G* পরিবর্তনটিকে মাথায় নিয়ে এমআরএনএ ভ্যাক্সিন তৈরি করে ট্রায়ালেও তারা ভালো ফলাফল পেয়েছেন। তবে তা এখনো WHO সার্টিফায়েড না।

ভ্যাক্সিন আমাদের এমন এক দিশা যা আমাদের আশা জাগায়, হয়তো আগামী বছরই আমরা করোনাকে জয় করতে পারব।প্রত্যেক দেশের হর্তাকর্তারা যদি সুষ্ঠুভাবে ভ্যাক্সিন জনগনের কাছে পৌছে দিতে পারে তবে করোনাকে জয় করার স্বপ্ন দেখাই যায়, ক্ষতি কি!

লেখায়ঃ

এনামুল হক জুয়েল, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

মোহাম্মদ, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

ভ্যাক্সিনের ধরণ নিয়ে মানুষের যত জিজ্ঞাসা

যুগ যুগ ধরে ঢাল অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। নরদেবতা হারকিউলিস হোক বা সাহসী বীর অ্যাকিলিস, তাদের সবারই নিজেদের সুরক্ষার জন্য দরকার ছিল ঢাল। এই মুহূর্তে, আমরা প্রত্যেকে যুদ্ধে আছি। করোনা ভাইরাসের সাথে যুদ্ধে। করোনা ভাইরাস ছাড়াও আমাদের শরীর প্রতিদিন অসংখ্য ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলছে। যদিও আমাদের শরীর নিজে থেকে কিছু রোগজীবাণু সাথে লড়াই করতে পারে, কিছু রোগ-জীবাণুর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঢাল প্রয়োজন এবং ভ্যাকসিনগুলি ঠিক তাই।

ভ্যাকসিন একটি পদার্থ যা একটি নির্দিষ্ট রোগের অনাক্রম্যতা উৎপাদন করতে একজন ব্যক্তির ইমিউন সিস্টেম উদ্দীপিত করে, সেই রোগ থেকে রক্ষা করে। ভ্যাকসিনগুলিকে "ইমিউনাইজেশন"ও বলা হয়। কারণ তারা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য আমাদের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষমতার সুবিধা নেয়। নিজের শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা উদ্দীপিত করে।

ভ্যাকসিনগুলি বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে, তবে প্রায় সব ভ্যাকসিন এক নীতিতে কাজ করে। একটি রোগজীবাণু (একটি রোগ সৃষ্টিকারী জীব) বা একটি রোগজীবাণুর অংশকে চিহ্নিত করে ইমিউন প্রতিক্রিয়া উদ্দীপিত করে। বিশেষ করে ইমিউন সিস্টেম বহিরাগত 'অ্যান্টিজেন' অংশ শনাক্ত করে এবং ইমিউন সিস্টেমকে তা কত কণা বহন করে তা চিনতে সাহায্য করে এবং তার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়।

> **"ভ্যাকসিন একটি পদার্থ যা একটি নির্দিষ্ট রোগের অনাক্রম্যতা উৎপাদন করতে একজন ব্যক্তির ইমিউন সিস্টেম উদ্দীপিত করে, সেই রোগ থেকে রক্ষা করে।"**

একটি ভ্যাকসিন কী ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি এবং কোন পদ্ধতিতে কাজ করে এর উপর ভিত্তি করে তাকে কিছু ভাগে ভাগ করা যায়।

ভ্যাকসিন কে মূলত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়:-

- লাইভ-এটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন।
- ইনএক্টিভেটেড ভ্যাকসিন।
- সাবইউনিট, রিকম্বিনেন্ট, পলিস্যাকারাইড এবং কনজুগেট ভ্যাকসিন।
- মেসেঞ্জার আরএনএ (এমআরএনএ) ভ্যাকসিন।
- টক্সয়েড ভ্যাকসিন।

ভ্যাকসিনের ধরনের অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যগুলি আলাদা এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করে যে কোন টিকাটি কীভাবে ব্যবহার করা হবে।

লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন

পরীক্ষাগারের দুর্বল করে ফেলা জীবন্ত অণুজীব (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি একটি ভ্যাকসিনকে লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন (LAV) বলা হয়। LAV ভ্যাকসিনগুলি একটি টিকা দেওয়া ব্যক্তির মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করবে। এই ভ্যাক্সিন বিভিন্ন উপায়ে তৈরি করা যেতে পারে। পোলিও, গুটিবসন্তের মতো রোগ নির্মূল করতে এবং হাম ও যক্ষ্মার মতো মারাত্মক শৈশবকালীন রোগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে অ্যাটেনুয়েটেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রক্রিয়াই MMR টিকা, চিকেন পক্স এবং পীতজ্বর ভ্যাকসিনের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

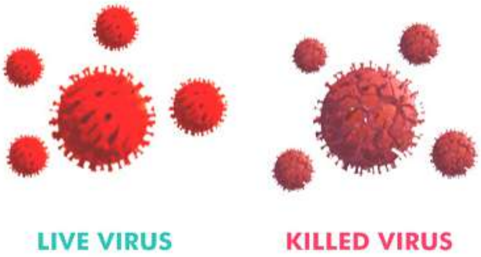

ইনএক্টিভ ভ্যাকসিন

ইনএক্টিভেটেড ভ্যাকসিন বা নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন হল একটি ভ্যাকসিন, যা এমন রোগজীবাণু নিয়ে গঠিত যা কালচারে বৃদ্ধি পায় এবং রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা নিরপেক্ষ। প্রথম নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিনগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্যামন ও স্মিথ এবং ফ্রান্সের পাস্তুর ইনস্টিটিউট গ্রুপ (রক্স এবং চেম্বারল্যান্ড) দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল।

এই ক্ষেত্রে রোগজীবাণুর রোগ সৃষ্টি ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য তাপ, বিকিরণ বা কেমিক্যাল ব্যবহার করে এর শেল এবং রোগ-জীবাণুর জেনেটিক কোড দুটোকেই ভেঙে ফেলা হয় যে টুকরাগুলো বাকি থাকে সেগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তারা আর এই রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করতে ইমিউন সিস্টেমকে সক্রিয় করতে পারে। তবে এই প্রতিক্রিয়া অন্য কোনো ভ্যাকসিনের মতো শক্তিশালী নয়, তাই একাধিক ডোজের প্রয়োজন হতে পারে যাকে "বুস্টার" বলা হয়।

প্রাথমিকভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিনগুলি এই নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিনের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ যা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচায়।

এছাড়াও, ইনজেক্টেড পোলিও ভ্যাকসিন (সল্ক ভ্যাকসিন),
হেপাটাইটিস-এ ভ্যাকসিন,
এনসেফালাইটিস ভ্যাকসিন, কিছু কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন, বিআইবিপি-করভ, করোনাভ্যাক, কোভেক্সিন, কাজভ্যাক, তুরকোভ্যাক এবং ব্যাকটেরিয়াল টাইফয়েড ভ্যাকসিনও এই ধরনের একটি উদাহরণ।

টক্সয়েড ভ্যাকসিন

টক্সয়েড ভ্যাকসিন বলা হয় অধিবিষ বা টক্সিয়ান থেকে তৈরি একটি ভ্যাকসিন যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার তৈরি করে বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়টিটেনাস টক্সয়েড প্রথম ১৯২৪ সালে উৎপাদিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সশস্ত্র পরিষেবাগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

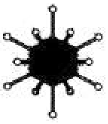

> “টিটেনাস টক্সয়েড প্রথম '২৪ সালে উৎপাদিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সশস্ত্র পরিষেবাগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।”

টক্সয়েড ভ্যাকসিন জীবাণু একটি নির্দিষ্ট অংশ দ্বারা তৈরি এবং সে রোগ জীবাণু দ্বারা তৈরি করা টক্সিনের উপর ভিত্তি একটি বিষ (ক্ষতিকারক পণ্য) ব্যবহার করে যা রোগ সৃষ্টি করে। টক্সোইড ভ্যাকসিন অন্য অন্যান্য ভ্যাকসিন এর তুলনায় বেশি স্থিতিশীল এবং
তাপমাত্রা, আর্দ্রতা বা আলো প্রতি কম সংবেদনশীল।

সাবইউনিট, রিকম্বিনেন্ট, পলিস্যাকারাইড এবং কনজুগেট ভ্যাকসিন

এই ভ্যাকসিন জীবাণুর নির্দিষ্ট টুকরা ব্যবহার করে - যেমন এর প্রোটিন, সুগার বা ক্যাপসিড (জীবাণুর চারপাশে আবরণ)।
যেহেতু এই ভ্যাকসিনগুলি শুধুমাত্র জীবাণুর নির্দিষ্ট অংশ ব্যবহার করে, সেগুলি খুব শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। দুর্বল ইমিউন সিস্টেম এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যাসহ যাদের এই তাদের প্রায় প্রত্যেকের জন্যই এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই ভ্যাকসিনগুলির একটি সীমাবদ্ধতা হ'ল রোগের বিরুদ্ধে চলমান সুরক্ষা পেতে বুস্টার শটের প্রয়োজন হতে পারে। এই ভ্যাকসিনটি হিব (হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি) রোগ, হেপাটাইটিস বি, এইচপিভি (হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস), হুপিং কাশি (ডিটিএপি মিলিত ভ্যাকসিনের অংশ), নিউমোকক্কাল রোগ, মেনিনজোকোকাল রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

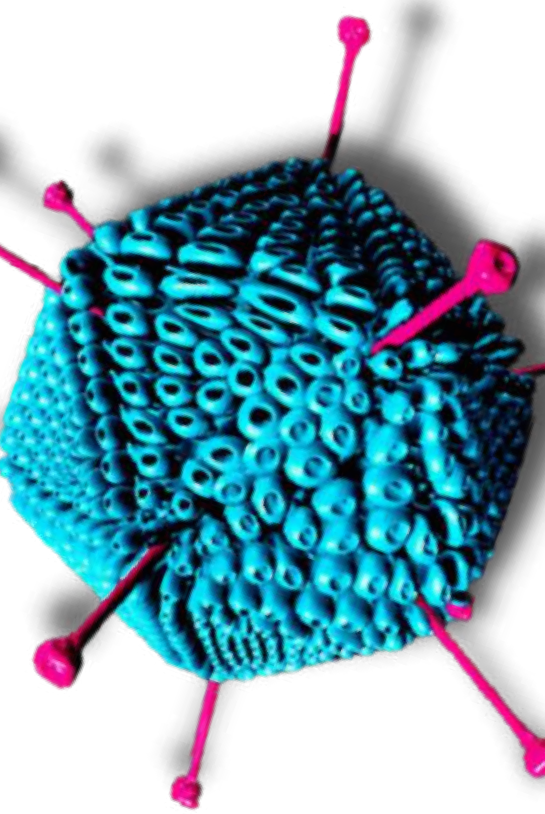

ভাইরাল ভেক্টর ভ্যাকসিন

একটি ভাইরাল ভেক্টর ভ্যাকসিন হল একটি ভ্যাকসিন যা একটি ভাইরাল ভেক্টর ব্যবহার করে প্রাপকের হোস্ট কোষে একটি কাঙ্ক্ষিত অ্যান্টিজেনের জন্য জেনেটিক উপাদান কোডিং সরবরাহ করে।

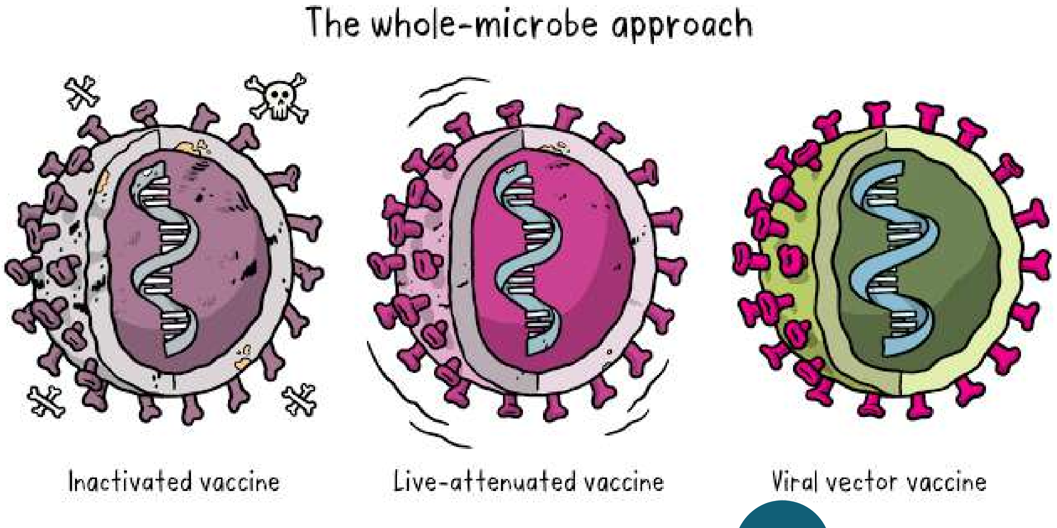

ভাইরাল ভেক্টর ভ্যাকসিন আমাদের কোষে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পৌঁছে দিতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশের জন্য একটি ভিন্ন ভাইরাস (ভেক্টর) এর একটি পরিবর্তিত সংস্করণ ব্যবহার করে।

প্রথমে, ভেক্টর (ভাইরাস নয় যেটি রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু একটি ভিন্ন, নিরীহ রোগজীবাণু) আমাদের দেহে একটি কোষে প্রবেশ করবে এবং তারপর কোষের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে একটি রোগ সৃষ্টিকারী প্যাথোজেনের একটি নন -প্যাথোজেনিক টুকরা তৈরি করবে এই টুকরাটি স্পাইক প্রোটিন নামে পরিচিত এবং এটি শুধুমাত্র ভাইরাসের পৃষ্ঠে পাওয়া যায় যা রোগ সৃষ্টি করে।

পরবর্তী, কোষ তার পৃষ্ঠে স্পাইক প্রোটিন প্রদর্শন করে, এবং আমাদের ইমিউন সিস্টেম শনাক্ত করে অ্যান্টিবডি উৎপাদন শুরু করতে এবং অন্যান্য ইমিউন কোষকে সক্রিয় করার জন্য ট্রিগার করে যা এটি সংক্রমণ বলে মনে করে।

প্রক্রিয়া শেষে, আমাদের শরীর শিখেছে কিভাবে ভবিষ্যতে রোগজীবাণুর সংক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করা যায়। ভ্যাকসিন পাওয়ার পর যে কোন সাময়িক অসুস্থতা অনুভব করা প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক অংশ এবং একটি ইঙ্গিত যে ভ্যাকসিন কাজ করছে।

বিজ্ঞানীরা ১৯৭০ এর দশকে ভাইরাল ভেক্টর তৈরি শুরু করেছিলেন। ভ্যাকসিনে ব্যবহার করা ছাড়াও, ভাইরাল ভেক্টরগুলি জিন থেরাপি, ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য এবং আণবিক জীববিজ্ঞান গবেষণার জন্যও অধ্যয়ন করা হয়েছে।

এমআরএনএ ভ্যাকসিন

প্রচলিত ভ্যাকসিন পদ্ধতি, যেমন লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড এবং নিষ্ক্রিয় প্যাথোজেন এবং সাবইউনিট ভ্যাকসিন, বিভিন্ন বিপজ্জনক রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।এই সাফল্য সত্ত্বেও, বিভিন্ন সংক্রামক রোগজীবাণুগুলির বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন তৈরিতে বড় বাধা রয়ে গেছে, বিশেষ করে যারা অভিযোজিত প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে রক্ষা পেতে সক্ষম। তদুপরি, বেশিরভাগ উদীয়মান ভাইরাস ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে, প্রধান বাধা প্রচলিত পদ্ধতির কার্যকারিতা নয় বরং আরও দ্রুত বিকাশ এবং বৃহৎ আকারের প্রস্তুতএর প্রয়োজন।

পরিশেষে, প্রচলিত ভ্যাকসিন পদ্ধতি ক্যান্সারের মতো সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। আরও শক্তিশালী এবং বহুমুখী ভ্যাকসিন প্ল্যাটফর্মের বিকাশ তাই জরুরীভাবে প্রয়োজন এবং mRNA ভ্যাকসিন এই সমস্যার উত্তর।

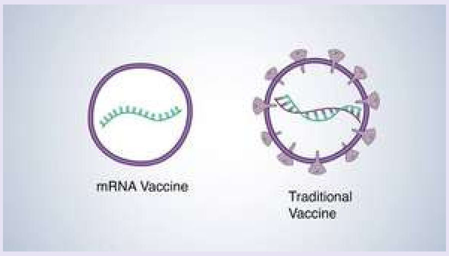

একটি রাইবোনিউক্লিক এসিড (আরএনএ) ভ্যাকসিন বা মেসেঞ্জার আরএনএ (এমআরএনএ) ভ্যাকসিন হল এক ধরনের ভ্যাকসিন যা মেসেঞ্জার আরএনএ (এমআরএনএ) নামক অণুর একটি অনুলিপি ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে।

ভ্যাকসিন, সিন্থেটিক আরএনএ-র অণুগুলিকে ইমিউন কোষে স্থানান্তরিত করে, যেখানে ভ্যাকসিনটি এমআরএনএ হিসাবে কাজ করে, যার ফলে কোষগুলি ভিন্ন প্রোটিন তৈরি করে যা সাধারণত একটি রোগজীবাণু দ্বারা উৎপাদিত হয়।এই প্রোটিন অণুগুলি একটি অভিযোজিত প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে যা শরীরকে সংশ্লিষ্ট রোগজীবাণু শনাক্ত ও ধ্বংস করতে শেখায়।

কোষের মধ্যে একটি লাইপোসোমাল ন্যানো পার্টিকেলের মধ্যে প্যাকেজ করা এমআরএনএর প্রথম সফল স্থানান্তর ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। অরক্ষিত এমআরএনএ এক বছর পরে ইঁদুরের পেশীতে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। এই গবেষণাগুলি প্রথম প্রমাণ ছিল যে ভিট্রোতে এমআরএনএ প্রতিলিপি করা জীবিত কোষের টিস্যুর মধ্যে প্রোটিন তৈরি করতে জেনেটিক তথ্য সরবরাহ করতে পারে এবং মেসেঞ্জার আরএনএ ভ্যাকসিনের ধারণা প্রস্তাবের দিকে পরিচালিত করে। শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ না করে কোষের ভিতরে এমআরএনএ পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে পরিবর্তিত নিউক্লিওসাইডের সফল প্রয়োগ ২০০৫ সালে রিপোর্ট করা হয়েছিল। ডিসেম্বর ২০২০-এ বায়োটেক এবং মডার্না তাদের এমআরএনএ-ভিত্তিক কোভিড -১৯ ভ্যাকসিনের অনুমোদন পেয়েছিল।

"কোষের মধ্যে একটি লাইপোসোমাল ন্যানো পার্টিকেলের মধ্যে প্যাকেজ করা এমআরএনএর প্রথম সফল স্থানান্তর '৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।"

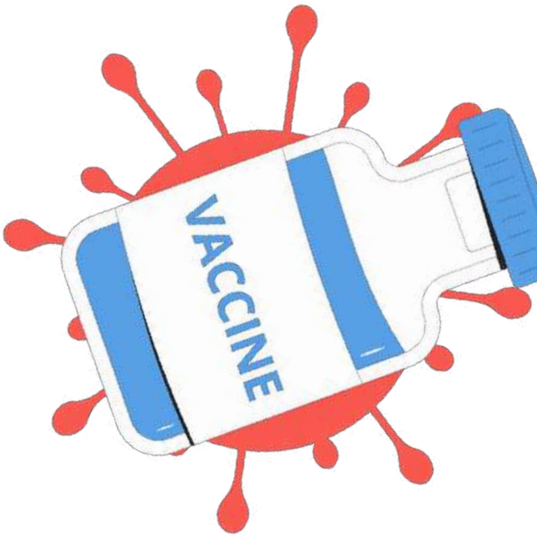

কোভিড -১৯ মহামারী এবং অন্যান্য প্রাণঘাতী ও ক্ষতিকর রোগের অবসানের জন্য নিরাপদ ও কার্যকরী ভ্যাকসিনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই অনেক ভ্যাকসিন প্রমাণিত হচ্ছে এবং উন্নয়নে যাচ্ছে যা খুবই উৎসাহজনক।

টিকা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে আমরা কোনোভাবেই সে রোগে আক্রান্ত হব না। যদিও ভ্যাকসিন পর্যাপ্ত সুরক্ষা দেয়, তাও আমাদের সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকার জন্য স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মেনে চলা উচিত।

তথ্যসূত্রঃ

উইকিপিডিয়া, হেলথলাইন, সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন, হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিসেস।

লেখায়ঃ

সামার মাসরেকা
জিন প্রকৌশল এবং জীবপ্রযুক্তি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

হৃদিতা বণিক
একাদশ শ্রেণি
সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

SIDE
EFFECT

ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

COVID-19
Coronavirus
Vaccine

সম্প্রতি কোভিড-১৯ সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় ওয়াকা খাতুন খুব চিন্তিত। নিজ সুরক্ষা এবং সংক্রমণ হার কমানোর জন্য তিনি ভ্যাকসিন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে ভ্যাকসিন এর প্রথম ডোজ দিয়ে আসলেন। কিন্তু তার সিদ্ধান্তই যেন তার জন্য কাল হয়ে গেল। প্রথম ডোজ নেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই জ্বর আর মাথাব্যথায় জর্জরিত হয়ে যায় তার শরীর সাথে যুক্ত হয় পেশিব্যথা। ওয়াকা খাতুন দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন এই ভেবে," হায় হায়! সংক্রমণ কমাতে গিয়ে কি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে ফেললাম?" চিন্তিত ওয়াকা খাতুন পর্যবেক্ষণ করলেন কিছুদিন পরই তিনি আগের মতো সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। তাহলে কেনো তিনি কয়েক দফা অসুস্থতার মধ্য দিয়ে গেলেন? বিস্তারিত জেনে নিই......

> "ভ্যাকসিন হল এক ধরনের জৈব রাসায়নিক যৌগ যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রশিক্ষণ দেয় যাতে এটি এমন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে যা এর আগে কখনো সংস্পর্শে আসেনি"

ভ্যাকসিন হল এক ধরনের জৈব রাসায়নিক যৌগ যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রশিক্ষণ দেয় যাতে এটি এমন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে যা এর আগে কখনো সংস্পর্শে আসেনি। ভ্যাকসিন দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অনাক্রম্যতা জন্মায় অ্যান্টিবডি তৈরির প্রক্রিয়াকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে।

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল ভ্যাকসিন বা টিকা। একজন ব্যক্তি একটি ভ্যাকসিন গ্রহণ করার পর, তার শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখানোর সম্ভাবনা বেশি কেননা শরীরে নতুন এবং ভিন্ন কিছু প্রবেশ করছে। এই প্রতিক্রিয়াগুলি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নামে পরিচিত। পৃথিবীতে আবিষ্কৃত কোনো ভ্যাকসিনই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ামুক্ত নয়। প্রতিটি ভ্যাকসিনের স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী পার্শ প্রতিক্রিয়া থাকবেই।

চলুন নিম্নে কিছু ভাইরাস এবং ভ্যাকসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক....

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস:

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস এমন একটি ভাইরাসের গ্রুপ যার ২০০ টিরও বেশি প্রকারভেদ রয়েছে এবং তন্মধ্যে ৪০ টি সরাসরি যৌন সংক্রমণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। খুবই ছোঁয়াচে এই ভাইরাসটি যা কেবল ত্বকের সংস্পর্শের মাধ্যমেই সংক্রমিত হতে পারে। এর প্রধান লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে :-
শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত সৃষ্টি, আঁচিল, গুটি বা ফুসকুঁড়ি দেখতে পাওয়া যা পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্যান্সারে রুপ নেয়। সাধারণত ৯ - ২৬ বছর বয়সী শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের *HPV* ভ্যাকসিন নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।২০০৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সরকারের কাছে এইচপিভি ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রায় ২৫,০০০ টি রিপোর্ট ছিল। শতকরা ৯০ ভাগই অযৌক্তিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এইচপিভি ভ্যাকসিনের সবচেয়ে সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি গৌণ যা শতকরা ১০ জনের মধ্যে ১ জনের হয়ে থাকে যেমন:

- ইনজেকশনের জায়গায় ক্ষত বা চুলকানি
- একটি উচ্চ তাপমাত্রা বা গরম এবং শিহরণ অনুভব করা
- অসুস্থ বোধ করা (বমি বমি ভাব)
- বাহু, হাত, আঙ্গুল, পা বা পায়ের আঙ্গুলে ব্যথা

এইচপিভি শটগুলির সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি হালকা এবং এক বা দুই দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়।

> "এইচপিভি ভ্যাকসিনের সবচেয়ে সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি গৌণ, যা শতকরা দশ জনের মধ্যে একজনের হয়ে থাকে"

ইনফ্লুয়েঞ্জা:

ইনফ্লুয়েঞ্জা মূলত একটি ভাইরাস যার আক্রমণে শরীরে জ্বর,সর্দি,কাশি ইত্যাদি উপসর্গ সহিত রোগ দেখা দেয় যা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সংক্ষেপে ফ্লু নামে পরিচিত। পূর্বে এটি মহামারী আকার ধারণ করলেও বর্তমানে ভ্যাকসিনের কল্যাণে তার প্রভাব অনেকাংশেই কম। ভ্যাকসিন গ্রহণ এর পর সাধারণত যে সব উপসর্গের দেখা মিলে তা হলো-

- হালকা জ্বর
- গলাব্যাথা
- মাথাব্যাথা
- ইঞ্জেকশন পুশ করার স্থান লালচে বা ফুলে যাওয়া
- বমি বমি ভাব
- মাংশপেশিতে ব্যাথা
- অবসাদ
- মূর্ছা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া

তবে যদি কারো ভ্যাকসিনে থাকা জিনিস যেমন ডিমের প্রোটিন বা অন্য কোনো জিনিসে অ্যালার্জি থাকে তবে তাদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন -

- শ্বাসকষ্ট
- দ্রুত হৃৎস্পন্দন হওয়া
- দুর্বলতা বা বিবর্ণতা
- কর্কশতা
- আমবাত (চামড়ায় র‍্যাশ উঠা)
- সাধারণত ভ্যাকসিন গ্রহণের ১৫ মিনিটের মধ্যে এই লক্ষণ সমূহ দেখা দিতে পারে। তাই ভ্যাকসিন গ্রহণের পর উক্ত সময় টিকাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকা ভালো ফলে কোনো লক্ষণ দেখা দিলে অতিসত্ত্বর ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

টিটেনাস:

এটি হলো এমন একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণ যা ক্লস্টিডিয়াম টেটানি নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়। এটি স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে পেশিকে শক্ত করে ফেলে যার ফলে রোগীর চেহারা শক্ত হয়ে ধনুকের মতন বেঁকে যায়। তাই বাংলায় এটিকে ধনুষ্টঙ্কার বলা হয়।

রোগটির প্রাথমিক লক্ষণগুলো হলো :

- চোয়াল এবং ঘাড়ের পেশি শক্ত হয়ে যাওয়া
- ইনজেকশনের জায়গায় ব্যাথা, লালভাব বা ফোলাভাব
- জ্বর
- মাথাব্যাথা বা শরীরে ব্যাথা
- ক্লান্তি
- বমি বমি ভাব, বমি বা ডায়রিয়া
- ক্ষুধামন্দা
- শিশু এবং ছোট বাচ্চাদের মধ্যে অস্থিরতা

বিরল ক্ষেত্রে, টিটেনাসের টিকা অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। গুরুতর এলার্জি প্রতিক্রিয়া সাধারণত টিকা দেওয়ার কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা পরে শুরু হয়।

- ত্বক ফ্লাশিং, চুলকানি বা ফোলাভাব
- আমবাত
- শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসকষ্টের অন্যান্য উপসর্গ
- মুখ এবং গলা ফোলা
- বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, বা পেটে খিঁচুনি
- মাথা ঘোরা, নিম্ন রক্তচাপ, দ্রুত হার্টবিট
- মূর্ছা যাওয়া

ইবোলা:

ইবোলা মূলত এক প্রকার ভাইরাস যা ২০১৩-২০১৬ সালে আফ্রিকায় মহামারীর মতো প্রকট আকার ধারণ করে। বর্তমান মহামারী কোভিড - ১৯ এর সাথে এর রোগ লক্ষণের অনেক মিল পাওয়া যায়। জ্বর, মাথাব্যাথা, মাংশপেশিতে ব্যাথা, গলাব্যাথা ইত্যাদি প্রাথমিক লক্ষণ রোগীর মাঝে দেখা মিলে। তবে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ২০১৯ সালে ইবোলা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিস্কার করতে সক্ষম হন তারা। ভ্যাকসিন গ্রহণের পর ব্যক্তির মাঝে হয়তো কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা

দিতে পারে। যেমন-

- মাথাব্যাথা
- মাংসপেশিতে ব্যাথা
- অবসাদ
- ফ্লু এর মতো জ্বর
- ভ্যাকসিন গ্রহণের স্থান লালচে বা ফুলে উঠা

সাধারণত ভ্যাকসিন গ্রহণের পর ৭ দিন পর্যন্ত এই লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এবং ৭ দিনের মাঝে লক্ষণ মিলিয়ে যেতে শুরু করে ও ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে।

> **"হাম এবং রুবেলা-র লক্ষণ কাছাকাছি কিন্তু একই নয় তাই অনেক সময় রুবেলাকে 'জার্মান হাম'ও বলা হয়"**

এমএমআর:

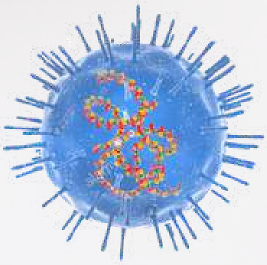

রুবেলা ভাইরাস

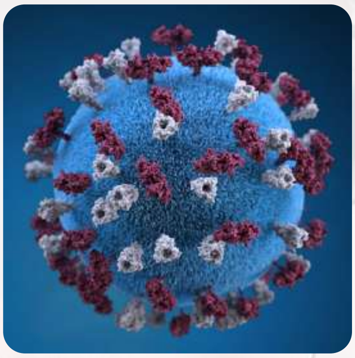

হাম
ভাইরাস

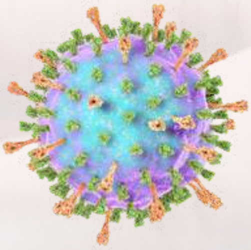

মাম্পস ভাইরাস

এমএমআর (MMR) ভ্যাকসিনটি হাম (Measles), মাম্পস (Mumps) এবং রুবেলা (Rubella) এই তিনটি ভাইরাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি ভ্যাকসিন। হাম একটি খুব সংক্রামক ভাইরাল রোগ যা বাতাসের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে ছড়িযয়ে পড়ে। উচ্চ জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া এবং চোখ দিযপানি পড়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া হাম এর লক্ষণ। মাম্পস হলো আরো একটি ভাইরাল সংক্রমণ যা প্রাথমিকভাবে লালা উৎপাদনকারী গ্রন্থিগুলিকে প্রভাবিত করে।

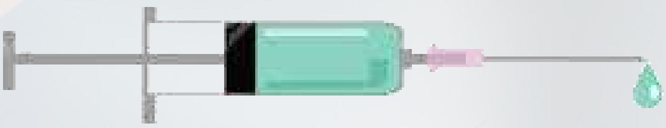

MMR

হেপাটাইটিস ই:

এইচইভি (*HEV*) ভাইরাস এর আক্রমণের ফলেই মূলত হেপাটাইটিস ই রোগ হয় । এইচইভি বা হেপাটাইটিস ই ভাইরাসটি মূলত আক্রান্ত ব্যক্তির মলের মধ্যে পাওয়া যায়। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হেপাটাইটিস ই ভাইরাস এ আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত অপর একজন আক্রান্ত ব্যক্তির মল দ্বারা দূষিত পানি পান করার মাধ্যমে নিজেরা এ ভাইরাস এ আক্রান্ত হয়। আধসেদ্ধ মাংস, শূকরের মাংস, হিংস্র বা বুনো শূকরের মাংস, শেলফিশ থেকেও হেপাটাইটিস ই ভাইরাস ছড়ায়। আক্রান্ত ছড়ায়।

এ ভাইরাস এ আক্রান্ত হলে ক্লান্তি, ক্ষুধা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। হেপাটাইটিস ই ভাইরাস এ আক্রান্ত অনেক রোগীর বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে কোনো ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি, যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক ভালো তারা বেশিরভাগ সময়েই কোনো ধরনের জটিলতা ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠে।এ রোগের প্রতিরোধ হিসেবে এখনও কোনো ধরনের ভ্যাকসিন বা টিকা আবিষ্কৃত হয়নি।

> **"বেশিরভাগ সময়েই কোনো ধরনের জটিলতা ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠে। এ রোগের প্রতিরোধ হিসেবে এখনও কোনো ধরনের ভ্যাকসিন বা টিকা আবিষ্কৃত হয়নি।"**

মূল আকর্ষণ

ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া সহ নানা আণুবীক্ষণিক অণুজীবের আক্রমণে দুর্বিষহ শতাব্দীর পর শতাব্দীর মানুষের জীবন। তবে থেমে নেই মানুষের প্রচেষ্টা। অক্লান্ত পরিশ্রম ও সময়ের ফলাফল হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে জীবন রক্ষাকারী হাজারো প্রতিষেধক। জীবন রক্ষায় তাদের ভূমিকা যেমন অপরিসীম তেমনই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার দরুণ জীবনে বিপদ নেমে আসা ও অকল্পনীয় কিছু নয়। তাই এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে ধারণা নিয়েই আমাদের জীবনে এদের প্রয়োগ করা সমুচিত। তা না হলে জীবন বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুমুখেই না আবার পতিত হয়!

তথ্যসূত্রঃ

সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন, ন্যাশনাল হেলথ সোসাইটি, ওয়েবএমডি।

লেখায়ঃ

আফরোজা সুলতানা মনি, ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
নাজিফা গওহার, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ
হালিমা ইফ্‌ফাত সামিয়া, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

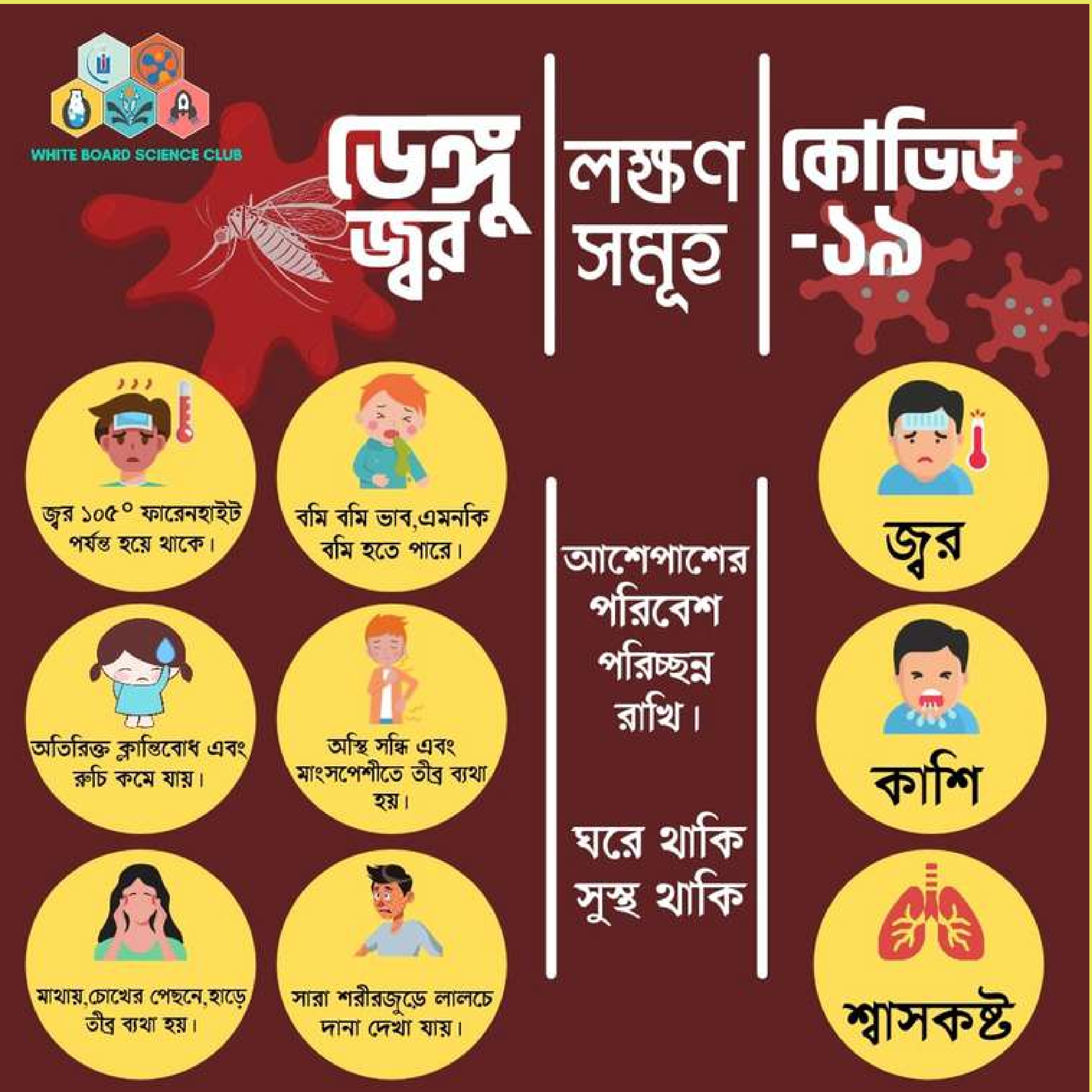
WHITE BOARD SCIENCE CLUB
ডেঙ্গু জ্বর
লক্ষণ সমূহ
কোভিড -১৯
জ্বর ১০৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে।
বমি বমি ভাব,এমনকি বমি হতে পারে।
অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ এবং রুচি কমে যায়।
অস্থি সন্ধি এবং মাংসপেশীতে তীব্র ব্যথা হয়।
মাথায়,চোখের পেছনে,হাড়ে তীব্র ব্যথা হয়।
সারা শরীরজুড়ে লালচে দানা দেখা যায়।
আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখি।
ঘরে থাকি সুস্থ থাকি
জ্বর
কাশি
শ্বাসকষ্ট

পরের সংখ্যাগুলোতে যা আসতে চলেছে...

নতুন রূপে পুরনো পড়া

নতুন রূপে পুরানো পড়া, নামটা শুনে কী মনে হচ্ছে তোমাদের? পুরানো কোন এক পড়াকে নতুন ভাবে জানার বা শিখার পদ্ধতি টাইপের কিছু কী? যদি তেমন হয়, তাহলে তুমি ঠিক! আমাদের ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে এমনই একটা অংশ থাকবে যেখানে তোমাদের স্কুলের বা পাঠ্যবইয়ের কঠিন কোনো বিষয়বস্তু একটু সহজ ভাষায় ও একটু ডিটেইল্ড ভাবে বোঝানো হবে। যদি তুমি তোমার বই এ "এ বিষয়ে পরবর্তী শ্রেণীতে আরো জানতে পারবে" দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে যাও, তাহলে এই শ্রেণীতেই আমরা তোমাকে সেটি সম্পর্কে বেশ ভালো একটা আইডিয়া কিন্তু দিতে পারব! নবম দশম শ্রেণী বা তার আগ পর্যন্ত যেকোন শ্রেণীর বই এ থাকা যেকোন শব্দ বা লাইন বা অংশ সম্পর্কে যদি বিস্তারিত জানতে চাও, তাহলে আর অপেক্ষা করা লাগবে নাহ পরবর্তী শ্রেণীতে উঠা পর্যন্ত। বরং পরবর্তী শ্রেণীতে উঠে গিয়েছে এমন অনেকেই তোমাকে তা জানিয়ে দিতে আছে প্রস্তুত! আর বাবা মা যদি আশংকায় থাকেন যে সায়েন্স ম্যাগাজিনে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোনো পড়া থাকবে নাহ, তাহলে তাদেরকে দেখিয়েই দিতে পারো এই অংশটি! ম্যাগাজিনেও পাঠ্যবইয়ের পড়া নতুনভাবে আনন্দ সহকারে এবং নতুন তথ্যসহ বিস্তারিত ভাবে জানা সম্ভব! অপেক্ষা করো পরবর্তী সংখ্যার জন্য!

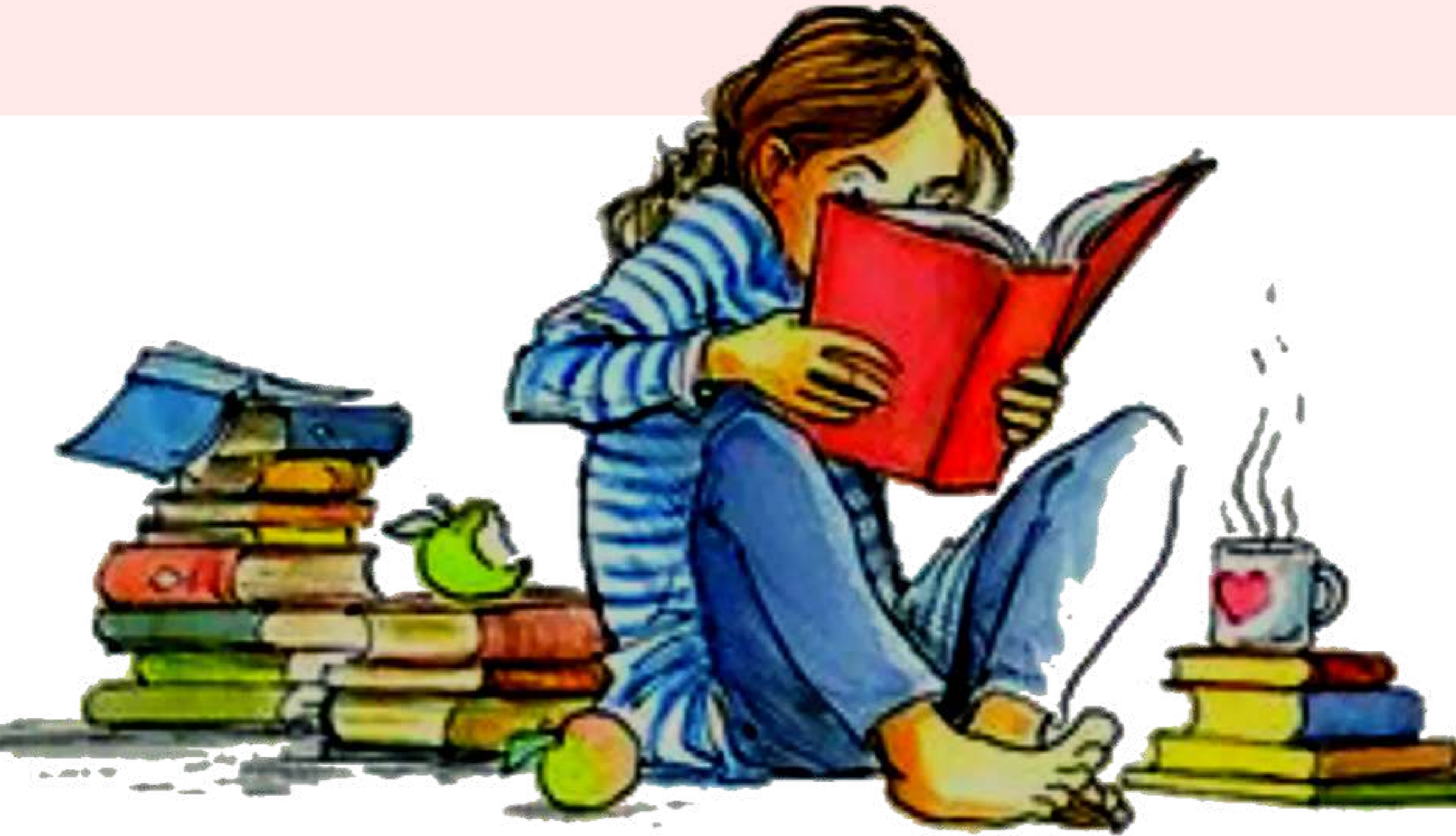

পরের সংখ্যাগুলোতে যা আসতে চলেছে...

নতুন রূপে পুরনো পড়া

আমরা তোমাদের থেকে জানতে চাই যে তোমাদের কোন অংশ বা শব্দ নিয়ে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। আমাদের থেকে রস-কষ যুক্ত অবস্থায় কী কী টপিক তোমাদের প্রয়োজন তা আমাদের জানাও। কীভাবে জানাবে? জানানোর প্রক্রিয়াটা সহজ। আমাদের ইমেইল এড্রেস বরাবর একটা ই-মেইল করতে হবে, অথবা জানাতে হবে আমাদের ফেসবুক পেইজের মেসেঞ্জারে। ইমেইলে তোমার নাম, শ্রেণী, বিদ্যালয় উল্লেখ করে তোমার যে বিষয়ের উপর "নতুন রূপে পুরানো পড়া" সেকশনে লেখা চাই সেই বিষয় বা অংশের কথা আমাদেরকে পাঠিয়ে দাও। আমরা খুব শীঘ্রই পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে তোমাদের এসব রিকুয়েস্ট থেকে বেছে বেছে বিষয় নিয়ে লেখা শুরু করে দিব!

আমাদের ই-মেইলের ঠিকানাঃ whiteorigins.wbsc@gmail.com
আমাদের ফেসবুক পেজঃ https://fb.me/whiteboardscienceclub

বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা ও ভ্যাক্সিন

করোনা মহামারী আমাদের প্রজন্মের কাছে নতুন করে অনেকগুলো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরেছে। তার মধ্যেই একটি হচ্ছে ভ্যাক্সিন। আমরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ভ্যাক্সিন এর নাম শুনছি।

আবার বাংলাদেশ সহ বেশিরভাগ ৩য় বিশ্বের দেশেই দেখছি ভ্যাক্সিন এর তীব্র সংকট।

তাই স্বভাবত প্রশ্ন জাগতেই পারে বাংলাদেশ কেন নিজের দেশে কোনো ভ্যাক্সিন ডেভেলাপ করছে না? তাহলেই তো এই ভ্যাক্সিন সংকট কেটে যেতো! এই ভ্যাক্সিন তৈরির পদ্ধতিই বা কী? বাংলাদেশের কি আদৌ ভ্যাক্সিন তৈরির সক্ষমতা আছে?

সত্যি বলতে যেকোনো ভ্যাক্সিন তৈরির জন্য একটি দেশের যে সক্ষমতাগুলো দরকার তার অনেকাংশেই বাংলাদেশের সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে। সীমাবদ্ধতাগুলো বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে একটা ভ্যাক্সিন ডেভেলাপ করার জন্য কী কী দরকার।

যেকোনো রোগের ভ্যাক্সিন ডেভেলাপ করা অনেক জটিল একটি প্রক্রিয়া। কোনো ফর্মুলা ব্যবহার করে একটি ভ্যাক্সিন তৈরি করলেই সে ভ্যাক্সিন আপনি বাজারে উন্মুক্ত করতে পারবেন না। আসলে আপনি এখনো মাত্র সবচেয়ে সহজ কাজটি করেছেন! এটিকে বাজারে ছাড়ার আগে আপনাকে অনেকগুলো ধাপ পার করে যেতে হবে।

আপনার প্রথম কাজ হবে ভ্যাক্সিনটি কোনো একটা পশুর উপর প্রয়োগ করে সেটি কতটুকু কার্যকর এবং নিরাপদ তা পরীক্ষা করা। ধরুন আপনি একটা ইঁদুর কিংবা বানরের উপর আপনার ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করলেন এবং দেখলেন এই ভ্যাক্সিন এর প্রভাব ভালোভাবেই কাজ করেছে। তাহলে আপনি এই ধাপও পাশ করে গেলেন।

কিন্তু আসল পরীক্ষা শুরু হবে এরপরেই। এবার আপনাকে আপনার ভ্যাক্সিন কীভাবে তৈরি করেছেন, ভ্যাক্সিনের নিরাপত্তা সব উল্লেখ করে রেগুলেটরি অথরিটির কাছে আবেদন করতে হবে লাইসেন্স এর জন্য। এই এপ্লিকেশন লেখা আবার আমাদের পাঠ্যবইয়ের আবেদনপত্রের মতো সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন অনেক দক্ষতা।

বাংলাদেশ বা এরকম বেশিরভাগ ৩য় বিশ্বের দেশের ফার্মাগুলোর এই রেগুলেটরি এপ্লিকেশন লেখার দক্ষ মানুষের ও অভাব আছে। যদি ধরেও নি যে এই সক্ষমতা আমাদের আছে, এরপরেও কাহিনী শেষ হয়ে যায় না। আমাদের দেশে এই রেগুলেটরি ডাটাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারবে এমন কোনো দক্ষ রেগুলেটরি অথরিটি আছে কিনা তাও নিশ্চিত নয়।

তাই অনেক সময় আমাদের এই আবেদন করতে হয় *FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, USA)* কিংবা *TGA (THERAPEUTIC GOODS ADMINISTRATION, AUSTRALIA)* এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে!

যখন এই রেগুলেটরি সংস্থা থেকে আপনি ছাড়পত্র পাবেন তখনই আপনি ক্লিনিকাল হিউম্যান ট্রায়াল এ যেতে পারবেন। অর্থাৎ ভ্যাক্সিনটি মানুষের উপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা করতে পারবেন। এই হিউম্যান ট্রায়াল আবার তিন ধাপে হবে। প্রথমে কম সংখ্যক মানুষের উপর প্রয়োগ করা হবে এরপর ধীরে ধীরে মানুষের সংখ্যা বাড়ানো হবে! এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এই খরচ হতে পারে ১০০ মিলিয়ন থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত! আমাদের দেশের বড় বড় ফার্মাগুলোর এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানোর সামর্থ্যই নেই!

VACCINE
Coronavirus
VACCINATION
COVID-19
CORONAVIRUS

এই তিন ধাপ পার করতে পারলেই আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেল এ ভ্যাক্সিন বানানো শুরু করতে পারবেন! আবার তখনও রেগুলেটরি সংস্থাগুলো যাচাই করবে আপনার উৎপাদন পদ্ধতি সহ সার্বিক অবস্থা।

এছাড়াও ভ্যাক্সিন এর দাম নির্ধারণ ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ভ্যাক্সিনের দাম বেশি হলে বাংলাদেশের মতো ৩য় বিশ্বের দেশগুলোতে এই ভ্যাক্সিন কেউ কিনবেই না। তাই এর উৎপাদন যথাযথভাবে চালু রেখে দাম কম রাখতে সরকারের ভর্তুকির প্রয়োজন।

সবকিছু মিলিয়ে তাহলে বুঝতেই পারছি আমাদের কত সীমাবদ্ধতা এখানে রয়ে গেছে।

তাহলে গ্লোব বায়োটেক এর কোভিড ভ্যাক্সিন আবিষ্কার কি মিথ্যা?

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে বাংলাদেশের গ্লোব বায়োটেক ফার্মা যে বঙ্গভ্যাক্স নামের কোভিড ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের দাবি তুলেছিলো সেটা কি তাহলে মিথ্যা?

না, এটিও কোনোভাবেই মিথ্যা নয়। কিন্তু তারা এখনো ভ্যাক্সিন ডেভেলাপ এর মাত্র শুরুর দিকের ধাপগুলোতে আছে। খরগোশ এবং ইঁদুর এর উপর ভ্যাক্সিন টি প্রয়োগ করে এই ভ্যাক্সিনটিকে নিরাপদ দাবি করলেও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এ তারা এখনো যেতে পারে নি। ভ্যাক্সিনটির রেগুলেটরি অথরিটি হিসেবে কাজ করছে *BMRC* (*BANGLADESH MEDICAL RESEARCH CENTRE*)।

এই জায়গায় সরকার এবং *BMRC* এর ভূমিকা নিয়েও বেশ প্রশ্ন থেকে যায়। কেননা, কোনোরকম ব্যাখ্যা ছাড়াই এই ভ্যাক্সিন এর ট্রায়াল ৫ মাস ধরে আটকে ছিলো। সম্প্রতি বলা হয়েছে, এই ফার্মাকে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যেতে হলে আরো কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। শর্তগুলো কী তা এখনও পুরোপুরি জানা না গেলেও এর মধ্যে বানর ও শিম্পাঞ্জির উপর ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করে যাচাই করার কথা বলা আছে বলে জানা যায়। তাই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যাওয়ার পথে আরো একটি বাঁধা এখনো থেকে গেছে।

আবার, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে গেলেও গ্লোব বায়োটেক এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানোর মতো আর্থিক সক্ষমতা আছে কিনা সেটাও প্রশ্নের মুখে (বলতে গেলে বাংলাদেশের খুব কম ফার্মারই হয়তো আছে)। তাই তাদের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও ভ্যাক্সিন নিয়ে তাদের উপর এখনই ভরসা করে বসে থাকা টা বাস্তববাদী নয়। কেননা, এই ধাপগুলো পার হতে গেলেও তাদের অনেক বেশি সময় প্রয়োজন। আবার, এর সফলতা কতটুকু আসবে তাও এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

তাই আমরা বাস্তবতা চিন্তা করলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখন পর্যন্ত ভ্যাক্সিন ডেভেলাপ এর জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। করোনা মহামারী চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে কেন এই প্রস্তুতি জরুরি। তাই এখন থেকে আমাদের ধীরে ধীরে অবকাঠামোগুলো গড়ে তুলতে হবে। সরকার কিংবা *BMRC* এর মতো রেগুলেটরি সংস্থা গুলোকে আরো বেশি সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে যাতে দেশের কোম্পানিগুলো এই কাজ সহজভাবে করতে পারে। তাহলে হয়তো আমরাও একদিন নিজেদের ভ্যাক্সিন তৈরি করবো!

তথ্যসূত্রঃ

উইকিপিডিয়া, হিস্টোরি অফ ভ্যাক্সিন্স।

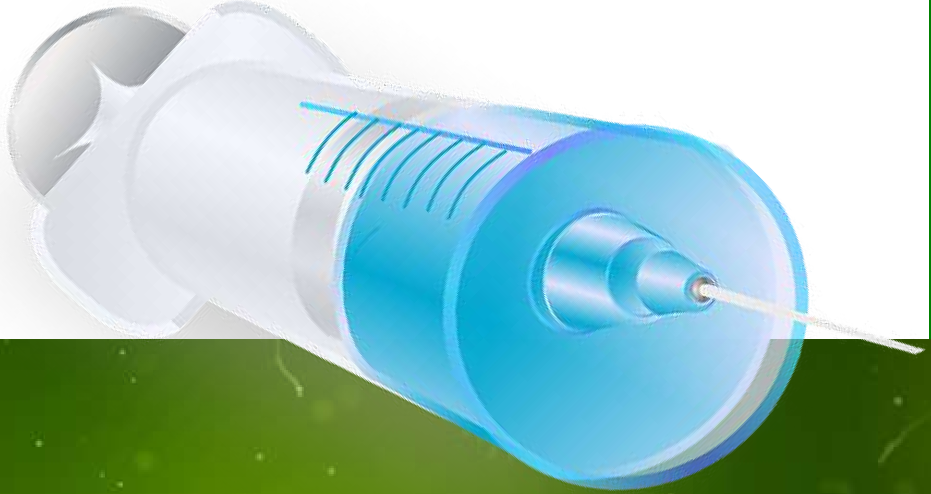

লেখায়ঃ

সীমান্ত, নটরডেম কলেজ, ঢাকা
মোঃ আল নোমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিকার নাকি প্রতিরোধ?

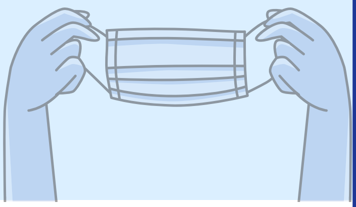

স্কুলের মাঠে টিফিন পিরিয়ডে হইহই করে খেলাধুলা করার সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। তোমাকে আর পায় কে? মাঠ থেকে যতক্ষণে স্কুলটিচারেরা তোমাদের ক্লাসে ঢোকান, ততক্ষণে তোমার ভিজে একসার হওয়া শেষ। ক্লাসে বেঞ্চির নিচে পা থেকে ভেজা মোজা জুতা খুলে ভিজে গায়েই স্কুল শেষ করলে তুমি।

বাসায় এসে বিকালের ভেতর তোমার এলো গা কাঁপিয়ে জ্বর। সাথে ফ্রিতে বৃষ্টিতে ভিজে “অসুখ” বাঁধানোর জন্য থাকলো মায়ের বকুনি।

আসলেই কি জ্বর একটা অসুখ? একটা রোগ? কিংবা শারীরিক সমস্যা? আমরা জ্বর হলেই একগাদা প্যারাসিটামল খেয়ে জ্বর দাবিয়ে দেই- কাজটা কি ঠিক হয়? মানুষ কেন অসুখে ভোগে? অসুস্থতা আমাদের কারোরই পছন্দের নয়। কি করলে অসুখ থেকে দূরে থাকা যায় আর কেনই বা অসুখ থেকে দূরে থাকা দরকার- তা নিয়ে কিছু কথা বলা যাক।

পৃথিবীতে রোগবালাইয়ের কোনো কমতি নেই। পুরোনো রোগ তো আছেই, সাথে প্রায়ই পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে একেকটা নতুন রোগ ধরা পড়ে। যেমন ধরা যাক, কথা নেই বার্তা নেই, গত ২০১৯ সালে নতুন অতিথি কোভিড -১৯ এসে উপস্থিত হলো। বড় বড় রোগবালাইগুলো আচমকাই এসে উপস্থিত হয়। তবে প্রায় প্রত্যেক রোগের মধ্যে কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণ থাকে। জ্বর, সর্দি, কাশি, হাঁচি-এইগুলো অনেকগুলো রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়। এই যে শুরুতে বললাম জ্বরের কথা, জ্বর কিন্তু নিজে কোনো অসুখ নয়। সে অসুখের জানান দেয় শুধু। শরীরে রোগজীবাণু ঢুকলে তাদের মারার জন্য আমাদের ইম্যুনিটি সিস্টেম যে প্রতিরোধ তৈরি করে, তারই ফলাফল এই জ্বর।

রোগের আবার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। বইয়ের ভাষায় বলা যায় অভাবজনিত রোগ, সংক্রমণ ব্যাধি, বংশগত রোগ, শারীরবৃত্তীয় রোগ, যৌনরোগ ইত্যাদি। দেখা যাক সোজা বাংলায় ব্যাপারটা বোঝানো যায় কিনা।

অভাবজনিত রোগ মানে শরীরের প্রয়োজনীয় কোনো উপাদানের ঘাটতির কারণে হওয়া অসুখ। এ রোগগুলো হয় ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন, প্রোটিন এরকম উপাদানের অভাবে।

শরীরে পুষ্টির ঘাটতি দেখা যায় কেন?

কারণ তোমার প্রিয় খাবার জাঙ্কফুডে এসব পুষ্টি উপাদান থাকেনা। থাকে তোমার চোখের বিষ ঢেঁড়স, ঝিঙা, লাউ, বেগুন, পটল, শিম, বরবটির মতো সবজিগুলোতে। তোমার মা তাই তোমাকে এসব খাওয়ানোর জন্য প্রায় প্রাণ দিয়ে ফেলে, যেন তোমার অসুখ না হয়।

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অণুজীব এইগুলোর কারণে সংক্রমক রোগ হয়। এরকম সংক্রমক রোগগুলো যে কতটা ভয়ানক হতে পারে, তার প্রমাণ হলো কোভিড-১৯ আর অতীতে ফেলে আসা প্লেগ, কলেরা, ফ্লু-এর ঘটনা। গ্রামের পর গ্রাম নয় শুধু, গোটা শহর নিশ্চিহ্ন করে ফেলতো অনেক ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়া।

অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের কারণে হয় ক্যান্সার। আমাদের কোষগুলো বিভাজিত হয় বলে আমাদের শরীরের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু আজীবনই যদি কোষ বিভাজিত হতে থাকতো, তাহলে একজন মানুষের সাইজ হতো ডাইনোসরের সমান। কাজেই আমাদের কোষে সংকেত দেওয়া থাকে কখন কোষ বিভাজন বন্ধ করতে হবে।

অনেকসময় শরীরের নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গের কোষের এই সংকেতে গোলমাল হয়ে যায়। তখন তৈরি হয় টিউমার। টিউমারের চিকিৎসা তুলনামূলকভাবে সোজা-যদি না এই টিউমার ক্যান্সারে রুপান্তরিত হয়ে যায়,কারণ তখন চিকিৎসা কঠিন হয়ে যায়। ক্যান্সারের পুরোপুরি নিরাময় অনেকসময় সম্ভব হয় না। তাছাড়া বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই চিকিৎসা অনেক বেশি ব্যয়বহুল।

এতক্ষণ বললাম নানারকম রোগের ধরণের কথা। এখন আসা যাক সুস্থতার বিষয়ে। বিভিন্নরকম রোগ থেকে সেরে ওঠার জন্য রয়েছে প্রতিকার ও প্রতিরোধ। তবে অনেক রোগের প্রতিষেধক; অর্থাৎ চিকিৎসা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এইরকম রোগগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে একমাত্র হাতিয়ার হলো **প্রতিরোধ।**

কারণ শরীরে রোগই যদি না হয়, তাহলে আর তার চিকিৎসারও প্রয়োজন হবেনা। সোজা অংক।

রোগ প্রতিরোধের জন্য তোমাকে বেশকিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। ধরা যাক, কোভিড পরিস্থিতির কথা। এখন করোনা মহামারীতে মুখে মাস্ক পরতে হচ্ছে, বারবার হাত ধুতে হচ্ছে, বাইরে বের হলে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে, চুল ধরে চোখে, মুখে, নাকে হাত না দেয়া-এরকম বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছে। যারা এসব নিয়ম না মেনে “আমরা করোনার চেয়ে বেশি শক্তিশালী” স্লোগান দিতে দিতে অযথা ঘোরাঘুরি করছে, তারা নিজেদের সাথে সাথে অন্যদের জীবন ও ঝুঁকিতে ফেলে।

তাছাড়া প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া মানুষের মধ্যেও এত নিয়ম মানার বালাই নেই। ফলাফল উচ্চ সংক্রমণ আর মৃত্যুহার। তাই ভালো থাকার জন্য যেকোনো সংক্রামক রোগে তোমাকে এসব নিয়ম মানতেই হবে।

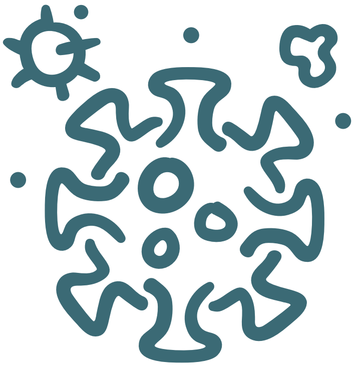

সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, সবসময় চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, এসব আমাদের ছোটবেলা থেকে শিখে আসা স্বাস্থ্যবিধি।এত সচেতন থাকার পরেও কিংবা ইচ্ছে করে অসচেতন থাকার জন্য যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পরে , তাহলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে।চিকিৎসা ব্যবস্থাই একটি রোগ নিরাময়ের শেষ অবস্থা। কখনো রোগ লুকিয়ে রেখে দেয়া ঠিক না। চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের পর রোগীর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। আর চিকিৎসা শুরুর দুইদিন পর শরীর ভালো লাগলেই নিজের ইচ্ছামতো ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলে চলবেনা।

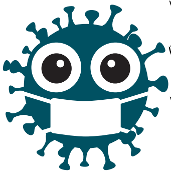

> "অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের কারণে হয় ক্যান্সার। আমাদের কোষগুলো বিভাজিত হয় বলে আমাদের শরীরের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু আজীবনই যদি কোষ বিভাজিত হতে থাকতো, তাহলে একজন মানুষের সাইজ হতো ডাইনোসরের সমান। "

"ব্যক্তিগত সচেতনতায়
মাস্ক একান্ত জরুরি।"

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলোর নিরাময় হয় না। একারণে জটিল রোগগুলোতে যাতে কেউ আক্রান্ত না হয়ে পরে তা নিয়ে সচেতন থাকতে হয়। কোন রোগে আক্রান্ত হলে তা জটিল রুপ ধারণ করার আগেই ব্যবস্থা নিতে হবে। হাঁচি, কাশি দেয়ার সময় অবশ্যই রুমাল অথবা টিস্যু ব্যবহার করা, রোগীকে সবসময় ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, লৌহ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানো, সময়মত ওষুধ সেবন করানোর ব্যাপারে হেলাফেলা করা যাবেনা। শিশুদের এসব রোগবালাই থেকে দূরে রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় টিকা দিয়ে নেওয়া। আমাদের অনেকের বদঅভ্যাস নিজের ইচ্ছামতো ওষুধ খাওয়া। এটা করা যাবেনা। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ওষুধ খাওয়া উচিত নাহ, কোন রোগে কতটুকু মাত্রার, কোন ওষুধ নিতে হয় তা একজন ডাক্তারের চেয়ে ভালো করে কেউ জানবেন না। অন্যের কথা শুনে বা ইউটিউব দেখেও ওষুধ নেওয়া যাবে না। এতে নিজের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বারোটা বাজানো আর সাময়িক সুস্থতা ছাড়া তেমন কোনো লাভ নেই। যেমন ধরো ডেঙ্গুতে জ্বর হয়। সেই জ্বরে কেউ যদি রোগীকে অ্যাসপিরিন খাইয়ে দেয়, তাহলে রোগীকে আর দেখতে হবেনা।

ব্যাথানাশক ওষুধ সেবনের ক্ষেত্রে নজর দেয়া প্রয়োজন। ব্যাথানাশক ওষুধের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত "প্যারাসিটামল"। আমাদের মাঝে অনেকে হালকা মাথাব্যাথা হলেই মুড়ি-মুরকির মত দুইবেলা প্যারাসিটামল গেলা শুরু করে। মাথাব্যাথা এতে সেরে যেতে পারে, তবে প্যারাসিটামল মুড়ি-মুরকির মতো গিললে কয়েক বছরের মধ্যে কিডনি স্থায়ীভাবে ড্যামেজ হয়ে যাবার কঠিন সম্ভাবনা রয়েছে।

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অণুজীবঘটিত রোগগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত জ্বর, মাথা ব্যাথা, ক্ষুধামন্দা, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। এসব রোগে রোগীকে ভিটামিন- সি জাতীয় খাবার খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। আর কোন ওষুধ খাওয়ানো দরকার তা জানার জন্য ডাক্তারের কথাই শুনতে হবে।

হাঁচি, কাশি দেয়ার সময় অবশ্যই রুমাল অথবা টিস্যু ব্যবহার করা, রোগীকে সবসময় ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, লৌহ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানো, সময়মত ওষুধ সেবন করানোর ব্যাপারে হেলাফেলা করা যাবেনা।

অভাবজনিত রোগগুলো বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অভাবে হয়। আমাদের দেশে এরকম মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি।

অভাবজনিত রোগের মধ্যে গয়টার,রাতকানা, রিকেটস, রক্তশূন্যতা-এগুলো পরিচিত রোগ। আবার পেটে কৃমি হলেও পুষ্টির ঘাটতি দেখা যায়।এইসব রোগের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ হলো ঠিকমত আয়োডিন, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন বি-১২, ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া।

এতকিছু মনে না থাকলে চোখ বুজে ঘ্যানঘ্যান না করে মা যে সবজিগুলো রেঁধে দেয় তা খেয়ে ফেলবে। আর কৃমি যাতে না হয় তার জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থেকে নিয়ম করে তিন মাস পরপর কৃমির ওষুধ খাবে।

রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস, তরল খাবার খেতে দিতে হবে।ব্যাথা ও জ্বর কমানো জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দেওয়া যায়, তবে ডাক্তারকে একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো। কলেরা আক্রান্ত রোগীকে ডাবের পানি আর খাবার সেলাইন দিতে হয়। আর ডাক্তারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

আর এরকম রোগগুলোর প্রতিরোধ হিসেবে রোগীকে ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় আনতে হবে। ভ্যাক্সিন গ্রহণের কারণে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে দেহে দীর্ঘদিন উপস্থিত থাকে। ভ্যাক্সিনে হাম, হুপিংকাশি, পোলিও, টাইফয়েডের মত জটিল রোগের হাত থেকে বাঁচা যায়। ভাইরাল হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে প্যান্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রতিরোধে এডিস মশা নিধনের ব্যবস্থা করা দরকার।তবে আমাদের দেশে মশা মারার জন্য সিটি কর্পোরেশনগুলোর তেমন মাথাব্যাথা দেখা যায় না।তাই মশারী টানিয়ে ঘুমানো, মশার কয়েল অথবা ইলেকট্রিক ভ্যাপার ম্যাট ব্যবহার করতে হবে। মশার কয়েলে অত্যন্ত ক্ষতিকর উপাদান থাকে। তাতে মশার পাশাপাশি তোমারও সমস্যা হতে পারে। তাই মশার কয়েল এড়িয়ে চলা ভালো। কলেরা আক্রান্ত রোগীকে কলেরা ভ্যাকসিন নিতে হবে। সোজা কথায়, রোগজীবাণুবাহিত রোগগুলোর প্রতিরোধে ভ্যাকসিনের কোনো বিকল্প নেই।

ভ্যাক্সিন গ্রহণের কারণে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে দেহে দীর্ঘদিন উপস্থিত থাকে। ভ্যাক্সিনে হাম, হুপিংকাশি, পোলিও, টাইফয়েডের মত জটিল রোগের হাত থেকে বাঁচা যায়।

আমাদের দেশের গরিব মানুষেরা দিনে দুবেলা ভালো করে খেতে পায়না। তাদের জন্য এত হিসেব করে যথাযথ পুষ্টিকর খাবার খাওয়া একধরণের বিলাসিতা। তাছাড়া শহরের বস্তি আর ছিন্নমূল মানুষ কিংবা গ্রাম-গঞ্জের মানুষও তেমন পুষ্টিজ্ঞান থাকেনা। যার কারণে তাদের মাঝে এধরণের রোগ অনেক বেশি দেখা যায়। এইধরণের মানুষেরা যাতে এসব তথ্য জানতে পারে, সুস্থ থাকে, ঠিকমতো পুষ্টিকর খাবার পায়; সে বিষয় নিয়ে কাজ করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো। এখন দেশে অপুষ্টিজনিত রোগ আগের তুলনায় বেশ কমে এসেছে।

যৌন সংক্রামক রোগ নিরাময় করা কঠিন। এইসব রোগে আক্রান্ত হলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। এক্ষেত্রে লুকিয়ে রাখার যে প্রবণতা থাকে মানুষের, তা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। নয়তো রোগগুলো জীবন যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া রোগ হয়ে যাওয়ার পর আর লজ্জা পেয়ে লাভ নেই। রোগ হওয়ার আগে নিয়ম মেনে চললে উপকার হতো।

কথায় আছে স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ-ই উত্তম।

রোগমুক্ত থাকার প্রথম উপায় হলো প্রতিরোধ। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের খাবার আর তার ভিতরে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের একটি বিরাট ভূমিকা থাকে। চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদেরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য খাদ্য উপাদানের মধ্যে জিঙ্ক এর উপর বেশি গুরুত্ব দেন। চর্মরোগ হলে আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার ও শুকনো রাখতে হবে। রোগে আক্রান্ত হলে আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সচেতন থাকলে রোগ থেকে দ্রুত নিরাময় পাওয়া সম্ভব। ভিটামিন-ডি এর প্রধান উৎস হলো সূর্য। ভিটামিন-ডি এর অভাব থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রতিদিন বেলা ১১ টা থেকে ৩ টার ভিতরে হাত, পা, মুখমন্ডলে কিছু সময়ের জন্য রোদ লাগাতে হবে। সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, দূষিত পানি, বাসি খাবার বর্জন করা, রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ব্যবহার না করা- অর্থাৎ আজীবন স্কুলে মুখস্থ করে আসা স্বাস্থ্যবিধিগুলো মানতে হবে।

অনেকসময় নিয়ম না মানাকে একধরণের গর্বের বিষয় হিসেবে দেখা হয়। এই প্রবণতা বাদ দিয়ে নিজেকে সুস্থ রাখলে চারপাশের পরিবেশ আর দেশ-দুটোই ভালো থাকবে।

লেখায়ঃ

হৃদিকা বিশ্বাস, চট্টগ্রাম কলেজ
তনিমা দত্ত, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

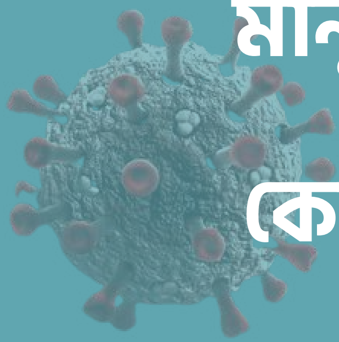

মানুষ ও এইচআইভি ভাইরাসের যুদ্ধের ইতিবৃত্তঃ কেন আমরা প্রতিষেধক সন্ধানে এখনো ব্যর্থ?

মহামারীর এ সময়ে প্রাণ বাঁচানোর লড়াইয়ে পুরো পৃথিবী স্থবির হয়ে আছে। এমন এক কালো সময় পৃথিবী পার করছে যে বিশ্বের সাথে একই সুরে আমাদেরও ধীরে ধীরে সবকিছু মানিয়ে চলতে হচ্ছে। প্রকৃতি আজ নিস্তব্ধ, চারপাশে শুধুই মৃত্যুর মিছিল। কী হচ্ছে, কী হবে সেসব ভেবে কোন যুতসই উত্তর মিলাতে পারছি না আমরা। এতকিছুর মধ্যেও মহামারি থেকে উত্তরণে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর বিজ্ঞানী বা গবেষকেরা বেশ দ্রুত গতিতে মনোযোগী হয়ে টিকা আবিষ্কারের কাজ করছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবিধ মহামারীর কারণে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে কারণ তখন অণুজীব বিষয়ে মানুষের জ্ঞানের পরিধি ছিল খুব অল্প। আবার অণুজীব বিষয়ে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের পরে কিছু ক্ষেত্রে টিকা আবিষ্কার করা গেলেও অনেক ক্ষেত্রে এখনও সম্ভব হয়নি। তেমনি এইচআইভি ভাইরাস নির্মূলেও কোনো প্রতিষেধক বা টিকা আবিষ্কার হয়নি। ফলে থামানো যায় নি এইচআইভি সংক্রমিত রোগের কারণে মানুষের মৃত্যুর মিছিল!

আচ্ছা, মানব ইতিহাসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে সুবর্ণ এই সময়টায় এসেও এখনো মানুষ কেন এই রোগের কাছে ব্যর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করে আছে?

এইচআইভি (*Human Immunodeficiency Virus*) হলো মানব শরীরের প্রতিরক্ষায় ঘাটতি সৃষ্টিকারী ভাইরাস। এটি লেন্টিভাইরাস গোত্রের অন্তর্গত একধরণের রেট্রোভাইরাস যা আমাদের শরীরের রোগপ্রতিরোধী কোষগুলোকে আক্রমণ করে। রেট্রোভাইরাস হলো এমন একটি ভাইরাস, যা আরএনএ কে তার জিনগত উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে। যখন একটি রেট্রোভাইরাস একটি কোষে সংক্রমিত হয়, তখন এটি তার জিনোমের একটি ডিএনএ অনুলিপি তৈরি করে যা হোস্ট কোষে অর্থাৎ সংক্রামক প্রতিনিধি দ্বারা আক্রমণ করতে সক্ষম এমন একটি জীবন্ত কোষের ডিএনএতে সন্নিবেশিত হয়।

হোস্ট কোষগুলো যখন জিনগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে তখন মানবদেহে তাদের ঘাটতির কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। আর এই সুযোগটি গ্রহণ করেই এইচআইভি ভাইরাস মানবদেহের বারোটা বাজায়।

যদি এইচআইভির চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এটি আপনাকে এইডস (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) রোগের দিকে ধাবিত করতে পারে। এইডস হলো আমাদের শরীরের এমন একটি অবস্থা যেখানে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রগতিশীল ব্যর্থতা প্রাণঘাতী সুবিধাবাদী সংক্রমণ এবং ক্যান্সারের বিকাশ ঘটায়। মানবদেহ এইচআইভি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে না এবং এইচআইভির কার্যকর কোনো চিকিৎসা নেই। সুতরাং, একবার আপনি যদি এইচআইভি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার এটি সারা জীবনের জন্য বহন করতে হবে।

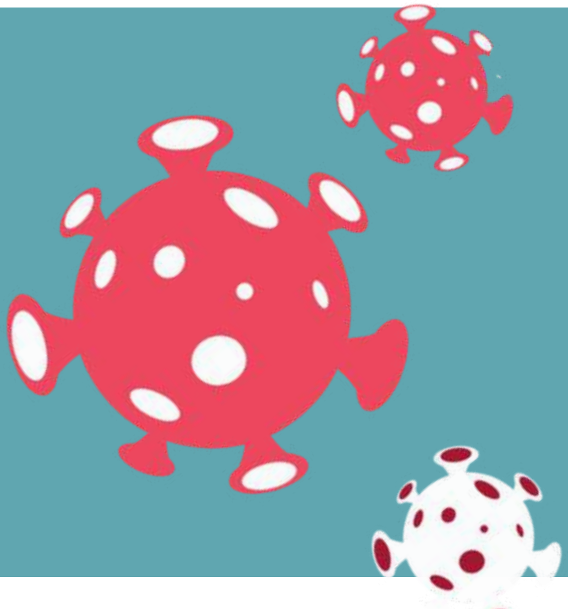

কোভিড- ১৯ এর সংক্রমণ দিন দিন বাড়ছে, বাড়ছে মৃত্যুর হার। কিন্তু সবার জন্য আনন্দের বিষয় হলো চলতি সময়ে মানব শরীরে করোনার ভ্যাকসিনের ফলশালী প্রয়োগে পুরো বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়েছেন রুশ বিজ্ঞানীরা। রাশিয়ার তৈরি ভ্যাকসিনটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘স্পুটনিক-৫’। এই ভ্যাকসিনটি সাধারণ মানুষের উপকার করে বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ এখনো পর্যন্ত এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য কোনো প্রকারের ভ্যাক্সিন আবিষ্কৃত হয় নি। যেখানে কয়েক মাসের মধ্যেই করোনার কিছু ফলপ্রসূ ভ্যাক্সিনের দেখা মিলেছে!

১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র সিডিসি সর্বপ্রথম রোগটি সম্পর্কে জানতে পারেন এবং পরবর্তী ১৯৮০-র দশকের শুরুর দিকে এই রোগের কারণ হিসেবে এইচআইভি ভাইরাসকে চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবা বিভাগ ১৯৮৪ সালে জানিয়েছিলেন যে, তারা এইচআইভি ভাইরাসের ভ্যাক্সিনটি আগামী দু'বছরের মধ্যে প্রস্তুত করবেন। কিন্তু বারে বারে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এইডস রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কারে ব্যর্থ হন। কিন্তু এভাবে তো পরাজয় স্বীকার করলে চলবে না, ব্যর্থতা কাটিয়ে সফলতা অর্জন করতেই হবে। তাই ভ্যাক্সিন সন্ধানের প্রক্রিয়া এখনো চলমান। পরবর্তীতে রক্তপরীক্ষা করে এইডস-এর সংক্রমণ পরীক্ষণ করা শুরু হয়, পরীক্ষণের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৬ সাল থেকে অ্যান্টিরিট্রোভাইরাল ড্রাগসের ব্যবহার চালু করা হয়। এই ড্রাগগুলি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ভাইরাসের মাত্রা হ্রাস করে এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত কোনো মা যেন তার সন্তানকে অথবা দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যাতে ভাইরাসটি সংক্রমিত না হতে পারে, তার ব্যবস্থা করে। যখন মানবশরীরে অ্যান্টিরিট্রোভাইরাল ওষুধ বন্ধ করা হয় তখন ভাইরাস তার নিরাপদ আস্তানা থেকে বেরিয়ে রক্তস্রোতে মিশে গিয়ে আবার শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

> **"কাজেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয় যে এই ভাইরাসটি কীভাবে এবং কোথায় এতো কার্যকারীভাবে আত্মগোপন করে?"**

একটি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে ২০ জন রোগীর মধ্যে ১৮ জনের ক্ষেত্রে অ্যান্টি-ক্যানসার ড্রাগটি ভাইরাসকে তার গোপন জায়গা থেকে বের করতে পেরেছে।

অ্যান্টিরিট্রোভাইরাল মেডিসিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নবজাত শিশুকে তার জন্মের ৩০ ঘণ্টার মধ্যে অ্যান্টিরিট্রোভাইরাল ব্যবহার করে ভাইরাসমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিটি ‘‘ফাংশনাল কিউর" নামে পরিচিত যেখানে সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে অ্যান্টিরিট্রোভাইরাল দিয়ে নির্মূল করা হয়। কিন্তু এইচআইভি-র টিকা আবিষ্কারে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি। এই অমীমাংসিত রহস্যজনক ভাইরাস, যা অক্লেশে নিজের রূপের পরিবর্তন করে, তার অ্যান্টিবডির সন্ধান পাওয়া প্রায় অমাবস্যার চাঁদের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> **"পরীক্ষণের উপর ভিত্তি করে '৯৬ সাল থেকে অ্যান্টিরিট্রোভাইরাল ড্রাগসের ব্যবহার চালু করা হয়।"**

এই ভাইরাসের কাঠামোগত ও মানব শরীরের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রতীকী কারণেই এর ভ্যাক্সিন তৈরির প্রচেষ্টাগুলো ক্ষণেক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। তবে এতসব প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০০৯ সালে থাইল্যান্ডে করা ‘RV144 HIV Trial’ পরীক্ষণটি । এই ভ্যাক্সিনটি বিপন্মুক্ত ও সহজে বহনীয় হওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে এর থেকে আমরা মধ্যম মানের সুবিধা পাচ্ছিলাম যার কারণে এটিও ব্যর্থ ঘোষণা করা হয়। তবে এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা ধরা দিলেও এর মাধ্যমে পরবর্তী পরীক্ষণের পথগুলো সুগম হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল এইডস ভ্যাক্সিন ইনিশিয়েটিভ (IAVI) এর মানব রোগ-প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নির্বাহী পরিচালক ড. জিল গিলমোর বলেন, “নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে মিলে আমাদের পরিকল্পনা আজ অনেক বেশি বিচিত্র ও বলিষ্ঠ।”

HIV
Vaccine

'RV114 HIV Trial ভ্যাক্সিন'

এইচআইভি ভ্যাক্সিন শুরুর দিকে মূলত তিনটি ধাপে পরীক্ষাগারে ও বিভিন্ন প্রাণী দেহে প্রয়োগ করা হয় যাতে মানুষের উপরে চূড়ান্ত প্রয়োগের পর এটি কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন না করে। প্রতিটি চলমান ধাপে সময়ের সাথে সাথে পরীক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমে এইচআইভি নেগেটিভ মানুষের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। বর্তমান সময়ে আমাদের শরীরের জন্য উপযুক্ত কিনা তা দেখার জন্য বেশ কিছু ভ্যাক্সিনের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ২০১৯-এ তেমনি একটি ভ্যাক্সিনের আমাদের শরীরের উপর ফেজ- ওয়ান পরীক্ষা সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নির্দিষ্ট ভ্যাক্সিন কর্তৃক ভাইরাসের দেহে ফিউশন পেপটাইড অর্থাৎ অ্যামিনো এসিডের অতিক্ষুদ্র শিকলে লক্ষ্য স্থাপন করা হয় যা ব্যবহার করে এইচআইভি খুব সহজে মানবকোষে গমন করে। এছাড়া বর্তমানে RV144 ভ্যাক্সিনটির ফেজ-টু নিরীক্ষণ চলমান ২০১৬ সাল থেকে। আর ধারণা করা হচ্ছে যে ২০২১ এর মাঝামাঝি অবধি চলতে পারে। এইডস রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার না হলেও, এর চিকিৎসা বের হয়েছে যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাছাড়া এ চিকিৎসা শুধুমাত্র এইডস আক্রান্তের সময়কে বিলম্বিত করে, এইডস পুরোপুরি নিরাময় করতে পারে না।

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে না চলা, অসচেতনতা, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও সর্তকতার অভাব ইত্যাদির কারণে জনসাধারণের মধ্যে এইচআইভি ও এইডস সম্বন্ধে ভুল ধারণা ও নির্বুদ্ধিতা অধিক পরিলক্ষিত। দেখা যাবে আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমরা খুব শীঘ্রই এইআইভি'র জন্য একটি কার্যকরী ভ্যাক্সিন তৈরী করে ফেলবো। কিন্তু আপাতত এই মরণব্যাধি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো এইডস সম্পর্কে সঠিক তথ্য জেনে সচেতন হয়ে নিরাপদ জীবনযাপন করা। এক্ষেত্রে এইচআইভি ভাইরাস কীভাবে ছড়ায় তা নিয়ে সচেতনতার মাত্রা আরো বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতি বছর **পহেলা ডিসেম্বর** আমরা **'বিশ্ব এইডস দিবস'** উদযাপন করে থাকি। আমাদের আরো বেশি সচেতনশীল হতে হবে এবং সর্বদা মনে রাখতে হবে যে,

"প্রতিষেধকের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম"

রেফারেন্সঃ
theconversation.com, givingcompass.org,
worldometers.info, who.int, cdc.gov, roar.media

লেখায়ঃ
হাসপিয়াত তোরাবী, বাকলিয়া সরকারি কলেজ।
নূরে ওয়াকিয়া, ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

স্বপ্নযাত্রার গল্প

দশজনের ভীড়ের মধ্যে তাকে আলাদা করে খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল, বইয়ের পাতার ভাষায় তথাকথিত ইন্ট্রোভার্ট। কলেজিয়েট এর নবম বা দশম শ্রেণির ক্লাসে অথবা চট্টগ্রাম কলেজ এর একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসে তাকে চুপচাপ দেখা গেলেও তার বুদ্ধিমত্তার মাত্রা ভিন্ন কোনো উচ্চতায়। বলছি মামনুন সিয়ামের কথা। গণিত অলিম্পিয়াড থেকে শুরু করে বিভিন্ন ন্যাশনাল/রিজিওনাল অলিম্পিয়াডে তার সাফল্যের কথা শোনা গেলেও তার আসল সাফল্য কম্পিউটারের সামনে বসে বা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং। বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল যে সে তার সেরা ফর্মে আছে এবং ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড ইন ইনফরম্যাটিক্স, যা কিনা পৃথিবীর প্রোগ্রামারদের জন্য অনেক বেশি প্রেস্টিজিয়াস একটি অলিম্পিয়াড, তাতে বাংলাদেশকে এনে দিতে পারবে কাঙ্ক্ষিত মেডেল। এবং হলো ও তাই। ২০২১ এর আইওআই এ সে বাংলাদেশ এর হয়ে ছিনিয়ে আনলো রৌপ্য পদক। তার কাছে সফলতার গল্প শুনছিলেন এই ম্যাগাজিনের সম্পাদক এবং তার বন্ধু অংকন দে অনিমেষ। চলুন দেখে আসি অংকনের প্রশ্নের উত্তরে মামনুন কি কি বললো।

মামনুন সিয়াম

দ্বাদশ শ্রেণি, চট্টগ্রাম কলেজ
সিল্ভার মেডেলিস্ট,
ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড
ইন ইনফরম্যাটিক্স

অংকনঃ কোভিড-১৯ এর কারণে সবাইকেই একটা কঠিন সময় পার করতে হচ্ছে। তো তোমার কাছে শুরুতেই প্রশ্ন থাকবে যে, এই লকডাউনে তোমাকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা।

মামনুনঃ সমস্যা বলতে হলে....তেমন একটা সম্মুখীন হতে হয়নি, তবে হ্যাঁ, আমার বাবা করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাই তখন আমার এবং আমার পরিবারের জন্য একটা খুব খারাপ সময় ছিল। তবে আল্লাহর অশেষ রহমত যে তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমিও সুস্থ আছি, এই পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকার চেয়ে বেশি স্বস্তিদায়ক আশা করি অন্য কিছুই হতে পারে নাহ।

"আমি লকডাউনে কী করেছি? গেমস। হাহা।"

অংকনঃ লকডাউনের কথাই যখন আসলো, তো এই লকডাউন চলাকালীন সময়টাতে নিজেকে আরো ভালো বা উন্নত করার জন্য তুমি কী করেছ? বা এই সময়টাতে অন্যদের কি করা উচিত বলে তোমার মনে হয়?

মামনুনঃ আমি লকডাউনে কী করেছি? গেমস। হাহা। লকডাউন থাকায় আসলে কোথাও যাওয়া তো আর সম্ভব হয়নি। পুরো সময়টা জুড়ে বাসায় থাকার কারণে গেমস খেলা হয়েছে প্রচুর। আর অনলাইন ক্লাসের পাশাপাশি কোডিং নিয়েও অনুশীলন করা হয়েছে। আমি আমার লকডাউনের সময়টা নিয়ে খুব যে বেশি স্যাটিস্ফাইড তা নাহ। আমার মতে আমার আমার আরো বেটার বা "Productive" কিছু করা উচিত ছিল। আমার মতে সবাইকেই এই সময়টায় 'productive' কিছু কাজ করা উচিৎ।

অংকনঃ কেউ যদি ৫টি বিশেষণ (adjective) ব্যবহার করে তোমাকে নিজের পরিচয় দিতে বলে, তবে তুমি কোন গুন/ দোষ গুলাকে উল্লেখ করবে?

"আমার মতে সবাইকেই এই সময়টায় 'প্রোডাক্টিভ' কিছু কাজ করা উচিৎ।"

মামনুনঃ কেউ আমাকে নিজেকে ডিফাইন করতে বললে আমি কি বলবো... (কিছুটা চিন্তা করে).... আন্সমার্ট, "অধৈর্য্য', 'লুজার' ....গুণ তো দেখি খুঁজেই পাচ্ছি না (হাহা...) আসলে নিজের দোষ গুণ মিলিয়ে জোড়াতালি দিয়ে এতদিন চলে এসেছি, তবে আমি মনে করি আমার মধ্যে যদি 'ধৈর্য্য' ও 'অনুশাসন' তৈরি হয়, তাহলে আমি আরও ভালো করতে পারবো। এজন্য চেষ্টাও করে যাচ্ছি, হয়তো কিছু সময় পরে গুণ খুঁজে পেতে দেরি হবে না। আর এভাবে ধুম করে দোষ গুণ বলতে বললে বলা যায় নাকি? ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে মাইসেলফ প্যারাগ্রাফ শিখতাম এক বছর ধরে (হাহাহা...)!

অংকনঃ মামনুন, আমার সাথে তোমার পরিচয় কিন্তু চিটাগাং ম্যাথ সার্কেলের মাধ্যমে, সেই ২০১৭ সালে। আমি জানি তুমি খুব লম্বা একটা সময় গণিত অলিম্পিয়াডে ছিলে। এই অলিম্পিয়াডে তোমার যাত্রাটা কেমন ছিল, এক্ষেত্রে তোমার অনুপ্রেরণা কে/কি ছিল? আর তোমার মতে তোমার সবচেয়ে বড় সাফল্য কি ছিল?

মামনুনঃ গণিত অলিম্পিয়াডে আসলে আমার ফলাফল ততটা ভাল ছিলনা। মূলত জেএসসি পরীক্ষার পর জুনিয়র ক্যাটাগরিতে লাস্ট ক্লাস হিসেবে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েছিলাম। তখন ক্লাস ৯-১০ এর সব জ্যামিতি শিখে গিয়েছিলাম, আর ইন্টারনেট তো ছিলই। পরের গণিত অলিম্পিয়াড গুলোতে সহজ প্রশ্নগুলোর উত্তর, আর তার সাথে কম্বিনেট্রিক্স এর প্রশ্নগুলোর সমাধান করার মাধ্যমেই পুরস্কার পেয়ে যাই। ন্যাশনাল ক্যাম্পে চান্স পাই, অংশ নিই... এই আর কি! আসলে প্রোগ্রামিং এ ফোকাস করার ইচ্ছাটাই ছিল বেশি, তখন থেকেই।

অংকনঃ গণিত অলিম্পিয়াড ছাড়াও তুমি অন্যান্য বেশকিছু অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়েছ, যার মধ্যে ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে তোমার সাফল্য সবচেয়ে বেশি। গণিত অলিম্পিয়াড নিয়ে তোমার অভিজ্ঞতা তোমাকে এক্ষেত্রে কোন ভাবে সাহায্য করেছে কি? আর তোমার কি মনে হয় যে ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়ার আগে গণিত অলিম্পিয়াডের ব্যাপারে কিছুটা জ্ঞান থাকলে সবকিছু কি সহজতর হয়ে যায়?

পরের সংখ্যাগুলোতে যা আসতে চলেছে...

রসায়ন অলিম্পিয়াড প্রিপারেশন সিরিজ

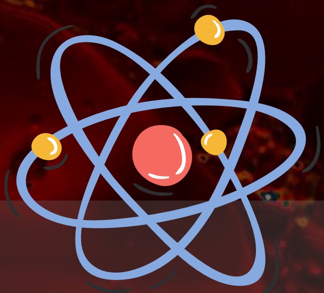

রসায়ন বা কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডের নাম শুনেছ তোমরা? বাংলাদেশ কিন্তু এই বছর থেকে রসায়ন অলিম্পিয়াডের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করা শুরু করবে! এবং তুমি যদি না জানো এটি কোথায় কখন কীভাবে হয় এবং কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, তাহলে তুমি একা নও! তোমার মত আছে আরো অনেকেই। তোমাদের সুবিধার জন্য হোয়াইট অরিজিন্সের প্রতিটি সংখ্যায় বের হবে তোমাদেরকে রসায়ন অলিম্পিয়াডে সাহায্য করার জন্য একটি সিরিজ! এবং নিয়মিত হোয়াইট অরিজিন্স ম্যাগাজিনটি পাঠ করে ইন্সট্রাকশনগুলোকে মেনে চললে তুমিও কিন্তু পরের বছরের বাংলাদেশ টিমের অংশ হয়ে চলে যেতে পারো আন্তর্জাতিক রসায়ন অলিম্পিয়াডে এবং নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে বাংলাদেশের জন্য বয়ে নিয়ে আনতে পারো গৌরব এবং সমৃদ্ধি! কী করতে হবে তাহলে? চোখ রাখতে হবে পরের সংখ্যাগুলোতে! আর নিজদের বন্ধুবান্ধবদের মাঝে বেশি বেশি করে জানিয়ে দিতে হবে!

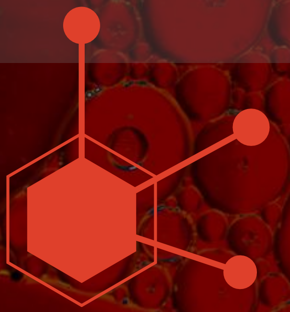

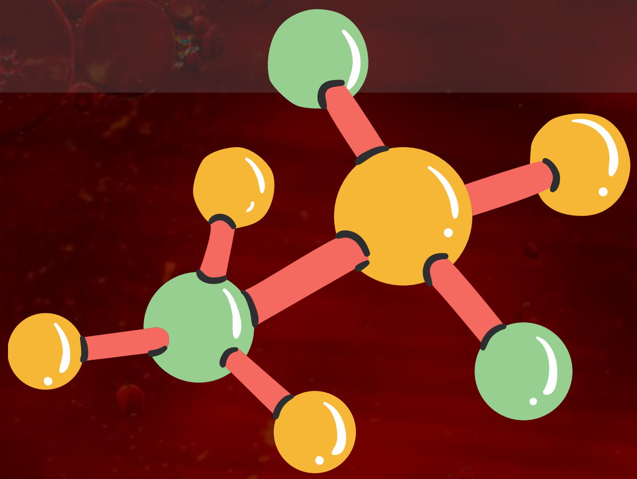

মামনুনঃ আচ্ছা, অন্যান্য অলিম্পিয়াডের কথা যদি বলি তাহলে, ফিজিক্স অলিম্পিয়াড দিয়ে আমার যাত্রা শুরু। কিভাবে কিভাবে যেন সেইবার আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার পেয়ে যাই। (অংকনঃ কীভাবে কীভাবে তো নাহ, অল্প ট্যালেন্ট ছিল বলেই তো, হাহাহা...) হুম, এরপর অনেক বেশি মোটিভেটেড হয়ে গিয়েছিলাম। আর এই যে প্রবলেম সলভিং বা প্রবলেম সল্ভিং এর ইচ্ছা

ম্যাথ অলিম্পিয়াড থেকে আমি যা পেয়েছি তা হচ্ছে একটা স্টাইলে পড়ার অভিজ্ঞতা, যেটার মাধ্যমে অনেক বেশি রিগোরাস ভাবে কিছু শিখে ফেলা যায়। (অংকনঃ ১০০ ভাগ সহমত)
তো এই যে একটা প্রবলেম সল্ভিং এর উপর গ্রিপ তৈরি হওয়া বা একটা ভালো ম্যাথেম্যাটিকাল ফাউন্ডেশন তৈরি হওয়া, এগুলা আসলেই হয়ত অনেক হেল্প দেয়। এই প্রবলেম সল্ভিং এর গ্রিপ যদিও সিপি (কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং) করতে থাকলেই পাওয়া যায়, তবে ম্যাথেম্যাটিকাল ফাউন্ডেশনটা অতটা গ্রিপড হয় নাহ। আমি যদি আমার কথা বলি, তাহলে হয়ত প্রোগ্রামিং এ অনেক ফাস্ট প্রোগ্রেস করতে এই আগের এক্সপেরিয়েন্স গুলো আমাক সাহায্য করেছে। অস্বীকার করার উপায় নেই আসলে!

অংকনঃ তো, তোমার ইনফরম্যাটিক্স এর কথায় আসা যাক। এর আগেও তুমি তো কয়েকবার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে ইন্টারন্যাশনালে গিয়েছ, নাহ? (মামনুনঃ হুম) প্রথম দুইবার কিছু না পাওয়া, এবং এরপর সিলভার... প্রোগ্রেসটার রহস্য কী?

মামনুনঃ আগে তো অতটা ম্যাচিওর ছিলাম নাহ, মানেই ধরেই নাও যে কিছুই ছিলাম নাহ। (অংকনঃ সেটা ৪ বছর পরে গিয়ে প্রোগ্রেসের পর সবারই মনে হয়... হাহাহা) হুম হুম, আসলে এখন যদি পিছনে রিফ্লেক্ট করি তাহলে এর বেশি কিছু মাথায় আসে নাহ আর কি, নিজেকে কেবল ইম্মেচিওরই লাগে। তবে এবার মায়ের কথা শুনে একটু বুদ্ধি হয়েছে আই গেস।

> বিশেষ করে আমার মা। উনিই ঠেলে ঠেলে আমাকে প্রোগ্রামিং শিখতে পাঠিয়েছেন...

অংকনঃ আচ্ছা মায়ের কথা যখন আসলো তখন তো জিজ্ঞেস করতেই হয় একটা কথা! তোমার এই যাত্রায় তোমার পরিবার, বাবা-মা, উনারা সবাই কতটা সাপোর্টিভ ছিলেন? পরিবারের সমর্থনকেই বা তুমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করো?

মামনুনঃ NHSPC তে পুরস্কার পাওয়ার জন্য প্রোগ্রামিং শিখছিলাম, তখন ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড সম্পর্কে জানতে পারলাম। শুরু থেকেই আমার মা-বাবা খুব সাপোর্টিভ ছিলেন। বিশেষ করে আমার মা। উনিই ঠেলে ঠেলে আমাকে প্রোগ্রামিং শিখতে পাঠিয়েছেন। আমি আজ যে অবস্থানে আছি তার ১০০% ক্রেডিট আমার মায়ের।

আসলে সব ক্ষেত্রে পরিবারের সমর্থনটা খুব জরুরী, কারণ সেটা আমাদেরকে মানসিকভাবে অনেক সাহস জোগায়; আর আমি নিজেকে এদিক দিয়ে খুব lucky মনে করি। কারণ সবার পরিবারে আমার মায়ের মত যদি একজন মা না থাকে, তাহলে তার আর আমার যুদ্ধটা সমান হয় নাহ, তাকে অনেক বেশি কষ্ট করতে হয়। আমি একটা এক্সট্রা এডভান্টেজ পেয়েছি সেদিক থেকে!

> "প্রথম তিনবার কিছু না পাওয়া, এবং এরপর সিলভার... প্রোগ্রেসটার রহস্য কী?"

অংকনঃ একাডেমিক পড়াশোনা এবং অলিম্পিয়াড- তোমার কাছে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আর তুমি এই দুইটা জিনিসের মাঝে কীভাবে ভারসাম্য আনো?

মামনুনঃ গুরুত্বের দিক দিয়ে দুইটাই সমান। দুইটার মাঝে ব্যালেন্স রাখার চেষ্টা থাকে সব সময়। কিছু নির্দিষ্ট বিষয় যেমন ইন্টারে উচ্চতর গণিতে ক্যালকুলাস, ইন্টিগ্রেশন আছে যা আমার খুব পছন্দের একটা বিষয়। আবার পদার্থ বিজ্ঞানের কোনো কিছুও আমার কাছে কোন অংশে কম না। সত্যি বলতে কি...একাডেমিক জীবনেরথেকে অলিম্পিয়াড লাইফ, কোডিং কিংবা প্রোগ্রামিং আমাকে বেশি fascinate করে। তাই অনেক সময় handle করার চেষ্টা করি না, যেটা করা মোটেও ঠিক না।কিন্তু বাংলায় ৭ টা সৃজনশীল লিখতে কার-ই বা ভালো লাগবে (হাহা...)

অংকনঃ তুমি যেমন, তোমাকে তেমন বানানোর পিছে কোডিং এর কতটা ভূমিকা ছিল? আর কোডিং জগতে নতুনদের জন্য তোমার কোনো টিপস বা পরামর্শ নিয়ে কিছু যদি বলতে।

নতুনদের জন্য আমার টিপস হবে 'বিট চাইনিজ অর ডোন্ট এক্সিস্ট এট অল'...

মামনুনঃ প্রতিটা ক্ষেত্রে, প্রতিটা ধাপেই আসলে কোডিং খুবই important এই ফিল্ডে। কোডিং খুব ভালো ভাবে শিখতে পারলে তা life changing বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে।
বহির্বিশ্বে চাইনিজদের দাপট লক্ষ্য করার মতো। আমরা কোডিং এর কাজ বন্ধ করে দিলেও বাইরে এর কোনো প্রভাবও পড়বে না। এতটাই পিছিয়ে আমরা! আর অলিম্পিয়াডে তাদের রেজাল্ট দেখলেও ফ্রাস্ট্রেশনে চলে যাই মাঝে মাঝে! যারা নতুন কিংবা এই সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে তাদের কাছে আমার টিপস হবে "বিট চাইনিজ অর ডোন্ট এক্সিস্ট এট অল"।

ইন্টারভিউঃ **অংকন দে অনিমেষ**
পুনলিখনঃ **ফারিহা রাইসা**

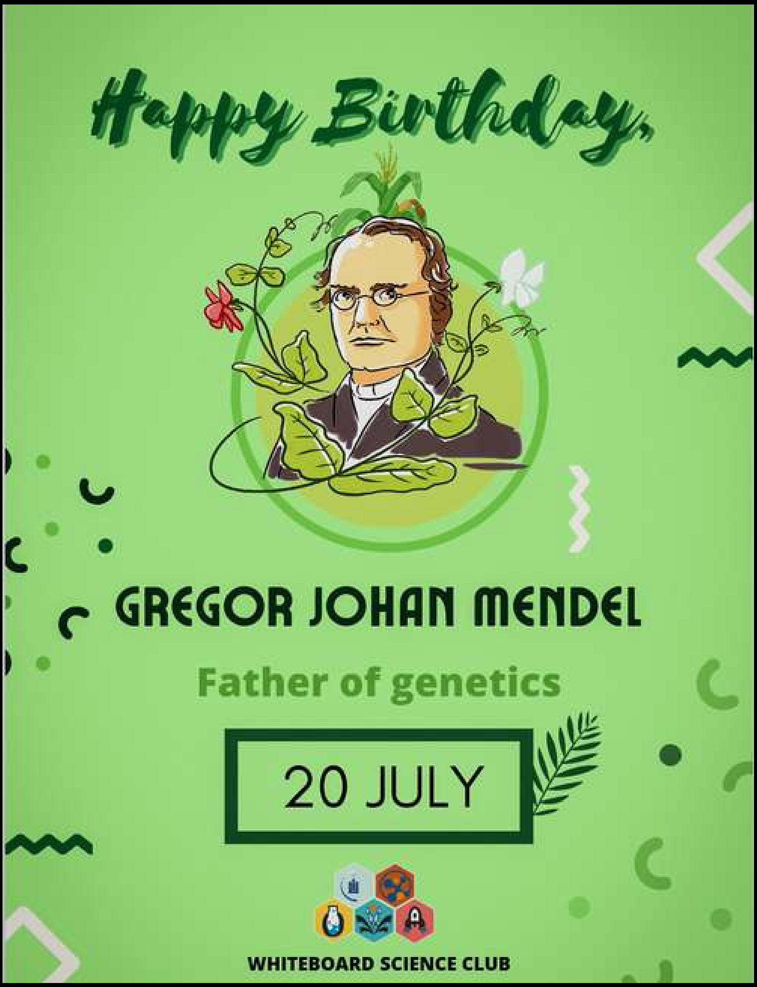
Happy Birthday,
GREGOR JOHAN MENDEL
Father of genetics
20 JULY
WHITEBOARD SCIENCE CLUB

আজ থেকে ঠিক একশ নিরানব্বই বছর আগের কথা, হিনচিৎসের চেক প্রজাতন্ত্রের ছোট্ট একটি গ্রামে দরিদ্র কৃষকের ঘর আলোকিত করে জন্ম নিলো ছোট্ট ফুটফুটে এক শিশু।
পরিবারের সবার সে কি আনন্দ! কিন্তু কেউ কি জানতো সেই ছোট্ট শিশুটি একদিন বড় হয়ে বিজ্ঞানের গতিধারাকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে রূপায়িত করবে? হয়ে উঠবে বংশগতিবিদ্যার জনক!! হ্যা একদম ঠিক ধরেছেন; আমরা বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের কথাই বলছি। আজ ২০ জুলাই বিজ্ঞানী মেন্ডেলের একশো নিরানব্বই তম জন্মদিনে আমরা সকলে তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

শুভ জন্মদিন,
স্যার গ্রেগর জোহান মেন্ডেল!

জাদুকর

প্রিয়,

তারুণ্যের শুরুতে যখন তোমার মায়ের সাথে আমার দেখা হয়েছিলো, সমুদ্রের ছন্দে ভাসতে থাকা মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকে বলেছিলাম, "আমার এ পৃথিবী জাদুর পৃথিবী। এখানে জাদুকরেরা যুক্তিতে বিশ্বাসী, গাঠনিক কাঠামো ও কারণে বিশ্বাসী। প্রাণের সঠিক সঞ্চারে হাসপাতালের পরিচর্যা থেকে শুরু করে প্রাণ ছিনিয়ে নিতেও তাদের জ্ঞানের কাঠি যেন জাদু হিসেবে নাড়া দেয়। আমিও এ রোমহর্ষক জগতের একটি ছোট্ট অংশ, তুমি কি এ জাদুকরকে ভালো রাখবে?" আমার পৃথিবীর মায়া সে নিজের করে নিয়েছিলো। কিন্তু জাদুকরেরাও আটকা পড়েন গোলকধাঁধায়, হারিয়ে যায় তাদের আনন্দ ছোট-বড় কিছু ভাঁজে। বিজ্ঞান নামের এ জাদুর শুরুটা ছিলো পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কে জায়গা করে নেয় ঘৃণা, প্রতিশোধপরায়ণতা, আক্রমণাত্মক আচরণের আধুনিক বহিঃপ্রকাশ। প্রাণ হারিয়ে যেতে শুরু করে বুলেটের তীব্র শব্দের অন্তরালে।

গত বছর জুলাইয়ের এ সপ্তাহে যখন তুমি আমার এ জীবনে অংশ বসিয়েছিলে, অনেক ভালোবাসায় ছেয়ে যায় চারপাশ। কিন্তু আদরের সেই রক্ষকবৃত্তের বাইরে উড়ছিলো আগুনের স্ফুলিঙ্গ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পঞ্চম বছরের অভিশাপে কাঁদছিলো মানুষের হৃদয়। জাদুকরেরা আক্রোশে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ছেন প্রতিনিয়ত। ভয়ানক সেসব অস্ত্রের বিশ্লেষণ-পর্যবেক্ষণের দলে আছি আমিও। তোমার ও তোমার মায়ের কাছ থেকে ৫৫৬ মাইল দূরে, অপরিচিত কিছু ক্ষমতার সাথে জড়িয়ে পড়েছি। বিধ্বংসী এ লড়াই থেকে সরে আসার কোনো উপায় নেই তোমার বাবার।

এতটুকু সময় পর্যন্ত এ যুদ্ধে বন্দুক ও গ্রেনেডের আক্রমণে অকেজো হৃদয়ে পতিত হচ্ছিলো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন এলাকা। হারাচ্ছিলো পরিবার, হারাচ্ছিলো বন্ধুরা। কিন্তু বিজ্ঞান জগতের জাদুকরেরা ভয়ানক এক সিদ্ধান্তে এসেছেন, পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের! এ বোমা ভূমি আঘাত করা মাত্রই তলিয়ে যাবে জনপদ, হারিয়ে যাবে প্রাণের হাহাকারগুলোও। কিন্তু দেশে দেশে এ অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে সে দেশের নাগরিকদের এমন ক্ষতি হওয়াটা মানবিক চেতনার বিপর্যয়ের জানান দেয়। কিন্তু আমি এতটা নিষ্ঠুর এক ঘটনা ঘটতে দিতে পারি না, ঐ শক্তিটুকু আমার হৃদয়ের মায়ার পৃথিবীতে নেই। এই পারমাণবিক বোমাটি আমি থামাবো, একটি পরিকল্পনার সাপেক্ষে। হয়তো তোমাদের কাছে আর ফিরে আসা হবে না, কিন্তু পরিকল্পনাটি জানাতে চাই আমি তোমাকেও। আজ থেকে পনেরো বছর পরে যখন তোমার পা ষোলোতে, তখনই এটি জানতে পারছো তুমি।

পারমাণবিক বোমাটি নিক্ষেপণের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আগামী বছরেই, ১৯৪৫ এর ৬ই আগস্ট, জাপানের হিরোশিমায়। পুরো প্ল্যানিংটি আনা হয়েছে একটি ছকে। উড়োজাহাজের মাধ্যমে আমাদের একটি টিম যাবে এবং বোমাটি নিক্ষিপ্ত হবে তারা সরে যাওয়ার মতো নিরাপদ দূরত্বে। এক্ষেত্রে বোমাটি রিলিজের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কোড, ডক শিফটার ও রিবাউন্ডার। আমি এ দলের ক্ষমতাসীন কেউ নই, যদি সে জায়গাটুকু পেতাম সেক্ষেত্রে বোমাটির কাজ থেমে যেতো সেই কবেই। কিন্তু একজন জুনিয়র ওয়ার্কার হিসেবে ডক শিফটারের কাজটুকু আমার বেশ ভালোভাবেই জানা। বিশ্বাসঘাতক কিন্তু মানবতাবাদী এক মানসিকতা থেকে এ কাজটি আগ্রহ নিয়ে শিখেছি আমি। উড়োজাহাজ থেকে সিক্রেট কোড টাইপ করে যখন তারা বোমাটি মুক্ত করতে চাইবে, তখন কিন্তু সেটির কার্যক্রম চালু হয়ে গেলেও উড়োজাহাজ থেকে যেতে পারবে না!

এ কাজটির জন্য উড়োজাহাজটির বম্বার সেকশনটি ভেতর থেকে ভালোভাবে মুড়িয়ে নিয়েছি ধাতব ঝালরে। তাতে সংযুক্ত আছে খাঁজ ও সূক্ষ্ম কিছু বৈদ্যুতিক পথ। বোমাটি রাখার সাথে সাথে মেটাল কোটের নির্দিষ্ট অংশগুলো আটকে যাবে খাঁজগুলোতে এবং বম্বার সেকশনের চারপাশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবির্ভাব হবে বৈদ্যুতিক একটি পর্দার। ইলেক্ট্রো নেটটি অতিক্রম করে কেউই বম্বার পার্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না কোনোরূপ সমস্যার সমাধানে। আটকে যাবে ডকে। শিফটার হয়ে যাবে অকেজো।বিস্ফোরণ হবে এই নিষ্ঠুর হৃদয়ের ক্ষমতাকামী প্রাণগুলোর। উড়োজাহাজটি উড়ে যাবে, কিন্তু ফিরে আসবে না।
এটি আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ মিশন। যেটি কোনোভাবে অন্যরা জেনে গেলে মৃত্যুকে আপন করে নিতে হবে আমায়। কিন্তু এ পৃথিবীর বুকে জমে থাকা ভালোবাসাগুলো একত্র করে আমি নিজের কাছে এ উত্তরই পেয়েছি, "এ কাজটি তোমায় করতে হবে।"
মনে রেখো, এ পৃথিবীতে অনেক অসাধারণ জাদুকর আছেন, যাদের কারণে অন্যরা বেঁচে থাকার আগ্রহটুকু খুঁজে পায়। তাদের মমত্ববোধে, অনুগ্রহে। তেমন এক জাদুকর হওয়ার চেষ্টা রেখো, আমি নাহয় স্বপ্নপ্রেরক হলাম!

অনেক ভালোবাসার সাথে,
বাবা।

সন্তানকে চিঠি লেখা শেষ করে বিজ্ঞানী সবে টেবিল ছেড়ে দাড়ালেন। পিছন থেকে ভেসে এলো মাইকে ঠান্ডা গলায় বলতে থাকা সতর্কবাণী, “পালানোর চেষ্টা করবেন না মিস্টার স্ট্রাইক। আপনাকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেফতার করা হলো -“
বাবার আর স্বপ্নপ্রেরক জাদুকর হওয়া হলো না। পিছনে পরে রইলো তার একরাশ স্বপ্ন।

আঈশা নূর,
এসএসসি পরীক্ষার্থী,
ড:খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

চেরোফোবিয়া কিংবা সুখভীতি

সুখী হওয়ার অযৌক্তিক ভয়!!

মর্মান্তিক অতীত দ্বারা আক্রান্ত এক উজ্জ্বল তরুণ শিক্ষার্থী আরিফ আবরার। সে খুশি হতে খুবই ভয় পেতো। সে বিশ্বাস করতো, যদি তার সাথে খুব ভাল কিছু ঘটে বা যদি তার জীবন ভালোভাবে চলে, তা হলো পরবর্তীতে খারাপ ঘটনা ঘটার পূর্বাভাস। ফলস্বরূপ, সে সুখ সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপকে ভয় করতো কারণ সে বিশ্বাস করতো যে এসব কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করলে পরবর্তীতে তার সাথে খারাপ কিছু হতে পারে। একদা সে একজন বিখ্যাত সংগীতশিল্পীর সাথে দেখা করার সুযোগ পায়। যিনি জীবন এবং সুখ সম্পর্কে তার বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করেন। এই নিখুঁত কাকতালীয় ঘটনার ফলে তার জীবনের অনেক বড় অংশে পরিবর্তন সাধিত হয়। তার সব সমস্যার সমাপ্তি ঘটে। এভাবেই অনেক মানুষ বর্তমানে এধরণের সুখভীতি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যা চেরোফোবিয়া নামে পরিচিত।

ফোবিয়া কি?

ফোবিয়া শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ ‘ফোবোস’ থেকে যার অর্থ হচ্ছে ভয় বা হরর। যখন কারো ফোবিয়া থাকে তখন সেই ব্যক্তি সেই ঘটনা বা পরিস্থিতি বা বস্তুর উপর মারাত্মক ভয় অনুভব করে। আমাদের চারপাশে জানা অজানা অনেক ধরণের ফোবিয়াই রয়েছে। তবে স্বীকৃত ফোবিয়া হচ্ছে মোট ৪০০ ধরনের। সাধারণ ভয়ের সাথে ফোবিয়ার পার্থক্য হচ্ছে, ফোবিয়া মূলত মারাত্মক ভয় থেকে মানসিক সমস্যায় রূপ নেয়। যেমন ধরুন, আপনি কিংবা যেকেওই বিমানে যাতায়াত কালে ভয় পেতে পাবেন কিন্তু ফোবিয়ায় আক্রান্ত রোগী তার নিজের ভাইয়ের বিয়েতে পর্যন্ত যাবে না, শুধুমাত্র বিমানে চড়তে হবে দেখে।

একইভাবে কোনো সাধারণ ব্যাক্তি যেখানে কুকুরকে ভয় পাওয়া সত্ত্বেও কুকুরের সামনে গিয়ে তার ভয় কাটাতে কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করবে সেখানে ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি কুকুরকে ভয় পায় বলে, একই স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকাকেও কুকুরের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে উত্তম মনে করবে। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, গুলি লাগলে বা গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও একজন ফোবিয়াগ্রস্থ ব্যক্তি সেলাই দেয়ার ভয়ে মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট নিতে অসম্মতি জানায়। এবার বুঝেছেন? এটি মূলত এক ধরনের উদ্বেগজনিত রোগ। এর কারণে দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, ডিপ্রেশন, উচ্চ রক্তচাপ থেকে শুরু করে স্ট্রোকের মাধ্যমে মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে।

যারা ফোবিয়ায় আক্রান্ত তারা সেই ভয়ের পয়েন্ট থেকে কোনো চিন্তা না করেই সরাসরি এড়িয়ে চলে।

চেরোফোবিয়া কি?

চেরোফোবিয়া হলো এক ধরনের ফোবিয়া যার ফলে ব্যক্তির সুখী হওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের বিদ্বেষ কাজ করে। এটি এক ধরনের অযৌক্তিক ভয় যা ব্যক্তির মানসিক উদ্বেগ এর সাথে যুক্ত। ইংরেজিতে যাকে “*Anxiety Disorder*” বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

> "চেরোফোবিয়া হলো এক ধরনের ফোবিয়া যার ফলে ব্যক্তির সুখী হওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের বিদ্বেষ কাজ করে।"

এই সুখভীতিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা আনন্দ সংবাদকে কোনো শোক সংবাদেরই পূর্বাভাস বলে মনে করেন! এই ধারণাটি পাশ্চাত্যের চাইতে প্রাচ্যেই বেশি প্রচলিত। আমাদের লোকসংস্কৃতিতেও কিন্তু এর বেশ ভাল একটি উদাহরণ পাই খনার বচনে। খনার বচনে বলা আছে,"যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম সন্না" । কে এই রাম সন্না কে জানে! কিন্তু তার এই ভাবনাটি কিন্তু আজকের এই চেরোফোবিয়ার সাথেই মিলে যাচ্ছে। তাহলে কি রাম সন্নাও চেরোফোবিক ছিলেন? হয়তো বা হ্যাঁ! চেরোফোবিয়া গভীর থেকে বুঝতে হলে আগে আমাদের বুঝতে হবে হ্যাপিনেস কি?

হ্যাপিনেস কি?

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, যত জীবন-জীবিকা, সম্পর্কই আছে, সবকিছুর একটি ধ্রুব গন্তব্য বোধ করি ‘সুখ’। মান্না দে’র সেই গানটির মতনই আর কী! “সবাই তো সুখী হতে চাই”। যত বয়স বাড়ে ততই আমরা সুখের সংজ্ঞাকে জটিল থেকে জটিলতর করে ফেলি আর নিজেরাও সে সংজ্ঞার জালে আটকা পড়ি। সুখের সমীকরণের মান কারো জন্যই সমান নয় তাই।

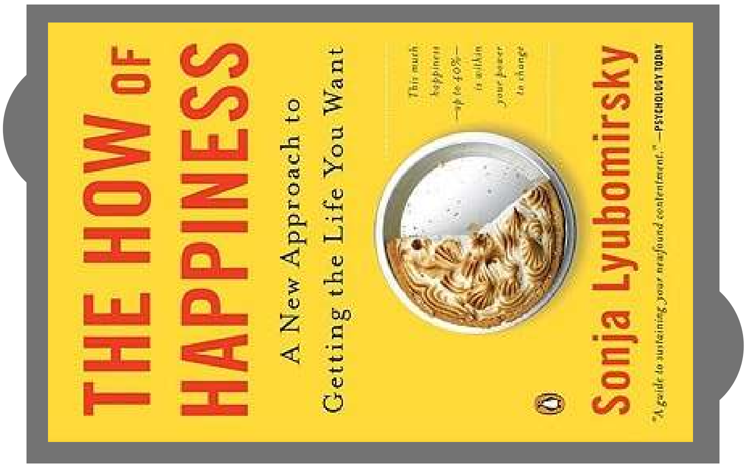
THE HOW OF HAPPINESS
A New Approach to Getting the Life You Want
This much happiness—up to 40%—is within your power to change
Sonja Lyubomirsky
"A guide to sustaining your newfound contentment." —PSYCHOLOGY TODAY

হ্যাপিনেস সাধারণত ভালো থাকা, ভালো কামনা, ইতিবাচক থাকাকেই ধরে নেয়া হয় আবার অনেকক্ষেত্রে সাব্জেটিভ ওয়েল বিয়িং টার্মকে মূল্যায়ন করে, যা সাফল্যকেন্দ্রিক সবসময় ভালো থাকার প্রবণতাকে বোঝায়। অধিকাংশ সময়ে এই ভালো থাকা পরিমাপ করা হয় প্রতিদিনকার সন্তুষ্টি এবং ভালো কিংবা মন্দ প্রভাবের তুলনার মাধ্যমে। তবে পজিটিভ সাইকোলজির গবেষক Sonja Lyubomirsky তার বই 'The How of Happiness (2007)' এ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অধিক গ্রহণযোগ্য হ্যাপিনেস এর এমন সংজ্ঞায়ন করেছেন যে,

> “The experience of joy, contentment, or positive wellbeing, combined with a sense that one’s life is good, meaningful, and worthwhile.”

মনোবিজ্ঞানে চেরোফোবিয়া

চেরোফোবিয়া শব্দটি মূলত গ্রীক শব্দ “চাইরো/ *Chairo* থেকে উদ্ভূত , যার অর্থ হলো - “আনন্দ করা”। যখন কোনো ব্যাক্তি চেরোফোবিয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তখন তারা প্রায়ই এমনসব ক্রিয়কলাপে অংশগ্রহণ করতে ভয় পান যা তাকে খুশি/সুখী করতে পারে। যদিও চেরোফোবিয়া ডিএসএম-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) এর অধীনে কোনও ক্লিনিকাল ডিসঅর্ডার হিসাবে স্বীকৃত নয়, তবে বেশ কয়েকটি গবেষণার পরিশেষে গবেষকরা এর অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে বৈধকরণ শুরু করেছেন। কিছু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ চেরোফোবিয়াকে উদ্বেগজনিত ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অজানা অনেক ধরণের ফোবিয়াই রয়েছে। তবে স্বীকৃত ফোবিয়া হচ্ছে মোট ৪০০ ধরনের। সাধারণ ভয়ের সাথে ফোবিয়ার পার্থক্য হচ্ছে, ফোবিয়া মূলত মারাত্মক ভয় থেকে মানসিক সমস্যায় রূপ নেয়। যেমন ধরুন, আপনি কিংবা যেকেওই বিমানে যদিও চেরোফোবিয়া নিয়ে জানতে হ্যাপিনেসের এই সংজ্ঞায়ন তুলনায় হয়তো ব্যাপক, আবার হ্যাপিনেসের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের চেরোফোবিয়াও কাজ করে।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ভালো থাকার মূল্যায়ন

ভালো থাকার প্রতি মানুষ কেন বিদ্বেষী হতে পারে, তার জন্য আমাদের বুঝতে হবে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ভালো থাকাকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

পশ্চিমা সংস্কৃতির পাশাপাশি উত্তর আমেরিকায় ভালো থাকাকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অপরপাশে, পশ্চিমা বহির্ভূত সংস্কৃতিগুলোয় ভালো থাকাকে অন্যান্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক লক্ষ্যগুলোর মতোই সাধারণ লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিমা-উত্তর ইউরোপে সামাজিকভাবে বেঁচে ভালো থাকার চেয়ে ব্যক্তিক ভালো থাকা এবং ব্যাক্তিস্বাধীনতাকে বেশি মূল্যায়ন করা হয়। যেখানে সমাজকেন্দ্রিক পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যক্তি নির্বিশেষে ভালো থাকার চেয়ে সামাজিকতা, সামষ্টিক ভালো থাকাকে বেশি বিবেচনা করা হয়। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সামাজিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়া হয় এমন সংস্কৃতিতে ব্যক্তিক সুখ মুখ্য থাকে না, আবার ব্যক্তিক সুখ মুখ্য বিবেচনা করা হলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ভালো থাকাকে জীবনের অন্য সব সাধারণ লক্ষ্যের মতো ধারণা করা হয়, এমন সংস্কৃতির তুলনায় যেসব সংস্কৃতিতে ভালো থাকাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হয়, সেসব সংস্কৃতিতে চেরোফোবিয়ার মাত্রা বেশি থাকে।

সাউথ কোরিয়ার Chungbuk National University এর বিজ্ঞানী Joshanloo, ২০১৪ সালে চেরোফোবিয়া নিয়ে একটা গ্লোবাল স্টাডি করেন যেখানে অংশ নেয় ইরান, রাশিয়া, জাপান, ইউএসএ, নেদারল্যান্ড এবং আরো দশটি দেশের প্রায়

২৭০০ শিক্ষার্থী। এই স্টাডিতে যে বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে ফুটে উঠে, প্রায় সকল দেশের মানুষের মাঝেই ভালো থাকার প্রতি বিদ্বেষ কাজ করে, যদিও দেশগুলোর চেরোফোবিয়ায় বিশাল বিস্তর কোনো পার্থক্য ছিল না।

বিদ্বেষের কারণ:

Joshanloo and Weijers (2014) তাদের রিসার্চের উপর ভিত্তি করে চেরোফোবিয়ার চারটি মূল কারণ চিহ্নিত করেছেন।

১. ভালো থাকার ফলে খারাপ প্রভাবের সম্ভাব্যতা! কখনো কি মনে হয়, ভালো থাকার কারণে এই বুঝি বিপদ এলো? এই বুঝি খারাপ ঘটবে আমার সাথে? একটি রিসার্চে দেখা যায় যে, জাপানিজ অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বাস করে, ভালো কিছুর কারণে ঘটনার ধারাবাহিকতায় খারাপ কিছু আসতে চলেছে। একটি 'ফিয়ার অফ ইমোশন' রিসার্চে দেখা যায় যে, কোনো ভালো কিছু নিয়ে ভালো থাকার কারণে ব্যক্তির মধ্যে তার আবেগের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা কাজ করে।

ভিক্টিমের মধ্যে আরো একটি ভাবনার উত্থান হয়, সে ভাবে অল্প বিস্তর ভালো থাকাই হয়তো সে মানসিকভাবে নিতে পারবে, অধিক ভালো থাকা হয়তো তার জন্য নয়, সে তা মানসিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। আবার একটা পরীক্ষণে জার্মান অংশগ্রহণকারীরা সুখ সম্পর্কিত একটি বদ্ধ ধারণা প্রকাশ করে।তারা বিশ্বাস করে যে অধিক ভাল থাকা ভবিষ্যৎকে মন্দ প্রভাবের দিকে ঠেলে দেয়।

২. ভালো থাকা আপনাকে খারাপ মানুষ বানিয়ে দেয়!

অনেক ক্ষেত্রে ভিক্টিমরা অন্য মানুষের কষ্টে থাকার কথা ভেবে নিজের ব্যক্তিক ভালো থাকার চিন্তায় থাকার ব্যাপারটিকে এক ধরনের স্বার্থপরতা মনে করে। যার ফলে নিজের ভাল থাকার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে গেলেই সে নিজেকে একজন স্বার্থপর মানুষ মনে করে অনুতাপ বোধ করে।

৩. ভালো থাকা/সাফল্য প্রকাশ করা নিজেকে এবং অন্যদের দূর্ভাগ্য এবং বাজে ভবিষ্যৎ এর দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে! এটি রাশিয়ানদের ইভিল আই (evil eye) নামক একটি ধারণা থেকে এসেছে। ভালো থাকা, সাফল্য প্রকাশে চারপাশে শত্রুতা বাড়িয়ে দিবে, নিজের অনিষ্টের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে, এমন আশংকা থেকে পূর্ব এশিয়ান সংস্কৃতিতে এই বিশ্বাসটি মানুষের ভালো থাকা প্রকাশের প্রতি বিদ্বেষ গড়ে তোলে।

৪. হ্যাপিনেস অর্জনের চেষ্টা করা সমাজে বাজে প্রভাব ফেলতে পারে! বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্নভাবে ভালো থাকার চেষ্টা করা হয়। তাই, সমাজে তার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়।তবে সংকীর্ণমনা ব্যক্তিক ভালো থাকার চেষ্টা, অনেকক্ষেত্রে সমাজের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।উদাহরণস্বরুপ, নিজের ভালো থাকা নিশ্চিত করতে কেউ অপরাধ করলে তার ভালো লাগা হয়তো নিশ্চিত হবে, কিন্তু তা সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

চেরোফোবিয়ার লক্ষণসমূহ

চেরোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই কোনও সহজাত আনন্দজনক পরিস্থিতি এড়িয়ে যান। বিষয়টি এমনও নয় যে তারা অসন্তুষ্টি বা দুঃখ অনুভব করতে চান। চেরোফোবিক ব্যক্তিদের মতে, "স্বস্তিই তাদের সুখ"। তারা মূলত এমন সকল কার্যকলাপকে এড়িয়ে চলেন যা তাদের আনন্দ বা সুখের সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। সুখ বা আনন্দ সম্পর্কে তারা কিছু বদ্ধ ধারণা বিশ্বাস করে থাকেন। যেমন: আনন্দ বা সুখ বোধ একজন মানুষকে খারাপ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলে, কোনো কিছু নিয়ে সুখ বোধ করা হলো পরবর্তীতে খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পূর্বাভাস, আনন্দজনক পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা লোপ পায়, অতিরিক্ত আনন্দের পরিণতি খারাপ হয়, দুর্যোগ প্রায়ই সৌভাগ্য বা সুখকে অনুসরণ করে ইত্যাদি। এছাড়া Panic Attack এর সময় তারা অজ্ঞান হওয়ার ভয়, ক্ষতির আশঙ্কা, হতাশা, রাগ, বিরক্তি ইত্যাদি অনুভব করেন।

আপনি কতটা ভয় পান ভালো থাকাকে?

একজন ব্যাক্তি ভালো থাকার প্রতি কতটা বিদ্বেষী, কতটা ভয় পায়, তা পরিমাপ করতে বিজ্ঞানী Joshanloo (2013) একটি ফিয়ার অফ হ্যাপিনেস স্কেল মডেল বানিয়েছেন যেখানে পাঁচটি স্টেইটমেন্ট থাকে এবং সে স্টেইটমেন্টগুলোতে মতামতের ভিত্তিতে নম্বর দেয়া হয়।

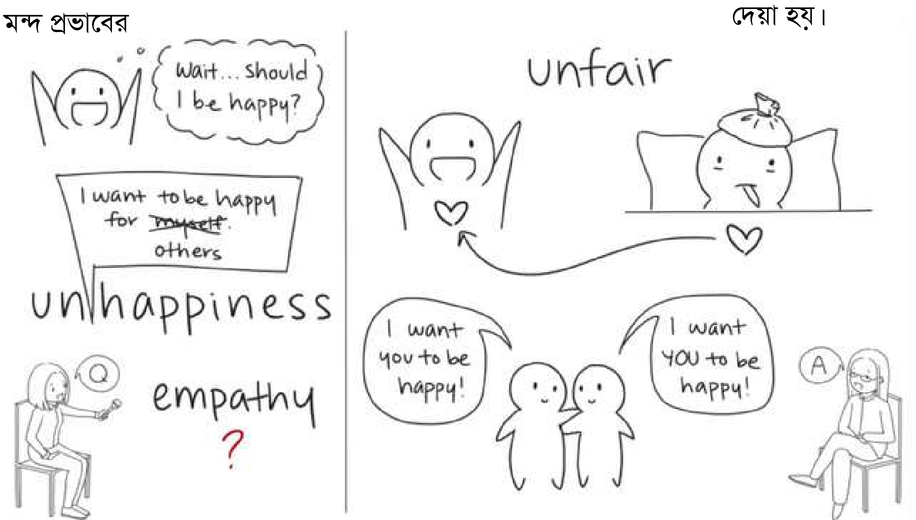
Wait... should I be happy?
I want to be happy for ~~myself~~ others
unhappiness
Q
empathy
?
unfair
I want you to be happy!
I want YOU to be happy!
A

স্টেইটমেন্টগুলো অনেকটা এমন:

১. আমি খুব আনন্দিত হওয়া পছন্দ করি না কারণ সাধারণত আনন্দ দুঃখের পরে আসে।
২. আমি বিশ্বাস করি আমি যত বেশি প্রফুল্ল এবং আনন্দিত হবো, আমার জীবনে খারাপ ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা তত বেশি।
৩. বিপদ ভালোকে অনুসরণ করেই আসে।
৪. প্রচুর আনন্দ-মজা করা মন্দ প্রভাব ঘটায়।
৫. অতিরিক্ত আনন্দের কিছু খারাপ পরিণতি আছেই।

২০১২ সালে বিজ্ঞানী Gilbert এবং তার সহকর্মীরা একত্রভাবে ফিয়ার অফ হ্যাপিনেস স্কেল মডেল বানিয়েছেন যেখানে মোট নয়টি স্টেইটমেন্ট আছে এবং সে স্টেইটমেন্টে মতামতের ভিত্তিতে নম্বর দেয়া হয়। ০(কোনোভাবেই আমার মতো নয়) থেকে ৪(সম্পূর্ণ আমার মতোই)! এবং সর্বোচ্চ নম্বর থাকে ৩৬, যেটি দ্বারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকা চেরোফোবিয়াকে ইঙ্গিত করে।

স্টেইটমেন্টগুলো নিম্নরূপ:

১. আমি নিজেকে সুখী, ভালো দেখতে ভয় পাই।
২. আমি ইতিবাচক অনুভূতির প্রতি বিশ্বাস কম করতে পারি।
৩. ভালো অনুভূতি কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
৪. আমার মনে হয় আমি ভালো, সুখী থাকার যোগ্য নই।
৫. ভালো অনুভূতি আমার অস্বস্তিকর মনে হয়।
৬. আমি নিজেকে ইতিবাচক জিনিস বা কৃতিত্ব সম্পর্কে উৎসাহিত হতে দিই না।
৭. আমি যখন ভালো থাকি, তখন আমি এই বিষয়ে কখনোই নিশ্চিত নই যে কোনো বিপদ অকস্মাৎ আমাকে পিছু তাড়া করবে না।
৮. আমার দুশ্চিন্তা হয় যে যদি আমি ভালো থাকি তবে খারাপ কিছু ঘটতে পারে।
৯. যদি আমি ভালো সময় কাটাই, তবে আমার সতর্কতা কমে যায় এবং বিপদের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

চেরোফোবিয়া কাটিয়ে উঠার উপায়

এটি যেহেতু ক্লিনিকালি স্বীকৃত কোনো ব্যাধি নয়, তাই এফডিএ (Food & Drug Administration) অনুমোদিত চেরোফোবিয়ার নির্দিষ্ট কোনো ঔষধ বা চিকিৎসা নেই যা চেরোফোবিয়া নিরাময়ে কার্যকরী হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। এই সত্যতা স্বত্তেও আক্রান্তদের জন্য একটি পরামর্শ হলো মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া। একজন মনোবিজ্ঞানী উপকারী অনুশীলনের পরামর্শ দিতে পারেন, তাদের সমস্যার সমাধান এর প্রস্তাব দিতে পারেন বা সম্ভাব্য চিকিৎসার প্রস্তাব দিতে পারেন। এছাড়া রোগী নিজেই তার ফোবিয়ার চরমতা কমানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।যেমন:

১. CBT (Cognitive Behavioral Therapy) এমন এক ধরনের থেরাপি যা একজন ব্যক্তিকে তার চিন্তাভাবনার ত্রূটিযুক্ত রেখাগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।ফলে ব্যাক্তি তার মূল সমস্যাটি ধরতে পারে এবং তার চিন্তাভাবনা ও আচরণগত পরিবর্তনের চেষ্টা করতে সক্ষম হয়।
২. বিভিন্ন ধরনের শিথিলকরণ কৌশল যেমন গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, যোগব্যায়াম ইত্যাদি অনুশীলন করা।
৩. Hypnotherapy চিকিৎসা), Exposure Therapy , Neuro Progam (NLP) ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাক্তি তার সুখ বিদ্বেষী মনোভাব অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
৪. সুখ-উদ্দীপক ক্রিয়াকলাপের সংস্পর্শে থাকা।এর মাধ্যমে ব্যাক্তি এটি অনুভব করতে পারবে যে, সুখের প্রভাব কখনো বিরূপ হয় না।
৫. এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়কলাপে অংশগ্রহণ, ধৈর্য ধারণ ও অভিজ্ঞ মনবিজ্ঞানীর পরামর্শ মেনে চলার মাধ্যমে ব্যাক্তি তার উদ্বেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে।

সবশেষে এই সুখ নিয়ে ভয় পাওয়া চেরোফোবিকদের যে কিছু বলতেই হয়। মানবজন্ম বড় ভাগ্যের জন্ম, এই জন্মে সমস্ত সুখ-দুঃখকে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করাতেই আনন্দ।এ থেকে কী ক্ষতি হবে, হারিয়ে যাবে তার হিসেব না করে বরং এই মুহূর্তের আনন্দটুকু গ্রহণ করুন, দিনশেষে খারাপ থাকবেন না! একবার এক লোক এসে বুদ্ধকে বললো, “আমি সুখ চাই”। বুদ্ধ তার জবাবে বললেন, তুমি প্রথমে ‘আমি’কে বাদ দাও, এটি হচ্ছে অহমবোধ।এরপর তুমি বাদ দাও ‘চাই’ শব্দটিকে। এ হলো জগতের সকল কামনা-বাসনা। সবশেষে তোমার কাছে যা রইলো, তাই ‘সুখ’। এছাড়া কবি ওমর খৈয়ামও প্রতি মুহূর্তের সুখকে প্রাধান্য দিয়ে বাঁচতে বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, *"Be happy for this moment, This moment is your life"*। তাই সকল আসন্নকে গ্রহণ করে আপনিও মাথা পেতে নিন জীবনের গন্ডুষভরা মুহূর্তগুলোকে। ভুলে যান চেরোফোবিয়া! একটু হাসুন, ভালো থাকুন।

তথ্যসূত্র :

Positivepsychology.com
Optimistic.com, Happiness.com

লেখায়:

নাজিফা গওহার
একাদশ শ্রেণী
সরকারী হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

তাসনিম চৌধুরী আদিবা
একাদশ শ্রেণী
বিএন কলেজ, চট্টগ্রাম

আরিফ আবরার নাঈম
এসএসসি পরীক্ষার্থী
চট্টগ্রাম সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

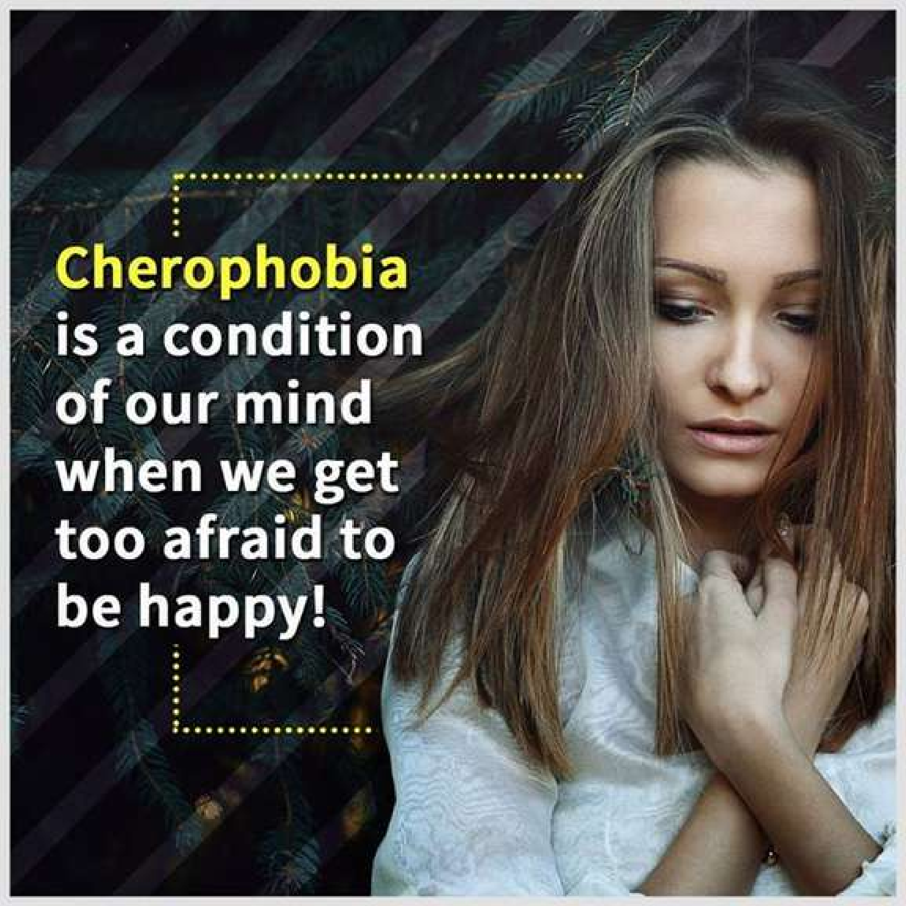
Cherophobia
is a condition
of our mind
when we get
too afraid to
be happy!

আধুনিক সময়ের তৃতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হিসেবে নির্বাচিত জন ভেন একজন বৃটিশ যুক্তিবিদ ও দার্শনিক। ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের হাল শহরে জন্ম নেওয়া এই গণিতবিদের যুক্তিবিদ্যার প্রতি ছিল বেশ আগ্রহ। সেই সূত্র ধরেই ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয় তার ‘প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা’ বইটি যার মূল উপকরণ ছিল ভেনচিত্র। জ্বি! জন ভেনই ভেনচিত্রের জনক; যা সেট তত্ত্ব, সম্ভাব্যতা, যুক্তিবিদ্যা, পরিসংখ্যান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করছি। বিরল মেশিনের প্রতি প্রবল আগ্রহে তিনি ১৯০৯ সালে এমন একটি মেশিন তৈরি করেছিলেন যা ক্রিকেটে বোলিং করতে পারত। মেশিনটির নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়েছিল যখন এটি অস্ট্রেলিয়ান দলের শীর্ষ স্থান অধিকারী একজন খেলোয়াড়কে টানা চারবার আউট করতে সক্ষম হয়েছিল! তিনি চার্চ অফ ইংল্যান্ডের একজন নিযুক্ত পুরোহিত, ইতিহাস প্রেমী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, পর্বত পর্বতারোহী এবং একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। ৪ ই আগস্ট তাঁর জন্মদিন।

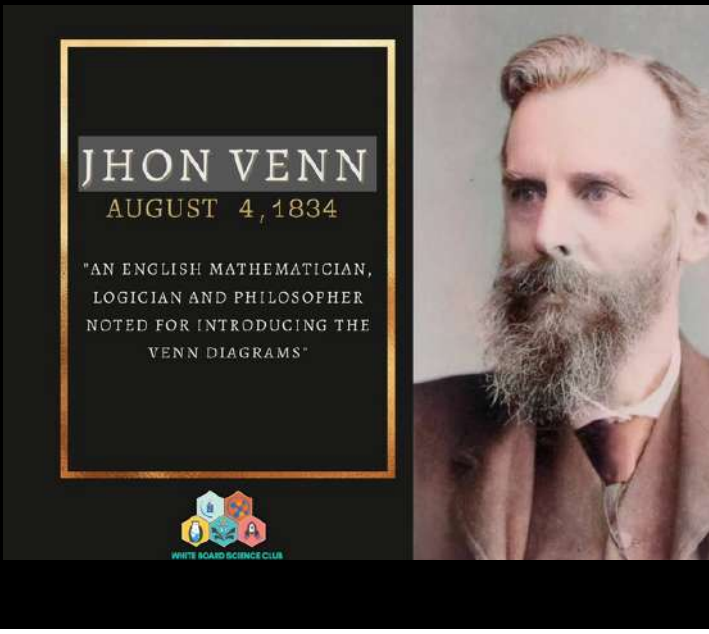
JHON VENN
AUGUST 4, 1834
"AN ENGLISH MATHEMATICIAN, LOGICIAN AND PHILOSOPHER NOTED FOR INTRODUCING THE VENN DIAGRAMS"
WHITE BOARD SCIENCE CLUB

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন, বাড়ছে প্রবণতা আত্মহত্যার দিনদিন

‘আর নয় আত্মহনন, জীবনকে ভালোবাসুন‘

খুব দুরন্ত আর হাসিখুশি মেয়ে ছিল ১৭ বছর বয়সী গুনগুন। সবকিছুর প্রতি ছিল তার গভীর মনোযোগ। তার আর যাই হোক সবসময় চঞ্চল আর হাসিমাখা স্বভাব থাকবেই। সবে মাত্র কোভিড-১৯ এর জন্য লকডাউন শুরু হলো। সবকিছুই যখন অনলাইনভিত্তিক হয়ে গেলো, অফলাইনে ঘরে বসে থাকা গুনগুন ও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। কোনোকিছুতে তার উত্তেজনা নেই; নেই কোনো কৌতূহল। অন্ধকার রুমে দিন রাত দরজা বন্ধ করে সময় কাটাত। বাড়ির মানুষগুলোও অতটা মনোযোগ দেয় নি। অমনোযোগীতার ভারে এক অভিশপ্ত ভোর সকালে সিলিং ফ্যানে ঝুলে নিজেই নিজের প্রাণ নিয়ে নিল গুনগুন। কেনই বা সে এমন করলে কেউ বুঝে উঠতে পারে নি। তার আত্মহত্যার পেছনে দুশ্চিন্তা দেখিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা পড়ে গেলো। আসলেই কী এর কারণ দুশ্চিন্তা ছিলো? শুধু এটাই নয় গুনগুনের আত্মহত্যার মতোন এমন শত শত ঘটনা এই মহামারীতে পুরো বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত এবং আতঙ্কিত বিষয়ের নাম হচ্ছে ‘করোনাভাইরাস’।এ ভাইরাস গোটা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে এবং রীতিমতো টালমাটাল করে ছাড়ছে।মহামারী করোনা এখন সারা বিশ্বের ত্রাস।করোনাভাইরাস মহামারীতে দেশে প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। সংক্রমণ এড়াতে মানুষ বাধ্য হয়ে একে অন্যের কাছ থেকে সামাজিক কিংবা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখছেন। এর প্রভাব পড়ছে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর।বেশি চাপে পড়ছেন শিশু, বয়স্ক আর নারীরা। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক সংস্পর্শের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা স্পর্শ শরীরে বিভিন্ন হরমনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে, যা প্রয়োজনীয় অনুভূতির জন্ম দেয় ও মানসিক চাপমুক্তি ঘটায়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, “ইতিবাচক স্পর্শে মানুষের শরীরে ডোপামিন, সেরোটোনিন, অক্সিটোসিন নামের হরমোনের নিঃসরণ বাড়ায় এবং করটিজলের নিঃসরণ কমায়, যার ফলে ইতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টি হয়। যেমন: অনুপ্রেরণা, সন্তুষ্টি, সন্তুষ্টি, নিরাপত্তা, মানসিক চাপমুক্তি ইত্যাদি। দীর্ঘদিন সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা মানসিক দূরত্ব তৈরি করতে পারে। শিশুর সম্মিলিত বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমাতে পারে এবং অতিরিক্ত মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে।” এই মানসিক চাপই একসময় ডিপ্রেশনে রুপ নেয় যা আত্মহত্যার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মরাই সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে ভুগছে। বাংলাদেশের তরুণরাও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। দিনের অধিকাংশ সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের ঘুম কম হচ্ছে, বিষণ্নতা ও হতাশা বাড়ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, জীবন যাত্রার রুটিন পরিবর্তন আর পরিবারে গুণগত সময় না পাওয়ায় তাদের মানসিক সুস্থতা বিঘ্নিত হচ্ছে, বাড়ছে অনলাইন আসক্তি আর আচরণজনিত সমস্যা।

শিশু-কিশোর আর তরুণদের মধ্যে আবেগের উঠানামা, ভুলে যাওয়া, মনোযোগের অভাব, ভালো লাগার বিষয়গুলোও ভালো না লাগা, খিটখিটে মেজাজ, রেগে যাওয়া, আগ্রাসী আচরণ, নিজের ক্ষতি করা ও আত্মহত্যার প্রবণতা এবং ঘুমের সমস্যা উপসর্গ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে।

> **"বাংলাদেশের ৩৪.৯ শতাংশ তরুণ তরুণীর মানসিক চাপ আগের চেয়ে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭০.৮ শতাংশ তরুণ-তরুণী মানসিক অসুস্থতায় ভুগে শারীরিকভাবে নিজের ক্ষতি করছে"**

আঁচল ফাউন্ডেশনের "আত্মহত্যা ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে তরুণদের ভাবনা" নামক একটি সেবা প্রতিষ্ঠান যা তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে তার এক জরিপে উঠে এসেছে বাংলাদেশের ৩৪.৯ শতাংশ তরুণ-তরুণীর মানসিক চাপ আগের চেয়ে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭০.৮ শতাংশ তরুণ-তরুণী মানসিক অসুস্থতায় ভুগে শারীরিকভাবে নিজের ক্ষতি করছে। মানসিক বিভিন্ন চাপের ফলে অনেকের মধ্যেই আত্মহত্যা করার প্রবণতা দেখা গেছে। এ সময় ৫০.১ শতাংশই আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেন। আত্মহত্যার প্রবণতা না থাকলেও মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে ছাড় পাচ্ছেন না প্রাপ্তবয়স্ক এবং করোনায় আক্রান্ত ব্যাক্তিবর্গ। মানসিক চাপ, উদ্বেগ, একাকীত্ব, অবসাদ ইত্যাদি যে হারে বাড়ছে, তা রীতিমতো ভয় জাগিয়েছে তাদের মনে। শারীরিক সমস্যা ও মৃত্যুর ঝুঁকির সঙ্গে তৈরি হচ্ছে মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা। মৃত্যুভীতি, শারীরিক উপসর্গের ভয়ই মূলত করোনা আক্রান্ত ব্যাক্তির মানসিক সমস্যার কারণ।

আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা বিষয়টি কি আসলেই এতো প্রবল যা একজন মানুষকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে সাহায্য করে? একটু জেনে নিই....

আমরা দুশ্চিন্তা এবং মানসিক চাপকে একই বিষয় ভেবে ভুল ধারণায় থাকি। দুশ্চিন্তা মানসিক চাপ থেকেও ক্ষতিকর। মানসিক চাপ সবারই কম বেশি থাকে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সারাক্ষণ মানসিক চাপে থাকা এবং এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে না পারা যা খুবই ভীতিকর একটি ব্যাপার তাই দুশ্চিন্তা নামে পরিচিত। দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য যেসব সামাজিক উপকরণ থাকা দরকার, সেগুলো না থাকায় আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অন মেন্টাল হেলথের পরিচালক জেফ ফ্লাডেন বলেছেন, "যারা কখনও আত্মহত্যার কথা কল্পনাই করেননি, এমন জনগোষ্ঠীর অসংখ্য মানুষের ফোনও আমাদের কাছে আসছে আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে মুক্তির সাহায্যে। করোনাভাইরাসের অভিঘাতে তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত"

মানসিক চাপ যে একটা অসুখ, তার যে চিকিৎসা দরকার শতকরা ৯০ জনই তা মনে রাখেন না। করোনা সংক্রমণ যেমন বাড়ছে; বাড়ছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও। সেই সাথে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ের উপরই। এভাবে সৃষ্ট চাপমূলক বা ভীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মানুষ এক ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে থাকে যাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় " *Fight or Flight Response*"। এটি অনিয়ন্ত্রিত এবং অনেকটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায় তাই এটিকে দীর্ঘ চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিম্নের কিছু বিষয় মানিয়ে নিতে পারলেই হয়ত আমরা মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে পারব:

- সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করা, পরিবারের সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম কাটানো, রুটিন বিষয়গুলো যেমন ঘুম, ঠিক সময়ে সুষম আর নিরাপদ খাবার খাওয়া, বাড়িতে হালকা ব্যায়াম, পর্যাপ্ত পানি পান করা ইত্যাদি চলমান রাখা।
- পরিবারের দূরের সদস্য আর বন্ধু বান্ধবের সাথে অনলাইনে, টেলিফোনে যোগাযোগ রাখা। একে অপরের খোঁজ নেওয়া।
- বাড়িতে চিত্তবিনোদন, ইয়োগা, মননশীলতা, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস এর চর্চা করা। ইউটিউব দেখে সহজেই শিখে নেওয়া যায়।
- অতীত বা ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে বর্তমানে থাকার চেষ্টা করা।
- পুরো পৃথিবী এখন হতাশাগ্রস্ত। তাই কাউকে দুশ্চিন্তা কেন করো বলে টিটকারি না দিয়ে তাকে মানসিকভাবে সহায়তা করুন।
- এই করোনা পরিস্থিতিতে নিজেকে আরো একটিবার ঢেলে সাজানো, সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের পাশে দাড়াঁনো, সাহায্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করতে পারি।
- নিজেকে ধন্যবাদ দেওয়া। সুস্থভাবে নিয়ম মেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছি এজন্য নিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে।
- যদি মানসিক ভাবে বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি এবং মানসিক সমস্যার লক্ষণগুলো আমাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে তবে অবশ্যই অনলাইনে বা সরাসরি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোবিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ করা।

কোভিড ১৯ বা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে পুরো বিশ্ব আজ আতঙ্কিত, ভীতসন্ত্রস্ত। বিশ্বজুড়ে চলা এই সংকটের মধ্যে আমরা যে আছি এটা মানতে হবে। সেই সঙ্গে ভাবতে হবে শুধু আমি একা নয় প্রতিটি মানুষ আমার সঙ্গে রয়েছে। এই বিপদ মোকাবেলার জন্য চাই ধৈর্য, দায়িত্বশীল আচরণ আর সাহস!

লেখায়:

হালিমা ইফ্ফাত সামিয়া
সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

সানজিদা রহমান
হাজেরা-তজু ডিগ্রি কলেজ

মুহাম্মদ আবরার জাবের
চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

WHITE BOARD SCIENCE CLUB
CHEMAHOLIC 1.0
7-9
SEPTEMBER
CHEMISTRY OLYMPIAD
PREPARATION WORKSHOP
NO REGISTRATION
FEE
MEDIA PARTNER
RISGEN BANGLADESH
TOPIC : ATOMIC STRUCTURE
REGISTER NOW
OPEN FOR ALL

শিউলীফুলের ভালোবাসা

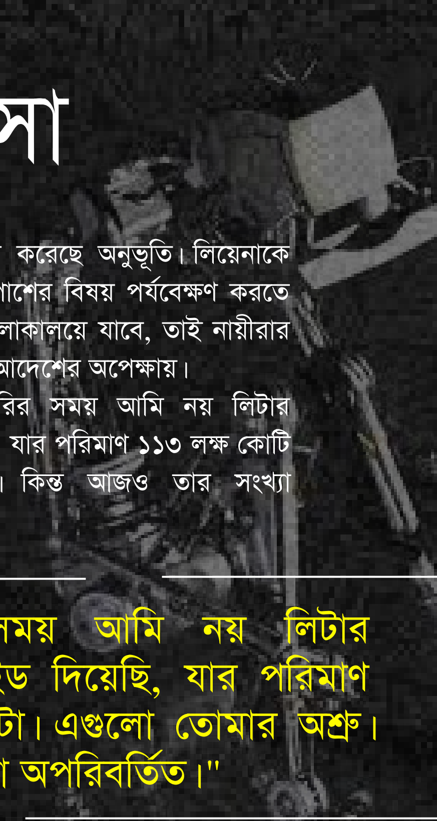

নায়ীরার দিকে আল্টাফোর্সিভ পিউপিলের উজ্জ্বল রশ্মিতে তাকিয়ে আছে। তার নিজ হাতে তৈরি এই রোবট, লিয়েনা। গত কয়েক বছরের অনেক পরিকল্পনা ও পরিশ্রমে অল্প অল্প করে লিয়েনাকে গড়ে তুলেছে সে। পৃথিবীতে রোবোটিক্সের প্রবল বিপ্লবে প্রান্তে প্রান্তে আজ রোবোটের অস্তিত্ব, কিন্তু প্রতিটিই ওয়ার্কিং রোবট। গত দশকের শুরুর দিকে যখন রোবো-বোর্ড প্রথম ওয়ার্কিং রোবট প্রস্তুত করে, হুট করেই মানুষ হয়ে পড়ে দায়িত্বশূণ্য। এসএমটি-ওয়ার্কার২১ এর চাহিদা বেড়ে যায় প্রবলভাবে। লোভের টানে রোবো-বোর্ড কেবল কাজ করতে থাকে ওয়ার্কিং রোবটের ওপর এবং নিষিদ্ধ করে দেয় অন্যান্য রোবট উৎপাদন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগেই নায়ীরার সূক্ষ হাতে অসংখ্য কপোট্রনিক সেল নিয়ে তৈরি নায়ীরার দিকে আল্টাফোর্সিভ পিউপিলের উজ্জ্বল রশ্মিতে তাকিয়ে আছে। তার নিজ হাতে তৈরি এই রোবট, লিয়েনা। গত কয়েক বছরের অনেক পরিকল্পনা ও পরিশ্রমে অল্প অল্প করে লিয়েনাকে গড়ে তুলেছে সে। পৃথিবীতে রোবোটিক্সের প্রবল বিপ্লবে প্রান্তে প্রান্তে আজ রোবোটের অস্তিত্ব, কিন্তু প্রতিটিই ওয়ার্কিং রোবট। গত দশকের শুরুর দিকে যখন রোবো-বোর্ড প্রথম ওয়ার্কিং রোবট প্রস্তুত করে, হুট করেই মানুষ হয়ে পড়ে দায়িত্বশূণ্য। এসএমটি-ওয়ার্কার২১ এর চাহিদা বেড়ে যায় প্রবলভাবে।

> "কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগেই নায়ীরার সূক্ষ হাতে অসংখ্য কপোট্রনিক সেল নিয়ে তৈরি হয়েছিলো লিয়েনা, যাকে অনুভূতির দেয়ালের ওপাড়ে পৌঁছে দিতে সে কাজ করে গেছে শুরু থেকেই"

লোভের টানে রোবো-বোর্ড কেবল কাজ করতে থাকে ওয়ার্কিং রোবটের ওপর এবং নিষিদ্ধ করে দেয় অন্যান্য রোবট উৎপাদন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগেই নায়ীরার সূক্ষ হাতে অসংখ্য কপোট্রনিক সেল নিয়ে তৈরি হয়েছিলো লিয়েনা, যাকে অনুভূতির দেয়ালের ওপাড়ে পৌঁছে দিতে সে কাজ করে গেছে শুরু থেকেই। লিয়েনার মাঝে সে তৈরি করেছে নানা ধরনের নালি, পথ করে দিয়েছে হাজার হাজার ইলেক্ট্রনের। লিয়েনার চুল হিসেবে প্রতিটি সিলিকন ফাইবার দক্ষ হাতে বসিয়েছে সে, ইলেক্টোহার্ট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে তড়িৎ গতিপথ। কৃত্রিম এই অন্তরের ভেতরে নানাভাবে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে অনুভূতি। লিয়েনাকে নিয়ে প্রায়ই সে বের হয়, আশেপাশের বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে শেখায় তাকে। আজকেও তারা লোকালয়ে যাবে, তাই নায়ীরার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায়।

নায়ীরা বললো, "তোমাকে তৈরির সময় আমি নয় লিটার ইলেক্ট্রোল্যাক্রিমাল-ফ্লুইড দিয়েছি, যার পরিমাণ ১১৩ লক্ষ কোটি ফোঁটা। এগুলো তোমার অশ্রু। কিন্ত আজও তার সংখ্যা অপরিবর্তিত।"

> "তোমাকে তৈরির সময় আমি নয় লিটার ইলেক্ট্রোল্যাক্রিমাল-ফ্লুইড দিয়েছি, যার পরিমাণ ১১৩ লক্ষ কোটি ফোঁটা। এগুলো তোমার অশ্রু। কিন্ত আজও তার সংখ্যা অপরিবর্তিত।"

লিয়েনা তার শান্ত ধাতব স্বরে বললো, "আমি বিদ্রুপ শিখেছি, আনন্দ শিখেছি, কিন্তু মানুষের মমতার অংশ আমার মাঝে নেই। আমি অন্যের মুখভঙ্গি দেখে দুঃখিত হওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু ইলেক্ট্রোল্যাক্রিমাল-ফ্লুইড আপনি স্বয়ংক্রিয় রেখেছেন। আমি চাইলেও সেটি নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে ব্যবহার পারবো না।"

"তুমি কখনোই সত্যিকার কষ্টের অনুভূতি পর্যন্ত পৌঁছাওনি। তোমাকে আরো চেষ্টা করতে হবে।"

"ঠিক আছে, নায়ীরা।"

এমন সময় সিয়াম প্রবেশ করলো রোবো-বোর্ডের পত্র নিয়ে, দাড়ালো নায়ীরার মুখোমুখি। ভাজ খুলে স্ক্রিনপেপারটি এগিয়ে দিয়ে বললো, "আমি দুঃখিত নায়ীরা।"

নায়ীরা দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করলো। কাপা চোখে পড়তে শুরু করলো চিঠিটি।

নায়ীরা,

ষোলো বছর আগে আপনি অনুভূতিসম্পন্ন রোবট তৈরি করার প্রজেক্ট শুরু করেছিলেন । আপনার হাতেই সৃষ্টি হয়েছে লিয়েনা, রোবোটিক্সের জগতে একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী যন্ত্র। পরের বছরেই রোবো-বোর্ডের নতুন নিয়মে ভিন্নধর্মী রোবট উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হলেও লিয়েনা ধ্বংস করা হয়নি। বরং আপনাকে পনেরো বছর সময় দিয়ে দুইটি শর্ত পূরণ করতেদেওয়া হয়েছিলো

১. লিয়েনার নিজের চিন্তনদক্ষতা ও ইলেক্ট্রোহার্ট তৈরি।

২. লিয়েনার মধ্যে যেকোনো তিনটি মানব অনুভূতি সৃষ্টি।

প্রথম শর্তটি আপনি সফলভাবে সম্পূর্ণ করেছেন, অভিনন্দন।কিন্তু দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে থমকে পড়েছেন। লিয়েনার মাঝে কেবল

ছোট্ট মেয়েটি লোকটির হাত টেনে বললো, "বাবা, তুমি এটা ফেলে দাও। এটা তোমাকে ভেতর থেকে কষ্ট দিবে। আমি আছি না? আমার এই ফুলগুলো নাও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই? তোমার মন এই এমনিই ভালো হয়ে যাবে।"

দুইটি অনুভূতি আছে, আনন্দ ও বিদ্রুপ। যদি আজ রাত বারোটার মধ্যে লিয়েনার মাঝে নতুন কোনো অনুভূতির সঞ্চার না হয় তবে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাকে ধ্বংস করা হবে।

- রেই সুইফট,
নির্বাহী পরিচালক,
রোবো-বোর্ড।

নায়ীরা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিঠিটি ফিরিয়ে দিলো। লিয়েনার দিকে তাকিয়ে বললো, "আমাদের হাতে সময় খুব কম। তোমার চেষ্টা তোমাকেই সাহায্য করবে।"

লিয়েনা সহজভাবে উত্তর দিলো, "নায়ীরা, আমি চেষ্টা করছি। আমি জানি আমার অস্তিত্ব রক্ষার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি আমরা।"

লিয়েনাকে নিয়ে বের হয়ে এলো নায়ীরা। নিয়ে গেলো আনন্দের মাঝে, কিন্তু লিয়েনার হাসিমুখে কোনো উত্তেজনা নেই। নিয়ে গেলো অধিক উচ্চতায়, লিয়েনার মাঝে ভয় নেই। পড়ে শোনালো পৃথিবীর ভয়াবহ সমস্যা, লিয়েনার মাঝে অস্থিরতা নেই।

সারাদিনে নানাভাবে চেষ্টা করলো নায়ীরা। কিন্তু লিয়েনার ভেতরকার সামঞ্জস্যকে খানিকটাও বদলাতে পারলো না সে। বুঝতে পারলো তার দীর্ঘদিনের এই সঙ্গীর মাঝে সে হয়তো আর কখনোই ভিন্নতা তৈরির সুযোগ পাবে না। আজ সন্ধ্যায় পার্কের এই বেঞ্চের অন্যপাশে বসা যন্ত্রটি হারিয়ে যাবে কিছুক্ষণ পরেই॥

লিয়েনা বেঞ্চের একপাশে বসে আশেপাশে। দেখছে। সে জানে তার অস্তিত্ব বিলীনের পথে।

কিন্তু সেটা তার উপর কোনো প্রভাব ফেলছেনা।

তার চোখ আটকে গেছে খানিক দূরে এক ছোট্ট মেয়ের দিকে। মেয়েটি একটি গাছ থেকে কতগুলো ফুল তুলে নিয়ে দৌঁড়ে গেলো একজন প্রাপ্তবয়স্কের দিকে। লোকটি ধূমপান করছে। লিয়েনা স্পষ্ট দেখতে পেলো লোকটির প্রতিটি কোষকে নিকোটিন উদ্দীপ্ত করছে। একসাথে উঠছে হাজারো চিন্তার ঝলক। লোকটি ভীষণরকম দুশ্চিন্তা করছে। সম্ভবত কোনো মারাত্মক সমস্যায় পরেছে।

ছোট্ট মেয়েটি লোকটির হাত টেনে বললো, "বাবা, তুমি এটা ফেলে দাও। এটা তোমাকে ভেতর থেকে কষ্ট দিবে। আমি আছি না? আমার এই ফুলগুলো নাও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই? তোমার মন এই এমনিই ভালো হয়ে যাবে।"

লিয়েনার ঠোঁটে বিদ্রুপের এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো। লোকটি নিশ্চয়ই তার নিকোটিন গ্রহণ থামাবে না। তার উপর মেয়েটি তাকে 'বাবা' নাকি কী যেন এক অদ্ভুত শব্দে ডাকছে। কিন্তু লিয়েনার কোটি কোটি কপোট্রনিক সেলে বৈদ্যুতিক তোলপাড় জাগিয়ে লোকটি হাতের সিগারেট ফেলে দিলো।

হাঁটু গেড়ে মেয়েটির সামনে বসে বললো, "আমি দুঃখিত, মা। দেখি এই শিউলি ফুলগুলো?"

লোকটি হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো নিলো এবং লিয়েনা লক্ষ করলো লোকটির সকল বিচ্ছিন্ন চিন্তা সুশৃঙ্খল হতে শুরু করেছে। লোকটির নিউরনে প্রশান্তিময় সংকেত আসছে। লিয়েনা এটুকু জীবনে সর্বোচ্চ রেজুলেশনের গ্রাফিক্স দেখেছে, কয়েক কোটি মেগাপিক্সেলের দৃশ্য দেখেছে, বিশ্বের অনেক অংশ ঘুরে এসেছে; কিন্তু শিউলি ফুলের ভালোবাসার মতো সুন্দর আর কিছুই দেখেনি, কখনোই না। এই ব্যাপার তারজন্য একেবারেই নতুন। সম্ভবত নতুন কোনো এক অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে তার ভেতরে।

রোবো-বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক রেই সুইফট বিস্মিত চোখে রোবট মডারেটিং স্ক্রিনে লক্ষ করলেন লিয়েনার মোট ইলেক্ট্রোল্যাক্রিমাল-ফ্লুইড আগের থেকে তিন ফোটা কমে গিয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠায়রোবো-বোর্ডের রেই বিস্মিত চোখে রোবট মডারেটিং স্ক্রিনে লক্ষ করলেন লিয়েনার মোট ইলেক্ট্রোল্যাক্রিমাল-ফ্লুইড আগের থেকে তিন। ফোঁটা কমে গিয়েছে, কিন্তু তার মুখে প্রশান্তিময় হাসি।

তবে এবার যন্ত্রও ভালোবাসতে জানে?

আঙ্গীশা নূর

ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

হাইপারলুপ টিউব ও পড

ছবিতে দেখা যায় যে এক বিশাল লম্বা টিউব। এটিই মূলত ক্যাপসুল বা পডের (pod) এর রাস্তা। পড হলো যেখানে যাত্রী বসবে। পডের সামনের অংশকে বলা হয় Aeroshell যা কার্বন ফাইবার প্যানেলের তৈরি; এটি অত্যন্ত মজবুত কিন্তু হালকা।পডের নিচের দিকে থাকে ডিসি মোটর। হাইপারলুপের টিউবটি প্রায় বায়ুশূণ্য করে ফেলা হয়।কারণ, টিউবের ভেতর যদি বায়ু থাকে তবে Aerodynamic এর মতানুযায়ী ক্যাপসুল দ্রুত চলার পথে বাধা পাবে, ফলে গতি কমে যাবে। বায়ুশূন্য করার জন্য টিউবে পর্যায়ক্রমে পাম্পিং মেশিন বসানো থাকে। তবে কি কেবল বায়ু অপসারণ করলেই মামলা মিটে গেল? তা কিন্তু নয়!
হাইপারলুপের আসল রহস্য হলো "ম্যাগনেটিক ল্যাভিটেশনে (*Magnetic Levitation*) "

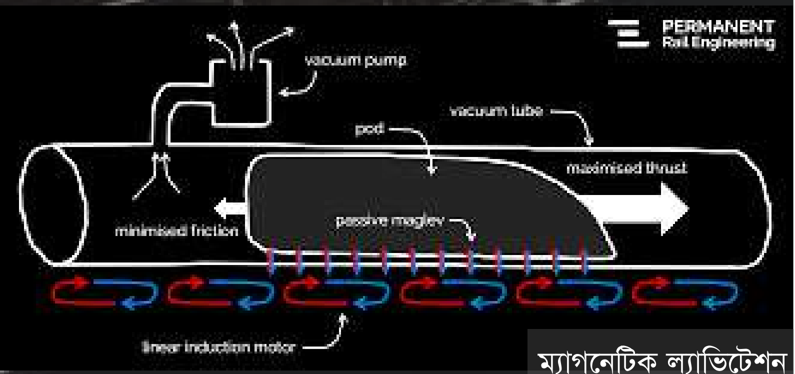

ম্যাগনেটিক ল্যাভিটেশন

> "চৌম্বক ক্রিয়ার দরুন ভাসমান কোনো জিনিসকে হালকা ধাক্কা দিতে পারলেই তা অনেক বেশি গতিপ্রাপ্ত হয়, গবেষণায় যার পরিমাণ পাওয়া গেছে ৫০ গুণ হিসেবে"

ল্যাভিটেশন কি?

ল্যাভিটেশন হলো কোনো বস্তুর ভাসা। কোনো চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর উপর যদি আর একটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু রাখা হয় তবে তা বিকর্ষণের কারণে ভাসবে। ঐ ভাসা অবস্থায় যদি ভাসমান চুম্বককে হালকাভাবেও ছোঁয়া হয় তাহলে তা দূরে ছিটকে পড়ে। অর্থাৎ, চৌম্বক ক্রিয়ার দরুন ভাসমান কোনো জিনিসকে হালকা ধাক্কা দিতে পারলেই তা অনেক বেশি গতিপ্রাপ্ত হয়, গবেষণায় যার পরিমাণ পাওয়া গেছে ৫০ গুণ হিসেবে।হাইপারলুপেও এই কাজটি করা হয়ে থাকে।

হাইপারলুপে প্রথমেই ক্যাপসুলটি ভাসা শুরু করে দেয় নাহ।প্রথমে ক্যাপসুল বা পডটিকে ধাক্কা দিতে হয়। এই কাজটি করে *Linear Induction Motor*। *Linear Induction Motor* এর দুটি অংশ থাকে -

একটি *Rotor*, যা থাকে পডের গায়ে রোটেট করতে পারে এমনভাবে আর অপরটি হলো *Stator* যা লম্বা টিউবের গায়ে সাটানো থাকে।
সাধারণ মোটরে *Rotor* এর চারপাশে *Stator* থাকে, কিন্তু হাইপার লুপে *Stator* থাকে টিউবের গায়ে লিনিয়ার বা শোয়ানো অবস্থায়। *Stator* হলো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক, অর্থাৎ ইলেক্ট্রিকের সংস্পর্শে এটি বিদ্যুতের ন্যায় কাজ করে।
Rotor এবং *Stator* এর মাধ্যমে ক্যাপসুলটিতে ধাক্কা লাগা শুরু হয় এবং তা চলতে শুরু করে। প্রায় *40-45 mph* গতি অর্জনের পর শুরু হয় পরবর্তী ধাপ - ল্যাভিটেশন।
পডের গায়ে এক বিশেষ সন্নিবেশে সাজানো ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে একে বলা হয় *Halbach Array*. সাউথ এবং নর্থ পোলের সঠিক সন্নিবেশে এটি বিশাল মানের ফিল্ড তৈরি করতে পারে, যা প্রায় ৩০০০ - ৭০০০ *gauss*।

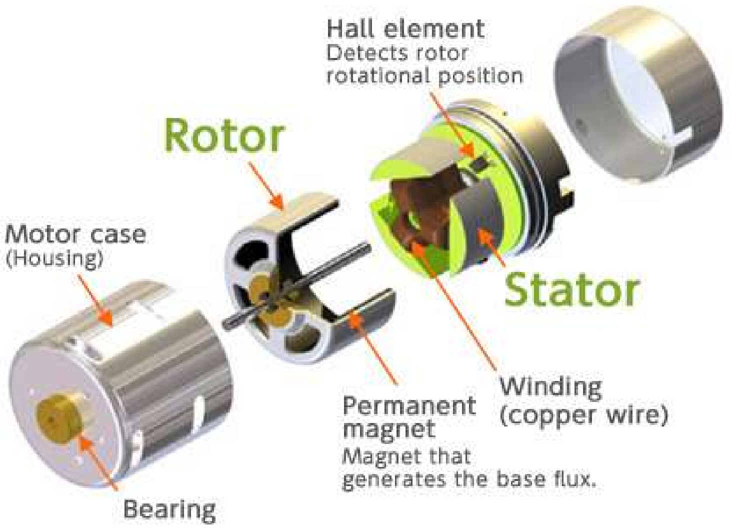
Hall element
Detects rotor rotational position
Rotor
Motor case (Housing)
Stator
Winding (copper wire)
Permanent magnet
Magnet that generates the base flux.
Bearing

> "*Linear Induction Motor* এর দুটি অংশ থাকে
> একটি *Rotor*, যা থাকে পডের গায়ে রোটেট করতে পারে এমনভাবে আর অপরটি হলো *Stator* যা লম্বা টিউবের গায়ে সাটানো থাকে"

এই বিশাল মানের ম্যাগনেটিক ফিল্ড পডটিকে ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। এবং ধাক্কার ফলে ভাসমান অবস্থায় পডটির বেগ হয় অত্যন্ত দ্রুত। প্রায় ৭৬০ মাইল/ঘন্টা (সর্বোচ্চ)।

আর গন্তব্যে পৌছানোর পর *Induction motor* রিভার্সলি কাজ করে, ফলে গতি কমতে থাকে। অতঃপর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মান কম হওয়ায় পডটি ল্যাভিটেট করা বন্ধ করে।

কিন্তু দ্রুত গতির এই বাহন যেমন অত্যন্ত ব্যায়বহুল তেমনি বিপদের সম্ভাবনাও রয়েছে। যদি হাইপারলুপের টিউবে কোনো সমস্যা হয় বা বায়ু লিক হয় তবে বায়ুর সাথে ক্যাপসুলের মারাত্মক সংঘর্ষ হবে। কেননা, ক্যাপসুলে বায়ুচাপ প্রায় প্রায় ১০০ প্যাসকেল। কিন্তু তবুও হাইপারলুপ সায়েন্স ফিকশনকে দিয়েছে বাস্তব রূপ। ৬ ঘন্টার পথকে করে দিচ্ছে কেবল ২০ মিনিটের। শব্দের চেয়েও দ্রুতবেগ অর্জন করেছে হাইপারলুপ। ইলন মাস্ক প্রথম যে হাইপারলুপের স্কেচ করেছিল তা চলত *Air compressor* কে কাজে লাগিয়ে। তার জায়গায় এখন কাজ করে *Induction Motor*। ২০২৫ নাগাদ ভার্জিন হাইপারলুপ *Safety certificate* নিশ্চিত করতে চায় আর ২০৩০ নাগাদ বাণিজ্যিক ভাবে নামতে চায়। বর্তমানে *Virgin Hyperloop* এর পাশাপাশি *Hyperloop Transportation Technologies* (*Hyperloop TT*), *Transpod*, *DGWHyperloop*, *Arrivo* ইত্যাদি কোম্পানি কাজ করে যাচ্ছে।

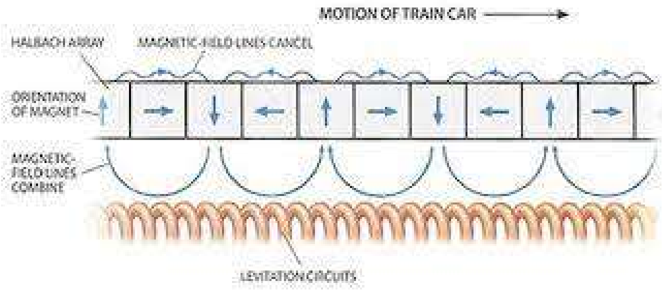
MOTION OF TRAIN CAR
HALBACH ARRAY
MAGNETIC-FIELD-LINES CANCEL
ORIENTATION OF MAGNET
MAGNETIC-FIELD-LINES COMBINE
LEVITATION CIRCUITS

কন্ট্রোলিং ব্যবস্থার উন্নতি হলেই সাধারণ এক স্কেচের রূপ থেকে বাস্তব জমিনে চষে বেড়াবে এই রোবোটিক অশ্ব।

এনামুল হক জুয়েল
এস এস সি পরীক্ষার্থী
চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

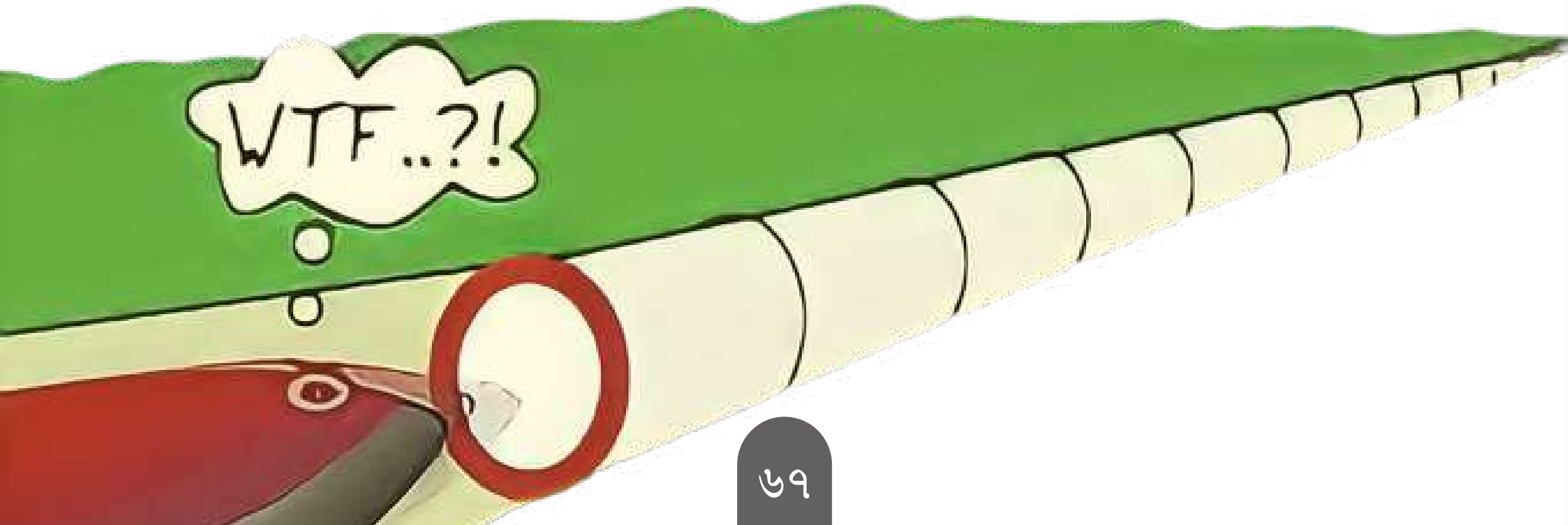

পরের সংখ্যাগুলোতে যা আসতে চলেছে...

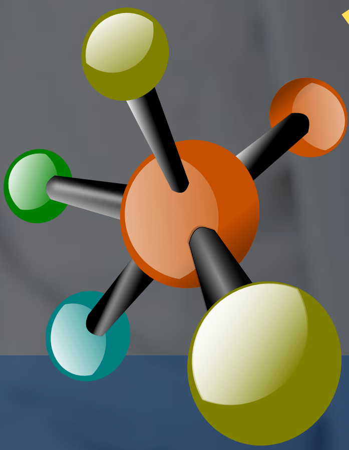

রসায়ন অলিম্পিয়াড প্রিপারেশন সিরিজ

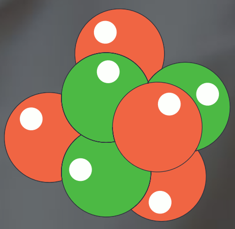

কীভাবে লেখা হবে এই সিরিজ? অবশ্যই প্রতি সংখ্যায় বের হবে বিভিন্ন নমুনা প্রশ্ন বা চ্যালেঞ্জ প্রশ্ন যেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করে তুমি নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এরপর থাকবে কেমিস্ট্রির বিভিন্ন টপিক নিয়ে কিছু ইন্ট্রো এবং তুমি সেগুলো কীভাবে পড়াশুনা করতে পারো মজা করে সেসব নিয়ে বেশ কিছু কথা। আমরাও বেশ কিছু টপিকের উপর লিখব যেখান থেকে তোমরা কেমিস্ট্রির বেশ কিছু টপিক খুব মজা করে শিখতে পারবে! এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডের প্রশ্ন এবং তার সমাধান প্রক্রিয়া নিয়েও থাকবে কথা। কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডের এই প্রিপারেশন সিরিজের জন্য তুমি কী করতে পারো? অনেক কিছু। তুমি নিজে তো প্রিপারেশন নিচ্ছ, সেই জ্ঞান তুমি অন্য কেও দিতে পারো। তার জন্য তুমি বিভিন্ন আর্টিকেল/নোট লিখে পাঠিয়ে দাও আমাদের ইমেইলে। এছাড়া আমাদের পক্ষ থেকে তুমি কোন কোন বিষয়ের উপর নোট চাও তাও জানাতে থাকো আমাদের ম্যাগাজিনের মেইলে! মেইলে নাম, শ্রেণী, বিদ্যালয় জানাতে ভুলোনা!

আমাদের মেইলঃ whiteorigins.wbsc@gmail.com

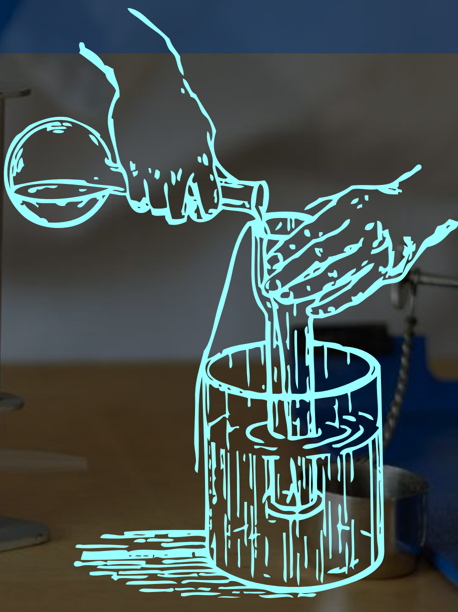

“পানির গুরুত্ব কি Overrated?”

আমাদের জীবনে কতবার “পানির অপর নাম জীবন” বা এরকম কথা শুনতে হয়েছে তা আমরা গুণে শেষ করতে পারব না। এমনকি লক্ষ করে থাকবে যে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বাইরে প্রাণের সন্ধান করলেও খুঁজছে সেখানে পানি। এবং তারা পানির অস্তিত্ব পেলেই সেখানে প্রাণ সম্ভব বলে লাফিয়ে উঠছে! কেন পানি এত গুরুত্বপূর্ণ প্রাণের জন্য, এর কি এমন বৈশিষ্ট্য আছে যার কারণে আজকে আমি এই আর্টিকেল লিখতে পারছি , তা অল্প করে বলার চেষ্টা করব।

আলোচনায় যাওয়ার আগে যা জানা দরকার

ধরে নিলাম যারা আর্টিকেল পড়ছ তারা অল্প করে কেমিস্ট্রি জানো। রসায়নের নাম শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কোনো লম্বা বিক্রিয়া লিখতে বসব নাহ। আশা করি এইটুকু তো সবাই শুনেছি যে পানির রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে H2O (এইটা না জানার মত কিছু নাহ, না জানলে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ এর আগের এপিসোড দেখা শুরু করলেই জেনে যাওয়া সম্ভব)। তার মানে হচ্ছে দুইটা হাইড্রোজোন আর একটা অক্সিজেন মিলে পানি তৈরি করে। যারা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন - এগুলা কি জিনিস সেটাই এখনো জানো নাহ, তারা এমনেই পড়ে যাও - ধরে নাও এরা দুইটা জিনিস যারা একসাথে হলেই তারা মিলে পানি তৈরি হয়ে যায় (প্রকৃতপক্ষে একসাথে হলেই হয় নাহ, তাদেরকে ইলেক্ট্রিক শক টক ও দিতে হয়, তাদের মিলিত না হওয়ার অনেক ইচ্ছা)।

> "অক্সিজেন গরীবের ছেলে, হাইড্রোজেন বড়লোকের মেয়ে। তাই অক্সিজেন বড়লোক হাইড্রোজেন এর জামাকাপড় বা টাকা পয়সা ধরে রাখে। দূর থেকে দেখে মনে হয় অক্সিজেন ছোটলোক (ঋণাত্মক চার্জযুক্ত), হাইড্রোজেন বড়লোক (ধ্বনাত্মক চার্জযুক্ত)। "

হাইড্রোজন আর অক্সিজেন এর বাইরে অনেক ইলেক্ট্রন থাকে (ধরে নাও সুন্দর জামাকাপড় বা টাকা পয়সা থাকে)। অক্সিজেন গরীবের ছেলে, হাইড্রোজেন বড়লোকের মেয়ে। তাই অক্সিজেন বড়লোক হাইড্রোজেন এর জামাকাপড় বা টাকা পয়সা টেনে ধরে রাখে (মানে হচ্ছে সে হাইড্রোজেন এর ইলেক্ট্রনগুলোকে নিজের কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করে, তার ইলেক্ট্রন আসক্তি বেশি)। কিন্তু এভাবে খাবলাখাবলি করতে দেখলে মানুষ দূর থেকে দেখেই বুঝবে যে অক্সিজেন ছোটলোক। তাই দূর থেকে দেখে মনে হয় অক্সিজেন ছোটলোক (ঋণাত্মক চার্জযুক্ত), হাইড্রোজেন বড়লোক (ধ্বনাত্মক চার্জযুক্ত)।

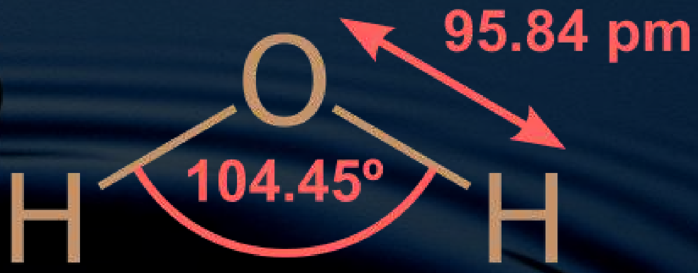

এখন এই ছোটলোকদেরকে দেখলে আশেপাশের অন্যান্য বড়লোক হাইড্রোজেন গুলার মনে মায়া জন্মায়, তাই তারা অক্সিজেন এর কাছে থাকতে চায় (যেহেতু অক্সিজেনের অল্প ঋণাত্মক চার্জ এবং হাইড্রোজেন এর অল্প ধনাত্মক চার্জযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তাই তারা কাছাকাছি থাকতে চায়)। একইভাবে লোভী অক্সিজেন, অন্য হাইড্রোজেনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায়। তার মানে হচ্ছে যদি কয়েকটা পানির কণা থাকে, তাহলে সেখানের মধ্যে অক্সিজেন অন্য পানির কণার হাইড্রোজেন গুলার সাথে একটা সম্পর্ক রাখবে, আর হাইড্রোজন কণাও আশেপাশের অক্সিজেন কণা গুলার একটা সম্পর্ক রাখবে। এই সম্পর্ককে বলা হয় হাইড্রোজেন বন্ড বা হাইড্রোজন এর ভালোবাসার কারণে বন্ধন।(প্রশ্ন জাগতেই পারে তোমাদের মনে যে এতগুলো হাইড্রোজেন এত অল্প অক্সিজেন কে চায়, ওদের মধ্যে হিংসা তৈরি হয় না? উত্তর হচ্ছে, হয়। হাইড্রোজেন গুলো একজন আরেকজন কে ঘৃণা করে এবং সর্বোচ্চ দূরে থাকতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভালোবাসার অক্সিজেনকে এসব নিয়ে কোনো কথা শুনায় নাহ। অক্সিজেন তো সোনার ছেলে, তাকে কীভাবে কথা শুনাবে!)

মূল কথা হচ্ছে একটা পানির কণার মধ্যে দুইটা হাইড্রোজন আর

একটা অক্সিজেন এর মধ্যেই সম্পর্ক থাকে বড়সড় রকমের। কিন্তু অনেক পানির কণা যখন একত্র হয়, তখন নতুন এক খেলা তৈরি হয়। বড়সড় সম্পর্ক ছাড়াও তারা বেশ কিছু ছোটখাটো সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। এই যে খেলা, এই খেলার নাম Polarization Effect of water এবং পানির যে ধর্মের কারণে এই খেলা হয়, তা হচ্ছে Polarity। পানি যে জীবনের অপর নাম, এর একটা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে হাইড্রোজেন এর অক্সিজেন এর প্রতি ভালোবাসা এবং অন্য হাইড্রোজেন এর প্রতি ঘৃণা।

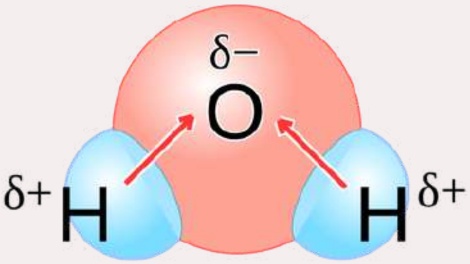

পানি খুব ভালো দ্রাবক

দ্রাবক মানে কি বুঝছ নাহ? বুঝিয়ে বলি। ধর তুমি চিনির শরবত বানাচ্ছ, মানে এক গ্লাস পানির মধ্যে আধা চামচ চিনি ঢেলে দিচ্ছ। একটু করে নাড়ানোর পরে তুমি কি চিনি খুঁজে পাবে আর? পাবে নাহ। চিনি উধাও হয়ে যাবে। আসলে চিনি পানির মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর এরকম অনেক জিনিসকে পানি তার নিজের মধ্যে দ্রবীভূত করে ফেলতে পারে। ফলে আমাদের জীবন ধারণ অনেক সহজ হয়। কীভাবে? অনেক ভাবে। ধরো যে, জিনিস সহজে মিশতে পারে। রাসায়নিক বিক্রিয়া মানে কিন্তু মিশতে পারা! যত সহজে দুটো জিনিস মিশতে পারবে, তত সহজে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে। এবং তোমার যদি মনে হয় যে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুত হলে আমার কি, তাহলে বলি তুমি সারাদিন যা যা কাজ করতে পারছ, সব পারছ তোমার দেহের ভিতরে প্রতি সেকেন্ডে বিলিয়ন বিলিয়ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে বলে। এভাবে দ্রবীভূত অবস্থা যেকোনো কিছু দেহের ভেতরে ঢুকানো ও সহজ। যেমন ধর গাছের কথা। গাছের মুখ নেই যে সে খেতে পারবে। কিন্তু সে চাইলেই পানি শুষে নিতে পারবে। তুমি যদি ভাবো যে গাছ পানি খেয়ে বেঁচে আছে পুরোপুরি, তাহলে তুমি ভুল। সেই পানির সাথে অনেক লবণ দ্রবীভূত থাকে এবং গাছ ভালোভাবে বাঁচার জন্য পানির মধ্যে থাকা সেই লবণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ!

দেহের ভিতরে প্রতি সেকেন্ডে বিলিয়ন বিলিয়ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে

কিন্তু পানি এত ভালো দ্রাবক কীভাবে? বুঝানোর চেষ্টা করি। পৃথিবীতে তুমি আশে পাশে যা যা দেখো, তার একটা বড় অংশ তৈরি হয় আয়নিক বন্ধন দিয়ে। আয়নিক বন্ধন মানে কি? দুজন ইলেক্ট্রন বিনিময় করার কারণে পাশাপাশি থাকা। যেহেতু একজনের টাকা (ইলেক্ট্রন) আরেকজনের কাছে, তাই তাদের মধ্যে বন্ধনটা অনেক শক্ত হয় টাকা (ইলেক্ট্রন) ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত। মানে এদের মধ্যেও একটা বড়লোক ছোটলোক ব্যাপার আছে। জাস্ট সমস্যা হচ্ছে অক্সিজেন টাকা কেড়ে নিয়ে সে ছোটলোক, সেখানে আয়নিক বন্ধনে যে টাকা কেড়ে নিচ্ছে সে বড়লোক। একটা ভালো আয়নিক বন্ধন এর উদাহারণ হচ্ছে লবণ। লবণ সোডিয়াম এবং ক্লোরিন দিয়ে গঠিত (আরো দুইটা জিনিস যারা টাকা লেনদেন করে)। তো সোডিয়াম এবং ক্লোরিন এর মধ্যে রাজার ছেলে গরীবের ছেলে ইফেক্ট হয়। রাজার ছেলে যেমন ভাবে ইশ আমি যদি একদিন গরীব পারতাম! গরীব ভাবে ইশ আমি যদি রাজা হতে পারতাম! স্বাভাবিক ভাবে এখানে গরীব সোডিয়াম এবং রাজা ক্লোরিন। সোডিয়াম চায় টাকা (ইলেক্ট্রন), এবং ক্লোরিন দিয়ে দিতে চায় টাকা। সোডিয়াম সেই টাকা পেয়ে বড়লোক হয়ে যায়, ক্লোরিন ও হয়ে যায় ছোটলোক দান করে। কিন্তু যেহেতু টাকার মায়া ছাড়তে পারে নাহ, তাই সোডিয়ামে কাছাকাছি ক্লোরিন আয়নিক বন্ধন হিসেবে যুক্ত হয়ে থাকে(হাইড্রোজেন অক্সিজেন এর প্রেমের ফাঁদে পা দিসিল, তাই সেটা ভিন্ন হিসাব। I mean, সেখানে তারা অষ্টক পূর্ণ করার পরেও আরো ইলেক্ট্রন চাচ্ছিল নিজের কাছে, এখানে এরা তাদের অষ্টক পূর্ণ করার জন্য চাচ্ছে)। তো একইভাবে সোডিয়াম বড়লোক থাকা অবস্থায় ছোটলোক অক্সিজেনকে দেখে, মায়া জন্মায়। ক্লোরিন যেহেতু আগে বড়লোক, এখন নতুন গরীব- তাই তার হাইড্রোজেন এর অবস্থা দেখে খারাপ লাগে। ফলে সোডিয়াম আর ক্লোরিন কিছুক্ষণের জন্য অল্প দূরে গিয়ে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন এর কাছে থাকার চেষ্টা করে। ফলে তারা বন্ধনটা অল্প শিথিল করে দেয়, অর্থাৎ দ্রবীভূত হয়ে যায়! এই যে টানাহেঁচড়া করতে করতে অক্সিজেন ছোটলোক হলো, এটার কত অবদান চিন্তা করে দেখ একবার! এভাবে যাদের মধ্যেই যে বড়লোক

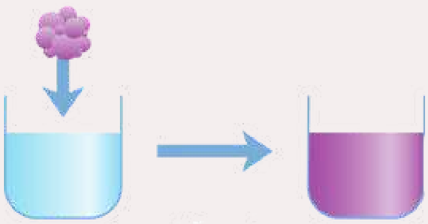

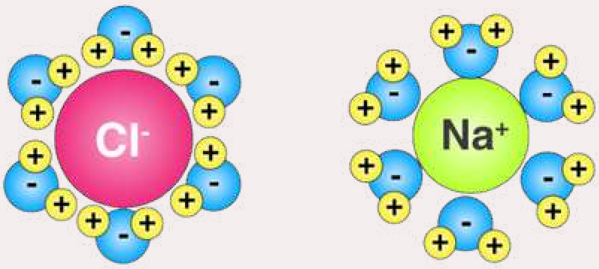

#সবই_মায়া

ছোটলোক (ঋনাত্মক, ধনাত্মক) দেখতে পায়, তাদেরকেই সে আলাদা করে ফেলতে পারে।

#সবই_মায়া

পানিকে গরম করা খুব কঠিন

বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, পানির Heat Capacity খুবই বেশি। মানে হচ্ছে এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে অন্য যেকোন বস্তু থেকে অনেক বেশি তাপ দিতে হয় পানিকে। ধরো যে তুমি একটা লোহাকে যদি ১০ তাপ দাও, তাহলেই তার তাপমাত্রা ১ বেড়ে যায়। কিন্তু সেখানে পানিকে ১,০০০ দিলে তাহলে তার তাপমাত্রা ১ বাড়বে (সঠিক সংখ্যা নাহ, বুঝানোর জন্যে বলা)।

তুমি বলতেই পারো যে, অংকন ভাইয়া, এটা হলে জীবনের কি লাভ? শুনো পানিতে প্রচুর জীব বসবাস করে এবং অনেকেই ধরো যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা না পেলে বাঁচতে পারে না। এখন পানির তাপমাত্রা বাড়ানো খুব কঠিন (কমানোও খুব কঠিন উলটা দিকে ধরলে), তাই পানির ভিতরে যারা থাকে তারা সব সময়ই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা পেয়ে যায়! এবং তোমরা আশা করি অনেকেই জানো যে অনেক স্থলের প্রাণীই এক সময় জলে ছিল। যদি তারা তখনই মরে যেত, এখন আর প্রাণ থাকত নাহ। প্রাণ শুধু সৃষ্টি হলেই তো হবে নাহ, তাকে বাঁচার জন্য ভালো ব্যবস্থাও দিতে হবে!

এজন্যই কখনো তীব্র রোদের মাঝেও ছেড়াদ্বীপের কাছে গিয়ে জাহাজ থেকে একটা ঝাঁপ দিও (অবশ্যই সতর্ক ভাবে)। দেখবে তখন, পানির নিচে কত আরাম! আহ! অনেক দিন যাওয়া হয় না, শীঘ্রই যাওয়া উচিত আবার (অবশ্যই করোনা সংক্রমণ থেমে গেলে)।

"প্রতিটা ঘামের কণা অনেকটুকু তাপমাত্রা কমিয়ে দিতে পারে শরীরের ভেতরের। তাই যতই গরম পড়ুক না কেন, শরীরের তাপমাত্রা ৯৮ ডিগ্রী ফারেনহাইটের কাছাকাছিই থাকে।"

এখানে আরেকটা জিনিস মনে করিয়ে দিই যে, পানির বাষ্প হওয়ার জন্য ও প্রচুর পরিমাণে তাপ দরকার হয়। যখন অনেক গরম পড়ে, তখন তোমার শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে তুমি ঘামাবে। প্রতিটা ঘামের কণা অনেকটুকু তাপমাত্রা কমিয়ে দিতে পারে তোমার শরীরের ভেতরের। তাই যতই গরম পড়ুক না কেন, তোমার শরীরের তাপমাত্রা ৯৮ ডিগ্রী ফারেনহাইটের এর কাছাকাছিই থাকে।

পানি মানে না গ্র্যাভিটি!

একটু আগেই আমি বলেছিলাম যে গাছ পানির সাথে অনেক কিছু শোষণ করে নেয়। মানে হচ্ছে পানি সে তার মূল থেকে উপরের দিকে কান্ডে বা পাতায় নিয়ে যায়। কিন্তু গ্র্যাভিটি তো পানিকে নিচের দিকে টানছে, এটা তাহলে কীভাবে সম্ভব? পানি কি তবে ক্যাপ্টেন এমেরিকার শিল্ডের মত?

পানির Adhesion এবং Cohesion নামে দুটি গুণ আছে। এডহেশন এর কারণে সে অন্য বস্তুর সাথে নিজেকে লাগিয়ে রাখতে পারে (ঐ ছোটলোক বড়লোক হাইড্রোজেন অক্সিজেন এর কারণেই), আর কোহেশন মূলত তার নিজের মধ্যে যে হাইড্রোজেন বন্ধন রয়েছে সেটার ফলাফল। শুধু গাছেই নয়, আমাদের শরীরে যে রক্ত চলাচল করে, সেটাও এর ফলাফল। Capillary Properties of Water!

শুধু এই দুটো টপিক নিয়ে একদম ডিটেইলস এ পরবর্তী কোনো এক সংখ্যায় কথা বলব ! আশা করি আজকে আইডিয়াটা দিতে পারছি !

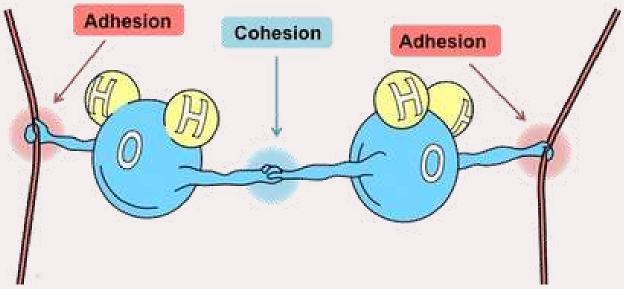

"এডহেশন এর কারণে সে অন্য বস্তুর সাথে নিজেকে লাগিয়ে রাখতে পারে আর কোহেশন মূলত তার নিজের মধ্যে যে হাইড্রোজেন বন্ধন রয়েছে সেটার ফলাফল।"

বরফ পানিতে ভাসে!

বরফ কঠিন পদার্থ, পানি তরল পদার্থ- এগুলো আশা করি আমাকে পড়াতে হবে নাহ। কঠিন পদার্থ মানেই আমরা জানি ঘনত্ব বেশি এবং তারা পানিতে ডুবে যায়। কোনো কিছু পানিতে ডুবে যায় কেন? ভেবে দেখেছ? যাদের ঘনত্ব বেশি তারা পানিতে ডুবে যায়। এবার যদি বলো ঘনত্ব কি জিনিস অংকন ভাইয়া? কোনো বস্তু কতটুকু ঘন, সেটার পরিমাপ হচ্ছে ঘনত্ব। যদি বলো ভাইয়া ঘন কি জিনিস?

না ভাই, আর প্রশ্ন নাহ। থামো।

এখন বরফ পানিতে ভাসে মানে হচ্ছে বরফ পানির থেকে কম ঘন ! এটা কেন হয়? উম্ম সেখানেও ঐ হাইড্রোজেন অক্সিজেন এর ছোটোলোকত্ব বড়লোকত্ব এর প্রভাব আছে। মনে করে দিও, ঠিক পরের সংখ্যায় লম্বাআআ করে বুঝানো যাবে। আপাতত দেখো যে এই জিনিস হওয়ার কারণে কি হয়। মনে করো একটা নদী।এবং হঠাৎ করে আশে পাশে অনেক ঠান্ডা পড়তে লাগলো। ঠান্ডায় পানির উপরে বরফ হয়ে গেলো। বরফ যদি বেশি ঘন হয় তাহলে কি হবে? উম্ম... বরফ ডুবে যাবে পানিতে। মানে পানির নিচে দিক থেকে ভরতে ভরতে পুরো পুকুর দ্রুতই বরফ হয়ে যাবে! সেখানে কেউ বাঁচতে পারবে নাহ!

কিন্তু বরফ ঘন কম হলে? শুধু পানির উপরের দিকই বরফ হবে। নিচে অনেক জীব ঠাকুম্মার ঝুলির শেষ লাইনের মত সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে।

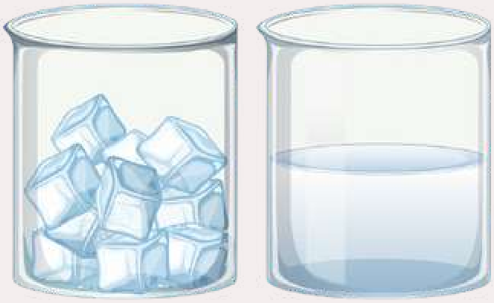

আরো আছে!

সব বলা শেষ হয় নি এখনো। কিন্তু তুমি যে হাঁপিয়ে উঠেছ অনেক আগেই, সেটা আমি দূর থেকে বসে দেখে ফেলেছি। তাই আজকে আর বক বক করব নাহ। তোমাদের জানতে আগ্রহ থাকলে জানিও। পার্ট টু নিয়ে ফেরত আসা যাবে! হাইড্রোজেন অক্সিজেন এর অসম প্রেম হতে জীবনের অগ্রগতির গল্প আজকে এখানেই শেষ হোক।

- অংকন দে অনিমেষ,
সম্পাদক, হোয়াইট অরিজিন্স ম্যাগাজিন
সাধারণ সম্পাদক, হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব

WHITE BOARD SCIENCE CLUB
MEMBER RECRUITMENT
IS GOING ON
WITH A TON OF
INTERNSHIP
RESEARCH OPPORTUNITIES
SKILL WORKSHOPS
MENTORSHIP
LEADERSHIP OPPORTUNITIES
ACADEMIC WORKSHOPS

WHITE BOARD SCIENCE CLUB

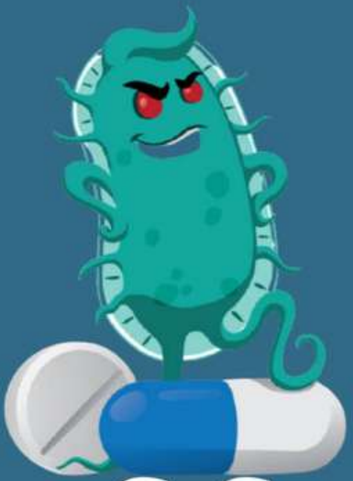

আপনি কি জানেন?

অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক খাওয়া শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকর!

এন্টিবায়োটিক মানে এন্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগ। এটি একধরনের ওষুধ যা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে আমাদের বাঁচাতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক শরীরের জন্য অনেকটা ক্ষতিকর। এর অতিরিক্ত ব্যবহার শরীরের প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়াগুলো ধ্বংস করে ফেলে। যার কারণে হাঁপানি রোগের সংক্রমণ দেখা দেয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এর অতিরিক্ত ব্যবহারে শরীরের ওজন বেড়ে যায়, অ্যালর্জির সমস্যা হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। ফুসকুড়ি, চুলকানি, জিহবা, ঠোঁট ফুলে যায়। অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক অন্ত্রের অনেক উপকারী ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে। এর ফলে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্ষমতা কমে যায়। এর কারণে টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

মাসিক তারাম্যাপ

রাতের আকাশ!

মহাবিশ্বের মধুর সৌন্দর্য উপভোগ করার মোক্ষম একটি স্থান হচ্ছে এই রাতের আকাশ। রাতের আকাশে প্রতিদিন লুকোচুরি খেলে হাজারো তারা। বহুদূর থেকে ছোট্ট একটু আলো এসে উঁকি দেয় আমাদের চোখের সামনে কিন্তু এই অগোছালো রাতের আকাশ কে ভালভাবে বোঝার কী কোন উপায় আছে? হ্যাঁ,আছে। রাতের আকাশের বিভিন্ন ধরনের নক্ষত্রমণ্ডলি এবং মহাজাগতিক বস্তু যেমন গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু নেবুলা, গ্যালাক্সি নিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষকরা একটি গোলাকৃতি ছক তৈরি করে যা তারাম্যাপ বা ছকতারা (Starmap) নামে পরিচিত। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ এই ছকটি পূর্ণতা লাভ করে। শত শত বছর ধরে আঁধার রাতে মানুষকে পথ চিনতে সাহায্য করা এই তারা গুলো কিভাবে চিনতে হয় আজ আমরা শিখব।

১. দিক নির্ণয়ঃ

তারা ম্যাপ ভালোভাবে বুঝতে কিংবা নক্ষত্রদের শনাক্ত করার জন্য প্রথমেই তারাম্যাপের দিক নির্দিষ্ট করে চিনতে হবে। উত্তর(North), দক্ষিণ(South), পূর্ব (East),পশ্চিম (West)
ভালোভাবে চিনতে হবে। তারা ম্যাপ সাধারণত গোলাকৃতি হয়। যদি তারা ম্যাপের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক যোগ করি তাহলে আমরা একটি সরলরেখা পাবো যাকে Meridian বা মধ্যরেখা বলে।এই রেখা রাতের আকাশকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে। Meridian বা মধ্যরেখার মধ্যবিন্দুকে Zenith বিন্দু বলে। এছাড়াও গ্রহ গুলো যে কাল্পনিক রেখায় সূর্যকে ঘিরে আবর্তন করে তার নাম Elliptical Line। এ রেখাটি গ্রীষ্মকালে তারাম্যাপের নিচে দেখা যায় এবং শীতকালে তারা ম্যাপের উপরে। এছাড়াও Celestial Sphere, Celestial Pole নিয়েও জানা থাকলে ভালো হয়।

২.উজ্জ্বলতাঃ

আকাশে তারাদের শনাক্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো তারাদের উজ্জ্বলতা।বেশ উজ্জ্বল তারাগুলো বেশি আলো ছড়ায় বলে এদেরকে খালি চোখে ভালোভাবেই শনাক্ত করা যায়। কম উজ্জ্বল তারাগুলো কম আলো ছড়ায় বলে তাদের খালি চোখে ভালোভাবে চেনা যায় না।তাই এদেরকে দেখার জন্য দূরবীন কিংবা বাইনোকুলার এর প্রয়োজন হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা রাতের আকাশে তারাদের উজ্জ্বলতা অনুযায়ী তারাদের কে ৬ টি শ্রেনীতে ভাগ করে। সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটির উজ্জ্বলতা মাত্রা বা Luminosity ১ ধরা হয়,এর চেয়ে কম উজ্জ্বল তারার উজ্জ্বলতা ২ এভাবে সর্বনিম্ন কম উজ্জ্বল তারাটির উজ্জ্বলতার মাত্রা বা Luminosity ৬ ধরা হয়। Vega তারাটির উজ্জ্বলতা শূন্য ধরা হয়।

সোর্সঃ টাইম এন্ড ডেট.কম

৩. দূরত্ব পরিমাপঃ

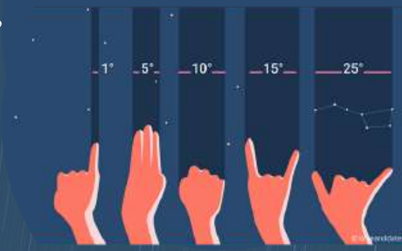

রাতের আকাশের বিভিন্ন ধরনের তারা এবং গ্রহগুলো একটির থেকে অপরটির দূরত্ব মাপার জন্য ডিগ্রি এবং রেডিয়ান ব্যবহার করা হয় যা কিছুটা জটিল ও বটে। কিন্তু সহজ উপায়ে আকাশের নক্ষত্রগুলো দূরত্ব বের করতে হাতের আঙ্গুলগুলো খুব ভালো কাজে দিতে পারে। যদি তুমি তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি খোলা রেখে বাকি আঙ্গুলগুলি বন্ধ করে রাখ, তাহলে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুলটির দূরত্ব আকাশের ২৫ ডিগ্রির সমান নিচের চিত্রটি হতে বাকি কোণগুলো মাপার উপায় দেখে নাও।

এছাড়াও নক্ষত্রমন্ডলী সম্পর্কে ও ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম,নক্ষত্রমণ্ডলীতে তারার অবস্থান, আকার ও আকৃতি সর্ম্পকে জানা থাকলে তারাম্যাপ বুঝতে সুবিধা হয়।

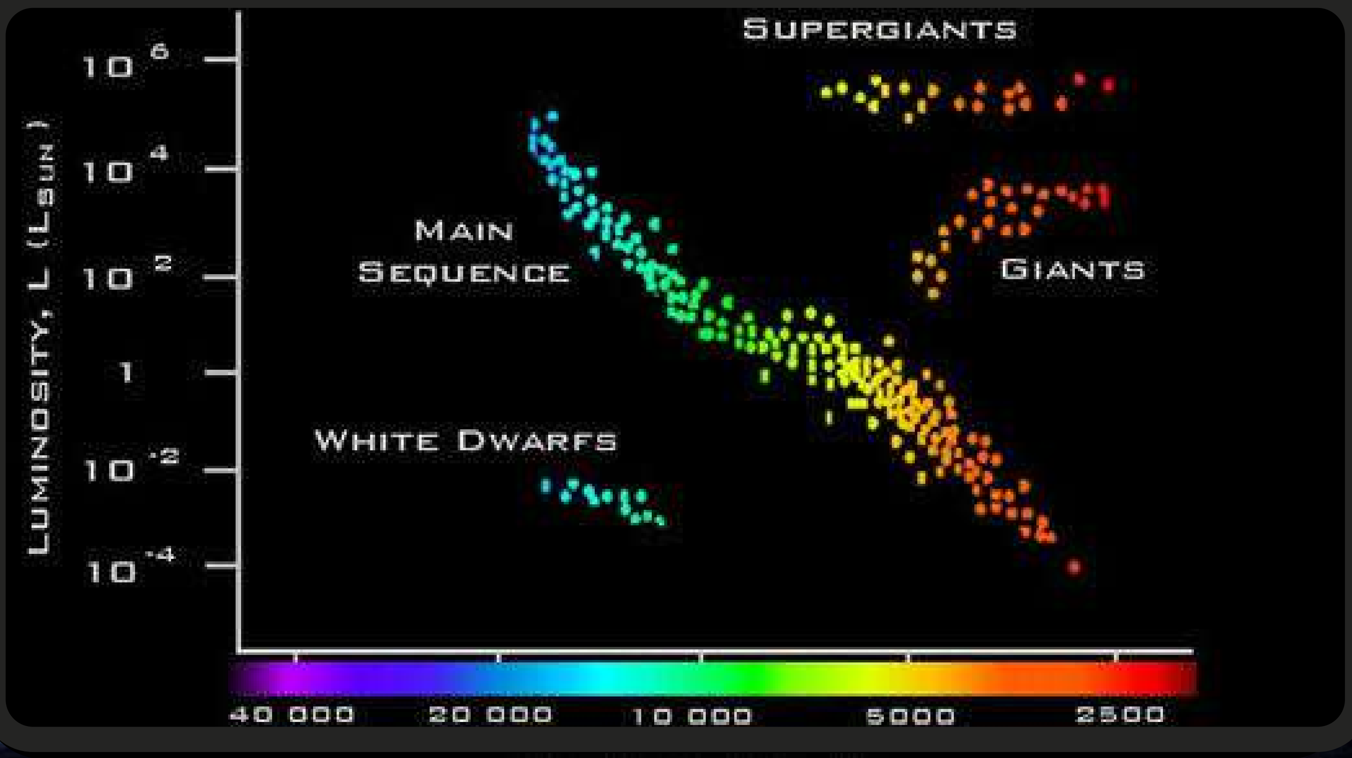

হার্টৎজপ্রাঙ-রাসেল ডায়াগ্রাম

আগস্টে আকাশ যেমন

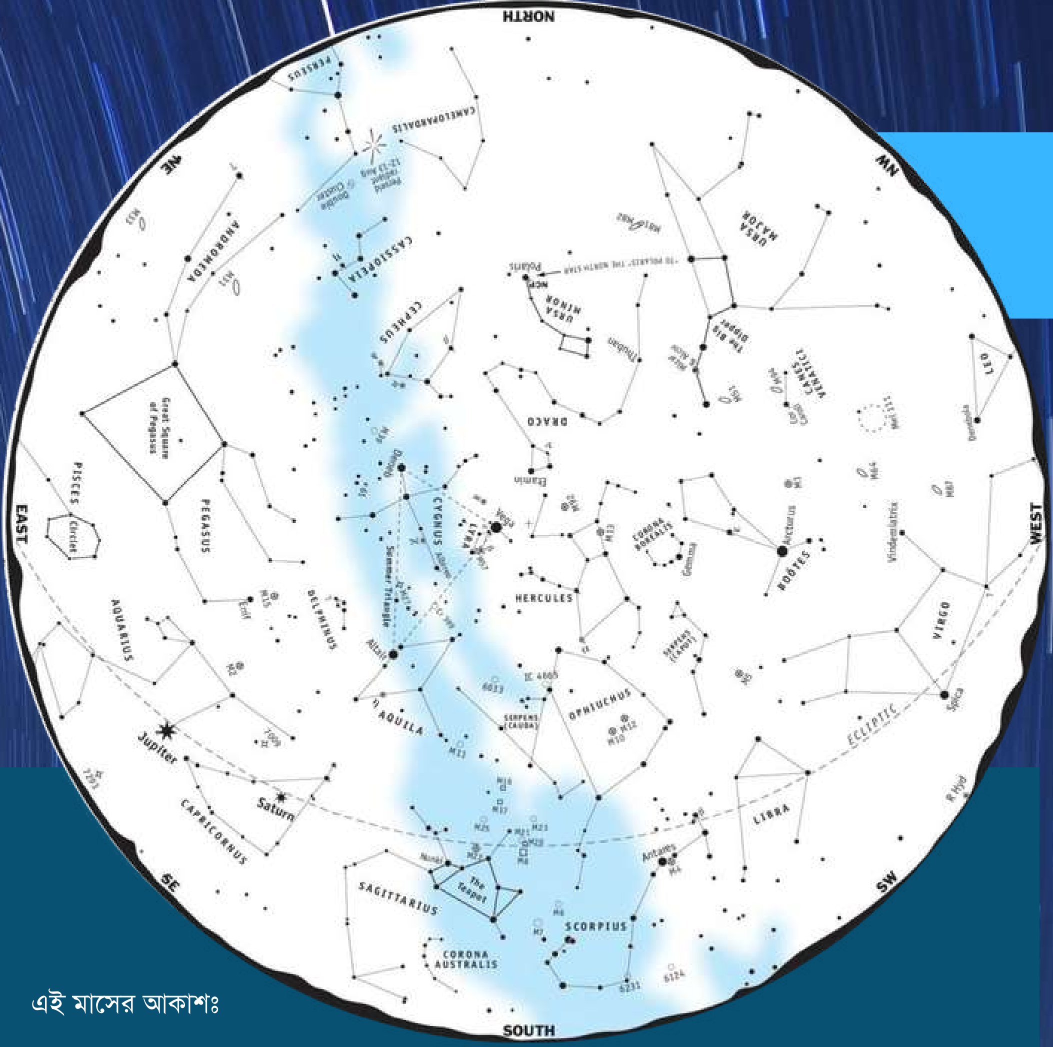
NORTH
NE
NW
EAST
WEST
SE
SW
SOUTH
PERSEUS
CAMELOPARDALIS
Perseids
Double Cluster
CASSIOPEIA
ANDROMEDA
M31
M33
CEPHEUS
URSA MINOR
Polaris
TO POLARIS: THE NORTH STAR
URSA MAJOR
The Big Dipper
M81
M82
DRACO
Thuban
CANES VENATICI
M51
M101
LEO
Denebola
Mel 111
Great Square of Pegasus
PEGASUS
PISCES
Circlet
CYGNUS
Deneb
Albireo
LYRA
Vega
Summer Triangle
Eltanin
HERCULES
M13
M92
CORONA BOREALIS
Gemma
BOÖTES
Arcturus
Vindemiatrix
M64
M87
VIRGO
Spica
DELPHINUS
Enif
M15
AQUARIUS
M2
AQUILA
Altair
IC 4665
6633
SERPENS (CAPUT)
SERPENS (CAUDA)
OPHIUCHUS
M10
M12
M5
M11
M16
M17
ECLIPTIC
LIBRA
R Hyd
Jupiter
Saturn
7009
7293
CAPRICORNUS
SAGITTARIUS
The Teapot
Nunki
M8
M20
M22
M25
Antares
M4
SCORPIUS
M6
M7
6231
6124
CORONA AUSTRALIS

Symbols

Galaxy	⬯
Double Star	●
Variable Star	◉
Diffuse Nebula	□
Planetary Nebula	✧
Open Star Cluster	◌
Globular Star Cluster	⊕

Star Magnitudes	●	●	•	•	·	·
	-1	0	1	2	3	4

এই মাসের আকাশঃ

এবার মাসের শুরুর দিকেই শনিগ্রহ আমাদের বেশ কাছে থাকবে যাতে করে আকাশের দক্ষিণ-পূর্বে ছোট-খাটো টেলিস্কোপ তাক করলেও তার বলয়গুলো দেখতে পাওয়া যাবে। এছাড়া হারকিউলিস, পেগাসাস ও স্করপিয়ওর মতো পরিচিত তারামণ্ডলীগুলোর দেখা পাওয়া যাবে মেঘমুক্ত আকাশে। নতুন চাঁদকে শুক্রের খুব কাছে দেখা যাবে ১০ তারিখ, আবার মাসের ১২, ১৩ ও ১৪ তারিখে দেখা পাওয়া যাবে পারসেয়ড ধূমকেতু ঝর্ণার। মাঝরাতের পরিষ্কার আকাশে খালি চোখে ঘণ্টায় ৬০-১০০টি ধূমকেতু দেখা সম্ভব! মাসের ঠিক মাঝে দেখা মিলবে অর্ধ-চাঁদের। এই মাসে বৃহস্পতিকে দেখার সবচেয়ে উপযুক্ত দিন ২০ তারিখ, যখন সৌরজগতের সবচেয়ে বড় এই গ্রহটি ক্যাপরিকরনাস বা মকর তারামণ্ডলীর দক্ষিণ পাশের নক্ষত্রদের বিপরীতে অবস্থান করবে। পৃথিবী বৃহস্পতি ও সূর্যের ঠিক মাঝে থাকাই গ্যাসদানবটি সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত দৃশ্যমান থাকবে। ২২ তারিখের পূর্ণিমার আগে বৃহস্পতি ও শনি উভয়-ই উজ্জ্বল চাঁদের খুব কাছে অবস্থান করবে। এছাড়া বৃহস্পতির উপর গ্যানিমেড ও ইউরোপার ছায়া দেখা যাবে ২৩ তারিখের মধ্যরাতে। মাসের শেষদিকে চাঁদের উজ্জ্বল আলোর প্রকোপ কেটে যাওয়ার পর গভীর আকাশে দেখা মিলবে স্যাজিয়াসটারের টি-পট খ্যাত অংশের। ভিরগো, লিবরা, লিরা ইত্যাদি তারামণ্ডলী আকাশে থাকা সারা আগস্ট জুড়ে।

আকাশ দেখার জন্য সাধারণত টেলিস্কোপ বা বাইনোকুলার ব্যবহার করা উত্তম। এছাড়া দূষণমুক্ত গ্রামীণ এলাকায় মধ্যরাতের দিকেই আকাশে দেখা যাবে সবচেয়ে ভালোভাবে।

হারকিউলিস

ক্যাপরিকর্ন

স্যাজিয়াস্টার

স্করপিয়ও

ভিরগো

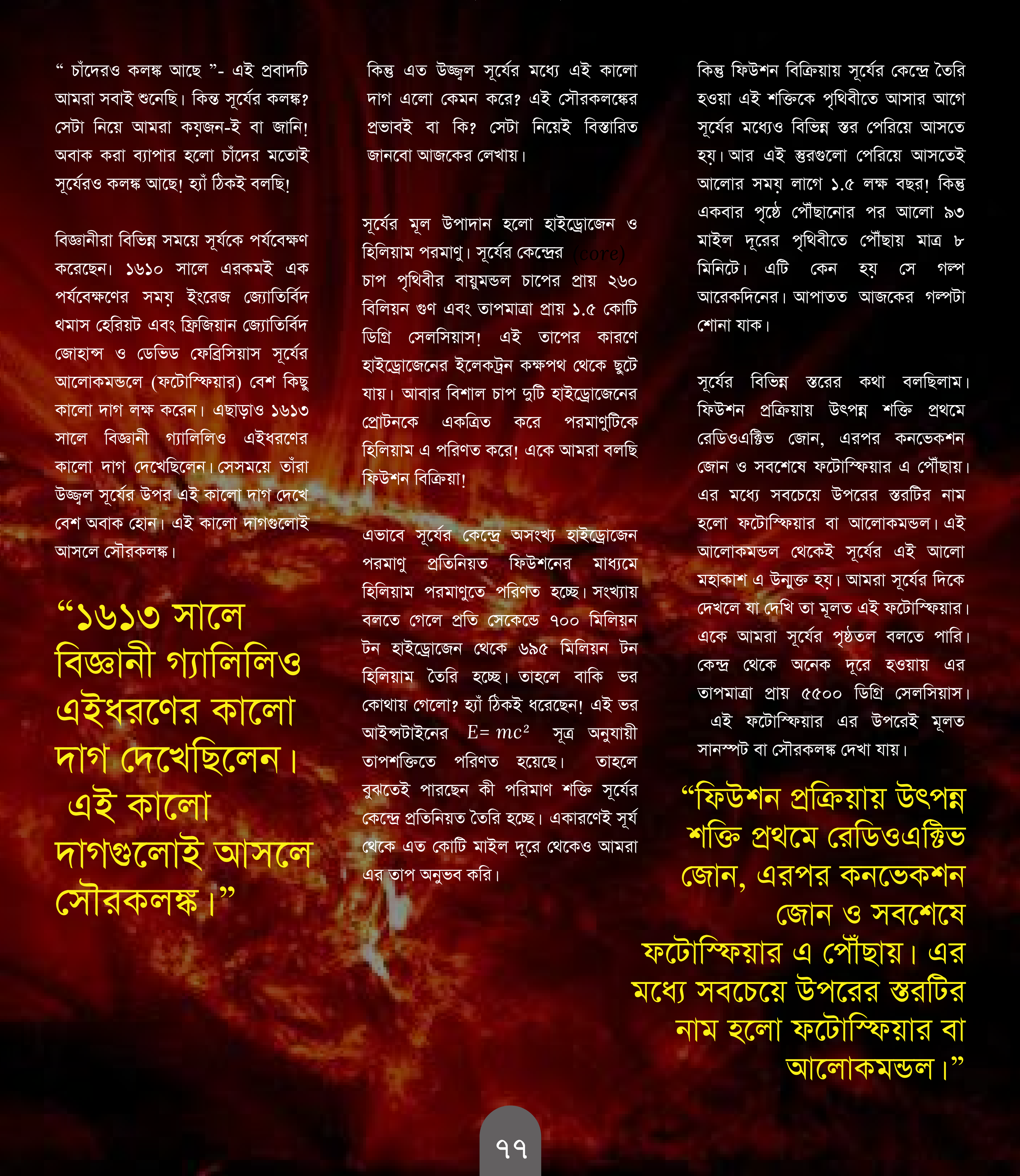

উজ্জ্বল সূর্যের অন্ধকার দাগ

“সৌরকলঙ্ক”

“ চাঁদেরও কলঙ্ক আছে ”- এই প্রবাদটি আমরা সবাই শুনেছি। কিন্ত সূর্যের কলঙ্ক? সেটা নিয়ে আমরা কয়জন-ই বা জানি! অবাক করা ব্যাপার হলো চাঁদের মতোই সূর্যেরও কলঙ্ক আছে! হ্যাঁ ঠিকই বলছি!

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ১৬১০ সালে এরকমই এক পর্যবেক্ষণের সময় ইংরেজ জ্যোতির্বিদ থমাস হেরিয়ট এবং ফ্রিজিয়ান জ্যোতির্বিদ জোহান্স ও ডেভিড ফেব্রিসিয়াস সূর্যের আলোকমন্ডলে (ফটোস্ফিয়ার) বেশ কিছু কালো দাগ লক্ষ করেন। এছাড়াও ১৬১৩ সালে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এইধরণের কালো দাগ দেখেছিলেন। সেসময়ে তাঁরা উজ্জ্বল সূর্যের উপর এই কালো দাগ দেখে বেশ অবাক হোন। এই কালো দাগগুলোই আসলে সৌরকলঙ্ক।

“১৬১৩ সালে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এইধরণের কালো দাগ দেখেছিলেন। এই কালো দাগগুলোই আসলে সৌরকলঙ্ক।”

কিন্তু এত উজ্জ্বল সূর্যের মধ্যে এই কালো দাগ এলো কেমন করে? এই সৌরকলঙ্কের প্রভাবই বা কি? সেটা নিয়েই বিস্তারিত জানবো আজকের লেখায়।

সূর্যের মূল উপাদান হলো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু। সূর্যের কেন্দ্রের (core) চাপ পৃথিবীর বায়ুমন্ডল চাপের প্রায় ২৬০ বিলিয়ন গুণ এবং তাপমাত্রা প্রায় ১.৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস! এই তাপের কারণে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন কক্ষপথ থেকে ছুটে যায়। আবার বিশাল চাপ দুটি হাইড্রোজেনের প্রোটনকে একত্রিত করে পরমাণুটিকে হিলিয়াম এ পরিণত করে! একে আমরা বলছি ফিউশন বিক্রিয়া!

এভাবে সূর্যের কেন্দ্রে অসংখ্য হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিনিয়ত ফিউশনের মাধ্যমে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হচ্ছে। সংখ্যায় বলতে গেলে প্রতি সেকেন্ডে ৭০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন থেকে ৬৯৫ মিলিয়ন টন হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে। তাহলে বাকি ভর কোথায় গেলো? হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন! এই ভর আইন্সটাইনের $E= mc^2$ সূত্র অনুযায়ী তাপশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাহলে বুঝতেই পারছেন কী পরিমাণ শক্তি সূর্যের কেন্দ্রে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে। একারণেই সূর্য থেকে এত কোটি মাইল দূরে থেকেও আমরা এর তাপ অনুভব করি।

কিন্তু ফিউশন বিক্রিয়ায় সূর্যের কেন্দ্রে তৈরি হওয়া এই শক্তিকে পৃথিবীতে আসার আগে সূর্যের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। আর এই স্তরগুলো পেরিয়ে আসতেই আলোর সময় লাগে ১.৫ লক্ষ বছর! কিন্তু একবার পৃষ্ঠে পৌঁছানোর পর আলো ৯৩ মাইল দূরের পৃথিবীতে পৌঁছায় মাত্র ৮ মিনিটে। এটি কেন হয় সে গল্প আরেকদিনের। আপাতত আজকের গল্পটা শোনা যাক।

সূর্যের বিভিন্ন স্তরের কথা বলছিলাম। ফিউশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি প্রথমে রেডিওএক্টিভ জোন, এরপর কনভেকশন জোন ও সবশেষে ফটোস্ফিয়ার এ পৌঁছায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উপরের স্তরটির নাম হলো ফটোস্ফিয়ার বা আলোকমন্ডল। এই আলোকমন্ডল থেকেই সূর্যের এই আলো মহাকাশ এ উন্মুক্ত হয়। আমরা সূর্যের দিকে দেখলে যা দেখি তা মূলত এই ফটোস্ফিয়ার। একে আমরা সূর্যের পৃষ্ঠতল বলতে পারি। কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে হওয়ায় এর তাপমাত্রা প্রায় ৫৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই ফটোস্ফিয়ার এর উপরেই মূলত সানস্পট বা সৌরকলঙ্ক দেখা যায়।

“ফিউশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি প্রথমে রেডিওএক্টিভ জোন, এরপর কনভেকশন জোন ও সবশেষে ফটোস্ফিয়ার এ পৌঁছায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উপরের স্তরটির নাম হলো ফটোস্ফিয়ার বা আলোকমন্ডল।”

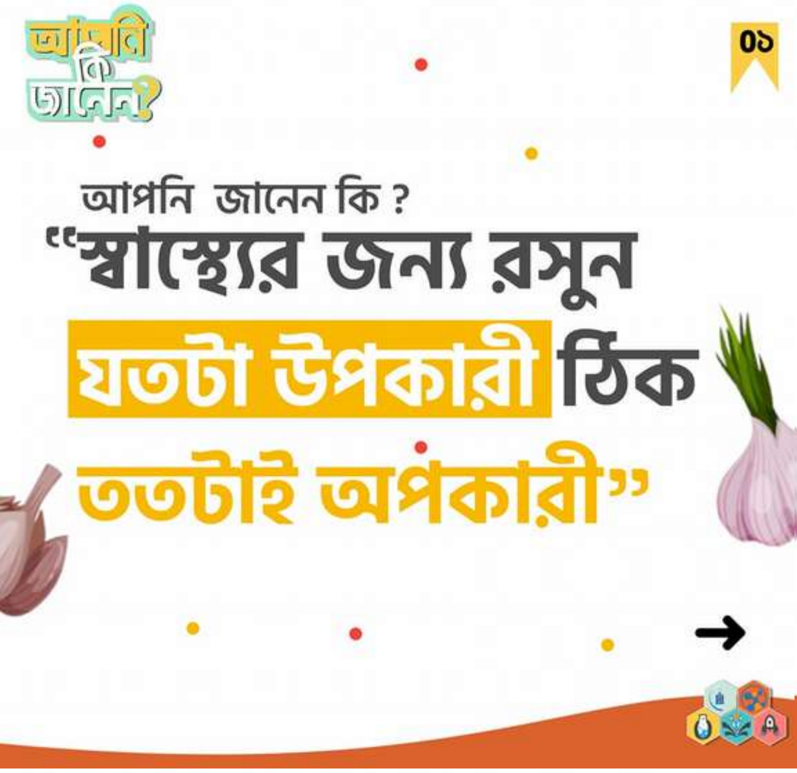

০১

আপনি জানেন কি ?

“স্বাস্থ্যের জন্য রসুন যতটা উপকারী ঠিক ততটাই অপকারী”

→

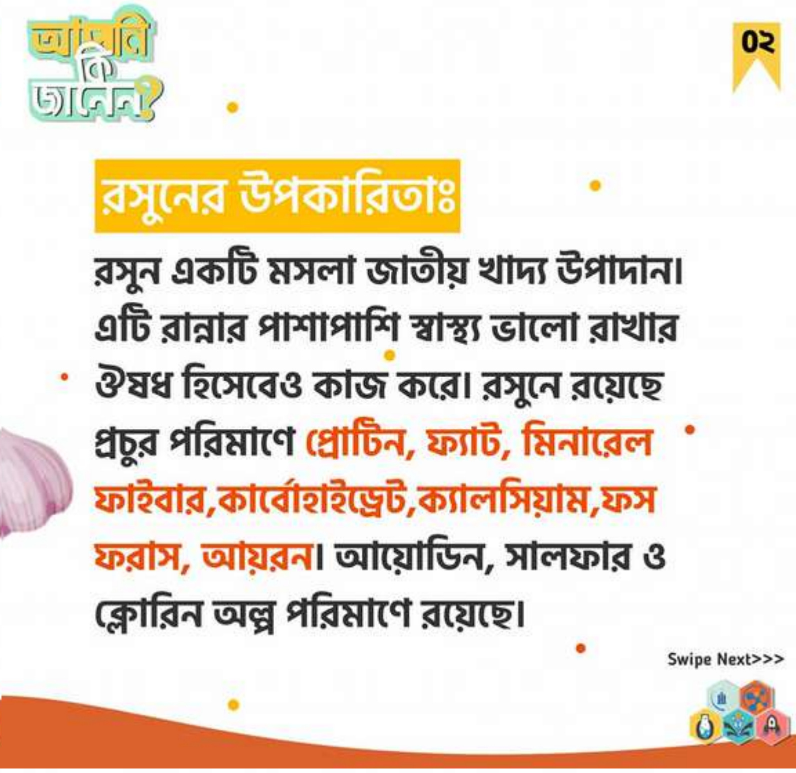

০২

রসুনের উপকারিতাঃ

রসুন একটি মসলা জাতীয় খাদ্য উপাদান। এটি রান্নার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ভালো রাখার ঔষধ হিসেবেও কাজ করে। রসুনে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফ্যাট, মিনারেল ফাইবার,কার্বোহাইড্রেট,ক্যালসিয়াম,ফসফরাস, আয়রন। আয়োডিন, সালফার ও ক্লোরিন অল্প পরিমাণে রয়েছে।

Swipe Next>>>

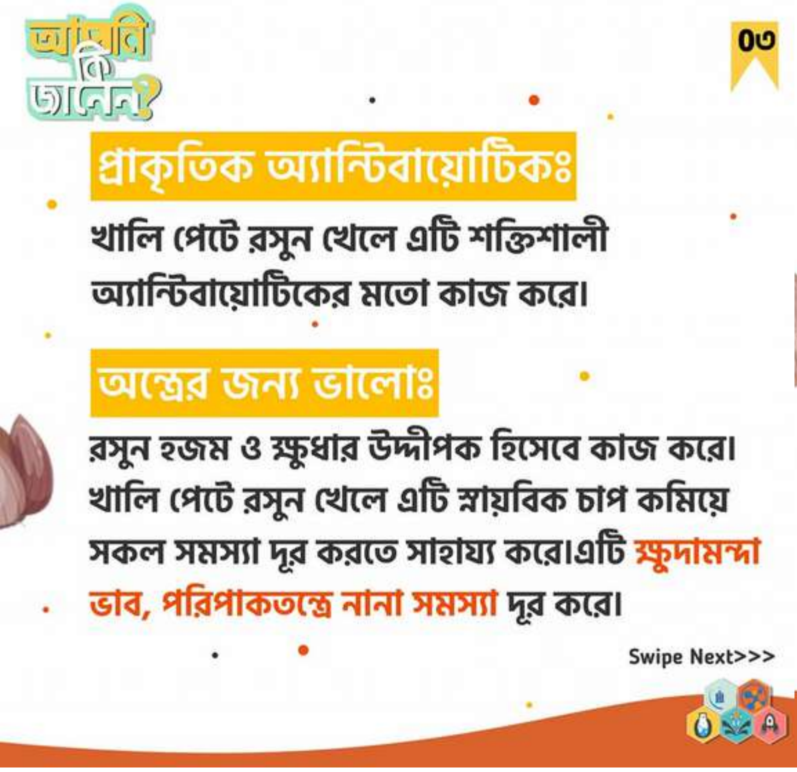

০৩

প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিকঃ

খালি পেটে রসুন খেলে এটি শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে।

অন্ত্রের জন্য ভালোঃ

রসুন হজম ও ক্ষুধার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। খালি পেটে রসুন খেলে এটি স্নায়বিক চাপ কমিয়ে সকল সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।এটি ক্ষুদামন্দা ভাব, পরিপাকতন্ত্রে নানা সমস্যা দূর করে।

Swipe Next>>>

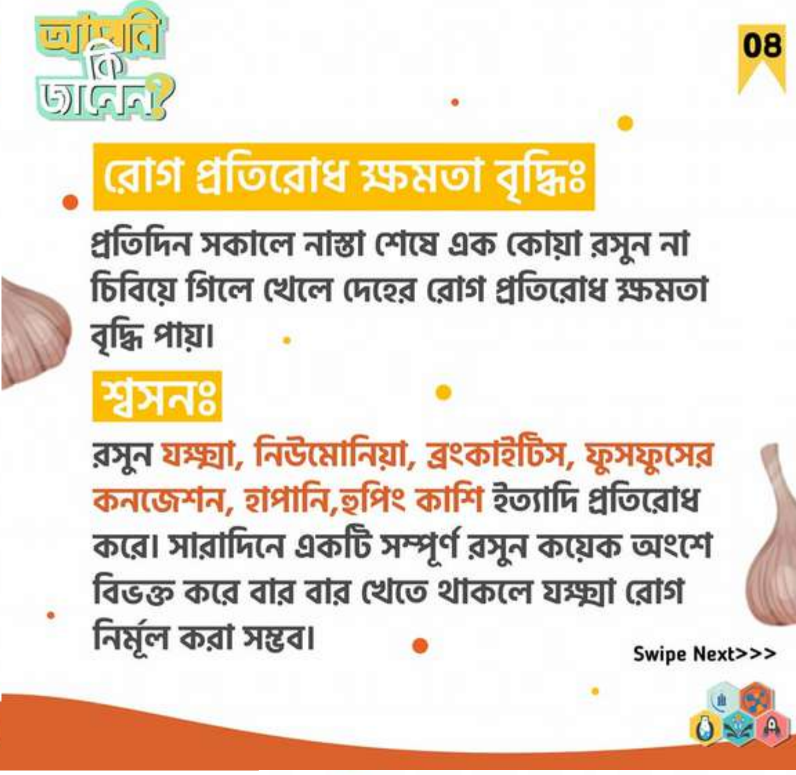

০৪

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

প্রতিদিন সকালে নাস্তা শেষে এক কোয়া রসুন না চিবিয়ে গিলে খেলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শ্বসনঃ

রসুন যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের কনজেশন, হাপানি,হুপিং কাশি ইত্যাদি প্রতিরোধ করে। সারাদিনে একটি সম্পূর্ণ রসুন কয়েক অংশে বিভক্ত করে বার বার খেতে থাকলে যক্ষ্মা রোগ নির্মূল করা সম্ভব।

Swipe Next>>>

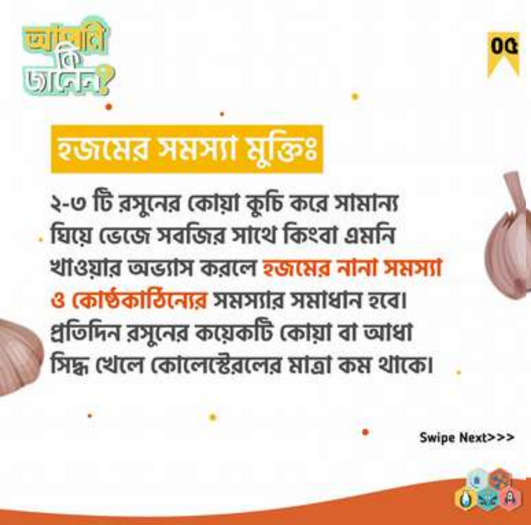

০৫

হজমের সমস্যা মুক্তিঃ

২-৩ টি রসুনের কোয়া কুচি করে সামান্য ঘিয়ে ভেজে সবজির সাথে কিংবা এমনি খাওয়ার অভ্যাস করলে হজমের নানা সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যার সমাধান হবে। প্রতিদিন রসুনের কয়েকটি কোয়া বা আধা সিদ্ধ খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা কম থাকে।

Swipe Next>>>

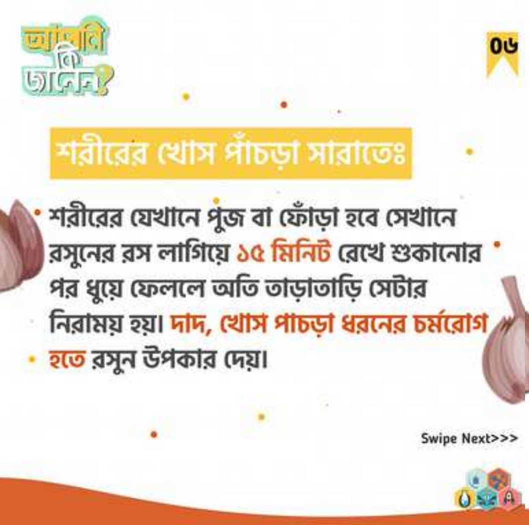

০৬

শরীরের খোস পাঁচড়া সারাতেঃ

শরীরের যেখানে পুঁজ বা ফোঁড়া হবে সেখানে রসুনের রস লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে শুকানোর পর ধুয়ে ফেললে অতি তাড়াতাড়ি সেটার নিরাময় হয়। দাদ, খোস পাচড়া ধরনের চর্মরোগ হতে রসুন উপকার দেয়।

Swipe Next>>>

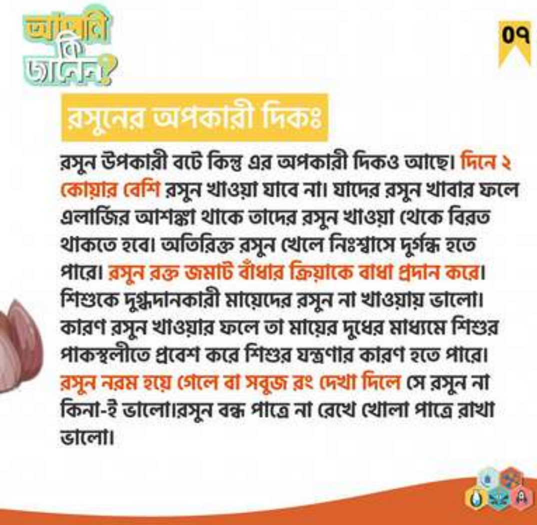

০৭

রসুনের অপকারী দিকঃ

রসুন উপকারী বটে কিন্তু এর অপকারী দিকও আছে। দিনে ২ কোয়ার বেশি রসুন খাওয়া যাবে না। যাদের রসুন খাবার ফলে এলার্জির আশঙ্কা থাকে তাদের রসুন খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। অতিরিক্ত রসুন খেলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হতে পারে। রসুন রক্ত জমাট বাঁধার ক্রিয়াকে বাধা প্রদান করে। শিশুকে দুগ্ধদানকারী মায়েদের রসুন না খাওয়ায় ভালো। কারণ রসুন খাওয়ার ফলে তা মায়ের দুধের মাধ্যমে শিশুর পাকস্থলীতে প্রবেশ করে শিশুর যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। রসুন নরম হয়ে গেলে বা সবুজ রং দেখা দিলে সে রসুন না কিনা-ই ভালো।রসুন বন্ধ পাত্রে না রেখে খোলা পাত্রে রাখা ভালো।

তবে এই ফটোস্ফিয়ার এ সানস্পট দেখা গেলেও এর উপর কনভেকশন জোনে ঘটা ঘটনাগুলোর প্রভাব রয়েছে।

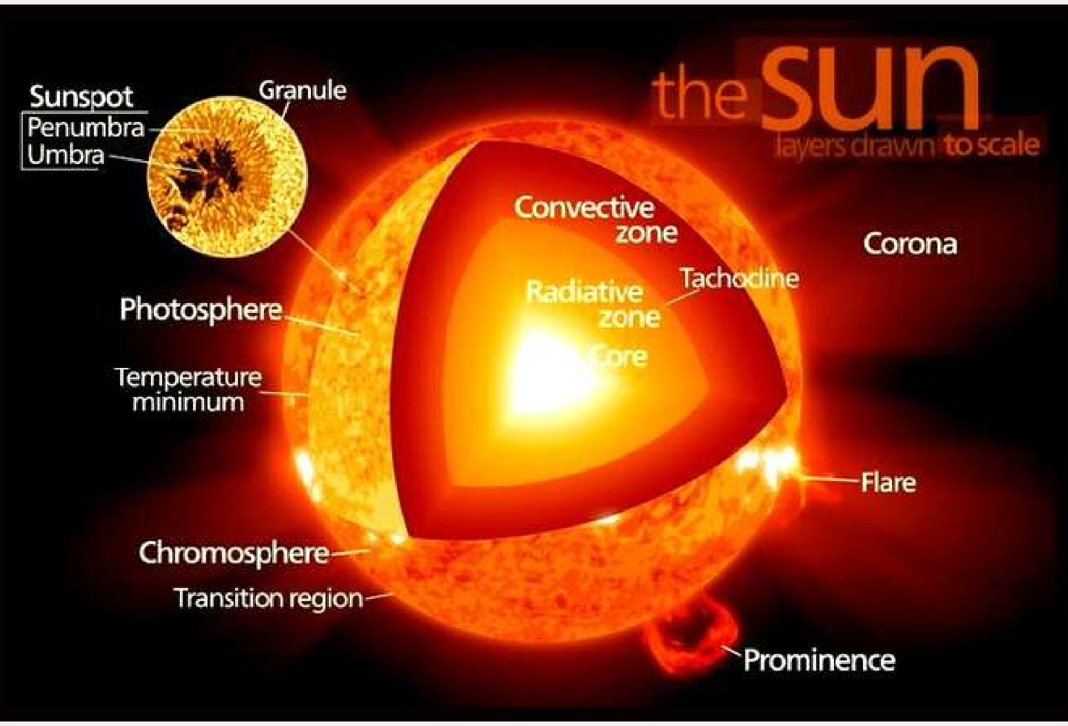
the sun
layers drawn to scale
Sunspot
Penumbra
Umbra
Granule
Convective zone
Corona
Radiative zone
Tachocline
Core
Photosphere
Temperature minimum
Flare
Chromosphere
Transition region
Prominence

সূর্যের ফিউশন বিক্রিয়া ও বিভিন্ন স্তর

মূলত সূর্যের কেন্দ্রে উৎপন্ন শক্তি দিয়ে কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো উত্তপ্ত করা সম্ভব হলেও তারা ফিউশন বিক্রিয়া করার জন্য যথেষ্ট শক্তি পায় না।তাই এই শক্তির স্থানান্তর হওয়া প্রয়োজন।এক পর্যায়ে এই শক্তি পরিচলন (Convection) প্রক্রিয়ায় স্থানান্তর হয়।ঠিক যেমন চুলার উপর ডেকচিতে করে পানি ফুটানোর সময় নিচের পানিগুলো গরম হয়ে উপরে উঠে আসে আবার ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে নিচে নেমে যায় তেমনি অনেক বড় উত্তপ্ত গ্যাসের কলাম উপরের দিকে উঠে আসে এবং ঠান্ডা হয়ে পুনরায় কেন্দ্রের দিকে চলে যায়। এভাবে প্রতিনিয়ত উত্তপ্ত গ্যাস উপরে উঠে আসে এবং পরবর্তীতে ঠান্ডা হয়ে আবার কেন্দ্রের দিকে চলে যায়।

কিন্তু আমরা যে হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম গ্যাসের কথা বলছি তার কোনোটাই এই বিশাল পরিমাণ তাপের কারণে আলাদা পরমাণু হিসেবে থাকতে পারে না। এদের ইলেকট্রনগুলো কক্ষপথ থেকে ছুটে যায় আর পরমাণুটি আয়নে পরিণত হয়। ইলেকট্রন ও ক্যাটায়ন মিশ্রিত এই অবস্থাকে বলা হয় প্লাজমা। সূর্যের গতি ও পরিচলন প্রক্রিয়ার কারণে এসকল ইলেক্ট্রন ও আয়ন সবসময় সূর্যের মধ্যে গতিশীল থাকে। আবার আমরা জানি গতিশীল চার্জ সবসময় এর চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। ফলে অসংখ্য ইলেক্ট্রন ও আয়ন এর গতির ফলে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অসংখ্য চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। আবার সূর্যের ঘূর্ণন গতির ভিন্নতার কারণে এই সূর্যের প্লাজমা বিষুবীয় অঞ্চলে যে গতিতে ঘুরে দুই মেরুতে তার চেয়ে ধীরে ঘুরে। ফলে এদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চৌম্বক ক্ষেত্রের ভিন্নতা দেখা যায়।

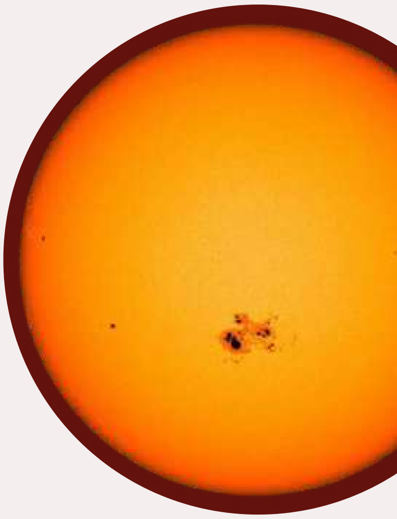

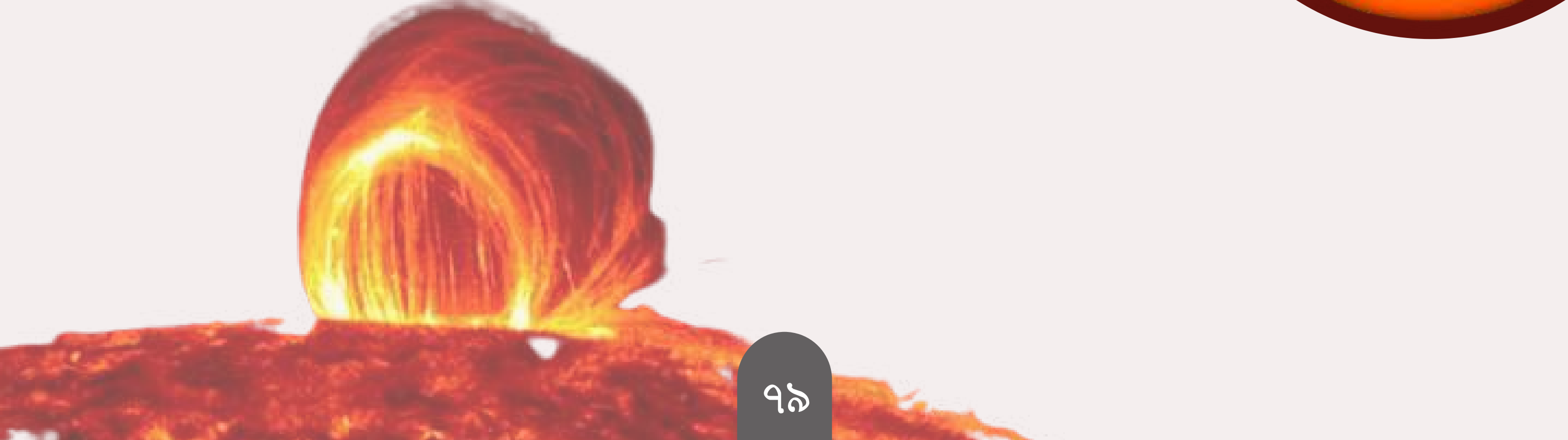

এই ভিন্নতার ফলে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো অনেক অগোছালো হয়। তারা একটি আরেকটির উপর গমন করতে পারে বা প্যাঁচ সৃষ্টি করতে পারে।

কখনো কখনো অনেকগুলো চৌম্বক ক্ষেত্র নিজেদের মধ্যে এমনভাবে পেঁচিয়ে যায় যে এদের ভেদ করে তুলনামূলক শীতল প্লাজমা পুনরায় কেন্দ্রের দিকে যেতে পারে না। তাপমাত্রা কম বলে এই প্লাজমাকে অনুজ্জ্বল দেখায়। অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনুজ্জ্বল এসব অঞ্চলই আমরা কালো দাগ হিসেবে দেখতে পায়। এগুলোই হলো সৌরকলঙ্ক বা সানস্পট। সৌরকলঙ্ক নিজে কিন্তু কখনোই কালো নয়। রাতের আকাশে যদি আমরা এক এক টুকরো সৌরকলঙ্ককে এনে রাখতে পারি তবে তা চাঁদের চেয়েও বেশি আলোকিত দেখাবে।

কিন্তু সূর্যের অন্যান্য অংশের উজ্জ্বলতার কারণেই এটিকে কালো মনে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই সৌরকলঙ্ক বা সানস্পটের ম্যাগনেটিক ফিল্ড অনেক বেশি শক্তিশালী হয়।

সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটি চক্রের মধ্যে দিয়ে যায়। প্রতি ১১ বছর পর পর সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ড পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, উত্তর মেরু দক্ষিণে আর দক্ষিণ মেরু উত্তরে চলে আসে। এ ঘটনাকে বলা হয় সোলার সাইকেল বা সৌর চক্র। সৌরচক্রের উপর সানস্পটের সংখ্যা নির্ভর করে। সৌর চক্রের সূচনা হয় "সোলার মিনিমাম" এ। এ সময় সানস্পট ও সোলার ফ্লেয়ার এর সংখ্যা কম থাকে। ধীরে ধীরে সানস্পট ও সোলার ফ্লেয়ার বাড়তে থাকে, এক পর্যায়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়, যাকে বলা হয় "সোলার ম্যাক্সিমাম"।

একটি চক্র শেষ হয়ে গেলে এটি " সোলার মিনিমাম" অবস্থায় ফিরে আসে। (সোলার ফ্লেয়ার কি? এটা নিয়ে সামনে গেলে বুঝতে পারবেন আশা করি)

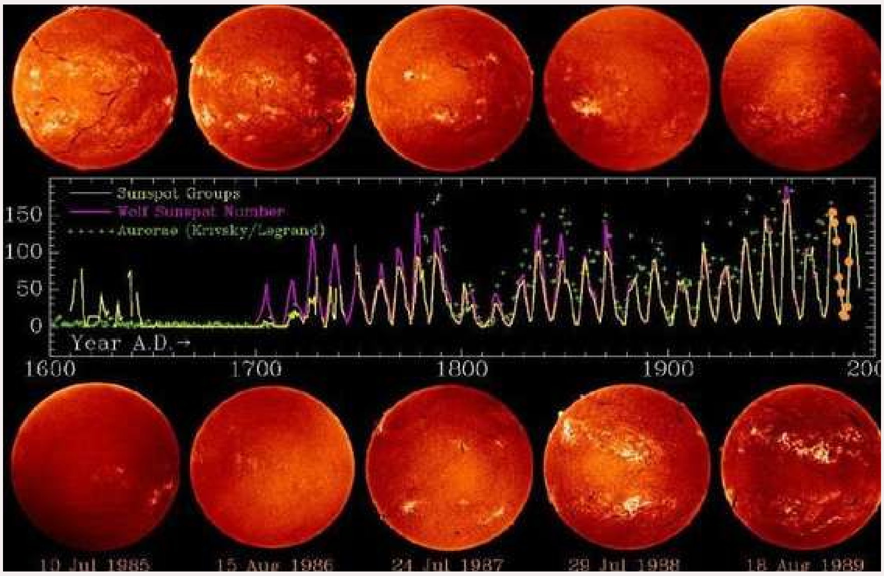

> “সৌর চক্রের সূচনা হয় সোলার মিনিমাম এ সময় সানস্পট ও সোলার ফ্লেয়ার এর সংখ্যা কম থাকে। ধীরে ধীরে সানস্পট ও সোলার ফ্লেয়ার বাড়তে থাকে, এক পর্যায়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়, যাকে বলা হয় "সোলার ম্যাক্সিমাম।”

সম্প্রতি নাসা ঘোষণা করে যে, সূর্য ২৫তম সৌরচক্রে প্রবেশ করেছে। বেশ কিছুকাল যাবৎ সূর্য ঘুমিয়ে ছিল (আগেই বলেছিলাম, এটা “সোলার মিনিমাম”)। সে অবস্থা থেকে আবার নতুন জাগরণ শুরু হয়েছে। আবার সৌর ঝড়, সোলার ফ্লেয়ার, সানস্পট বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

সানস্পট বিশাল অঞ্চল জুড়ে দেখা যায়। এটি পৃথিবীর সমান কিংবা তারও বেশি হতে পারে এবং স্থায়ীত্ব কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত হয়।সান্সপটের আবার দুটি অংশ থাকে। এর একটি হলো *Umbra* যা মূলত সান্সপটের কেন্দ্র (তাপমাত্রা ৩০০০-৪৫০০ কেলভিন বা ২৭০০-৪২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং *Penumbra* যা সানস্পটের বাইরের অংশ (তাপমাত্রা ৫৭৮০ কেলভিন বা ৫৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস)।

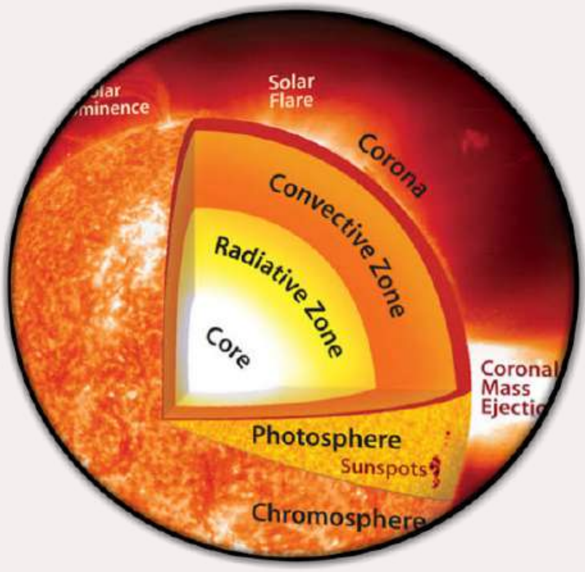

সূর্যের নানা স্তর

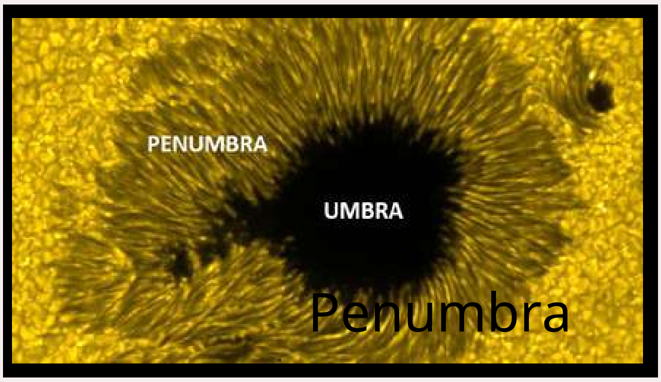

☐Sunspot এর দুটি অংশ: Umbraএবং Penumbra

সানস্পটের পাশেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঘনীভূত (concentrated) অবস্থায় থাকে। এই ঘনীভূত ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে শক্তি পেয়ে এই অঞ্চলে প্লাজমা গুলো আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে তাদের উজ্জ্বল দেখায়। এ কারণেই সানস্পটের পাশে সূর্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে উজ্জ্বল অঞ্চল দেখা যায়। একে বলা হয় *Faculae* বা ল্যাটিন ভাষায় "ছোট টর্চ"।

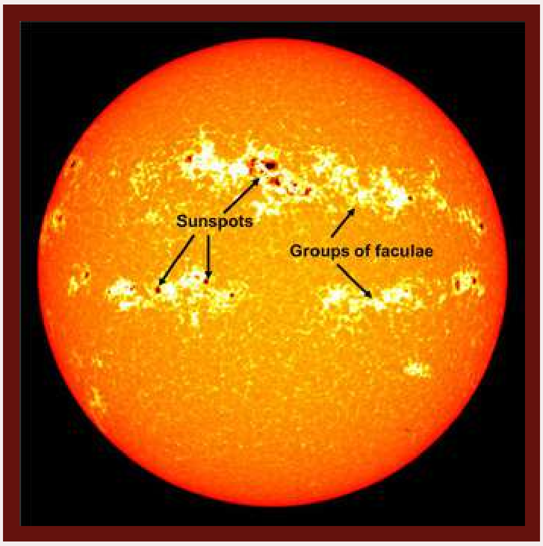

☐সানস্পটের আশেপাশেই "Faculae"দেখা যায়।

এছাড়াও সূর্যের উপরিভাগে মাঝে মধ্যেই ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এ বিস্ফোরণে বেশ কিছু ক্ষতিকর রশ্মি মহাকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে ছড়িয়ে পড়ে।অনেকটা আগুনের গোলা সূর্য থেকে বের হওয়ার মত।এ ঘটনাকে বলা হয় সোলার ফ্লেয়ার বা সৌরঝলক। নাসার দাবি, সাধারণ সৌর রশ্মির তেজ যতটা হয়, এ রশ্মিগুলোর বেগ কয়েকগুণ বেশি (প্রায় ১.৬ মিলিয়ন কিমি/ঘণ্টা)।

প্রায় ২০ মিলিয়ন নিউক্লিয়ার বোমা এক সাথে ফাটলে যে শক্তির জন্ম হয়, এ শক্তি তার চেয়েও বেশি।আবার যখন সূর্যের বাইরের স্তর করোনা (এই করোনা কিন্তু করোনা ভাইরাস নয়) থেকে এধরণের বিস্ফোরণ ঘটে তখন তাকে বলে " করোনাল মাস ইজেকশন " বা Coronal Mass Ejection(CME)।

☐করোনাল মাস ইজেকশন

> "সূর্যের উপরিভাগে মাঝে মধ্যেই ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এ বিস্ফোরণে বেশ কিছু ক্ষতিকর রশ্মি মহাকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকটা আগুনের গোলা সূর্য থেকে বের হওয়ার মতন। এ ঘটনাকে বলা হয় সোলার ফ্লেয়ার বা সৌরঝলক।"

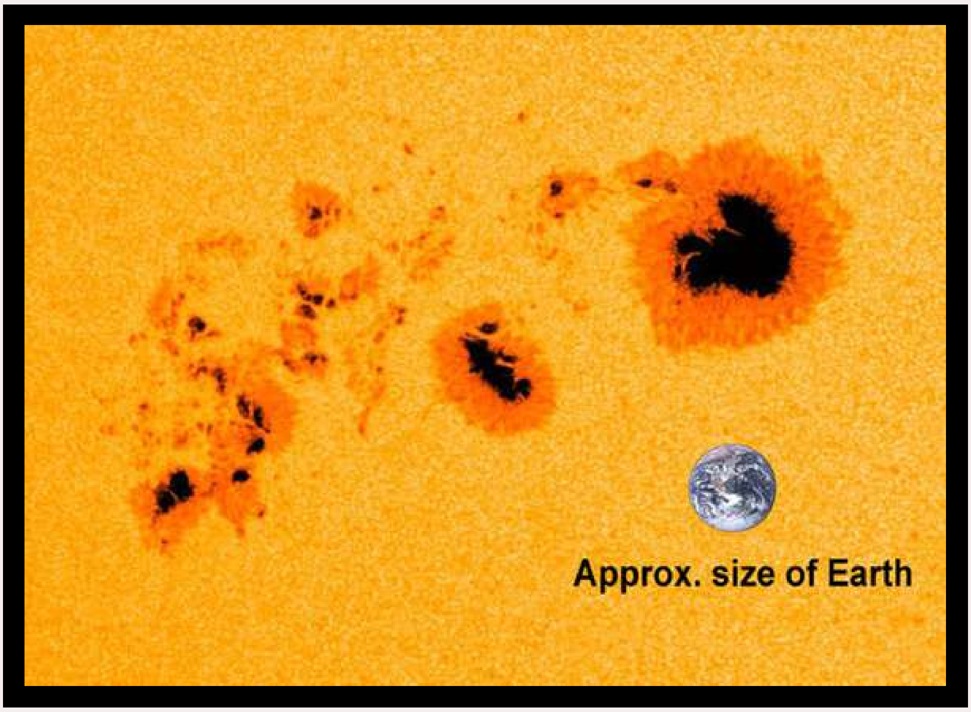

☐ সানস্পটের আকার পৃথিবীর সমান কিংবা তার চেয়েও বড় হতে পারে।

এ রশ্মিগুলোর নিশানা থেকে পৃথিবীও বাদ যায় না। তবে বায়ুমন্ডল এ রশ্মিগুলোর অনেকটুকু শোষণ করে নেয় বলে আমরা অনেকটুকু নিরাপদ থাকি। অবশ্য, পরিবেশ দূষণের ফলে ওজন স্তরের যে অবস্থা, আগামীর পৃথিবীকে চর্মরোগ আর ক্যান্সার এর মত ভয়াবহ রোগ দিয়ে সাজানোর ক্ষেত্রে আমরা অনেকটুকু সফল!

যোগাযোগ ব্যবস্থায় সোলার ফ্লেয়ার বেশ ভালোভাবেই ইফেক্ট করে। স্যাটেলাইট, রেডিও যোগাযোগ সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আর এই সোলার ফ্লেয়ার ও ঘটে এই সানস্পট এর কারণে।

তাহলেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের পর্যবেক্ষণ করা এই কালো দাগও তৈরি হয় কত জটিলতার মধ্য দিয়ে আর এর প্রভাবও কতটা সুদূরপ্রসারী। এই লেখা পড়ে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমাদের শান্ত, হাস্যেজ্বল সূয্যিমামা ভেতরে ভেতরে কত অশান্ত কর্মকান্ড করে বেড়ায়!

তথ্যসূত্রঃ-

indianexpress.com, spaceplace.nasa.gov, scied.ucar.edu, sunstrek.org, nasa.gov, space.com, scied.ucar.edu, astronomy.com, Britannica.com, esa.int, swpc.noaa.gov

লেখায়ঃ-

মুহাম্মদ, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।
রাগীব মাজেদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।
সীমান্ত, নটরডেম কলেজ, ঢাকা।

বিজ্ঞানের জগৎজুড়ে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে নানা চিত্তাকর্ষক আবিষ্কার বা ঘটনাবলী, পুরষ্কার পাচ্ছে অনেকেই। কেবলমাত্র বিজ্ঞানজগতের সকল আপডেটকে একত্র করতে আমাদের প্রতি সংখ্যায় থাকছে "বিজ্ঞান বুলেটিন", যার জন্য কাজ করে চলে হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবের সদস্যরা। বিজ্ঞানজগতের সাথে আপডেটেড থাকতে প্রতি দুইমাসে একবার করে এই পাতায় আসে চোখ বুলিয়ে নিতেই পারো তুমি। আর যদি তুমি নিজেও এই বিজ্ঞান বুলেটিন টিমের সাথে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে চাও, তাহলে তোমার এই আগ্রহের কথা আমাদেরকে ইমেইল করে জানাও আমাদের মেইলে। আমাদের ম্যাগাজিনের জন্য অফিশিয়াল মেইল আইডিতে তোমার নাম, পরিচয়, পূর্ব অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), ইচ্ছার কারণ, এবং তোমার প্রতি মাসে ফ্রি সময়ের পরিমাণ জানাও।

আমাদের ইমেইল ঠিকানাঃ whiteorigins.wbsc@gmail.com

New class of neurons discovered!

জুলাই
১

মানব মস্তিষ্ক কীভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের মুখগুলি চিনতে পারে এমনকি যদি অনেক বছর আগেও হয়, তা বিজ্ঞানীদের কাছেও দীর্ঘদিন অমীমাংসিত ছিল। ১৯৬০- এর দশকে বিজ্ঞানীরা একটি সম্ভাব্য উত্তর প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রতিটি মুখের মুখোমুখি হওয়ার জন্য "Grandmother's Neuron" নামে একটি একক কোষ আছে যা এটি সম্পর্কে তথ্য এনকোড সঙ্কেতাক্ষারে করে একটি নিউরনের কার্যকলাপ ম্যাপ করে।

সম্প্রতি ফ্রেইওয়াল্ড এবং তার সহকর্মীরা মস্তিষ্কের টেম্পোরাল পোল (TP) এলাকায় একটা ছোট এরিয়া আবিষ্কার করেন যেটি কোন কিছুর মুখাবয়ব চিনতে জড়িত থাকতে পারে।

তারা টিপি নিউরোনাল কার্যকলাপের উপর আরও গবেষণা করতে দুটি রিসাস ম্যাকাক বানরে ফাংশানাল ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্সকে ইমেজিং (FMRI) নামে একটি কৌশল ব্যাবহার করে। বানরগুলিকে দুইশো ছবির একটি সিরিজ দেখিয়েছেন যাতে টিপি -তে কোষের কার্যকলাপ পরিমাপ করার সময় মানুষের মুখ বানরের মুখ এবং বস্তু অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এরপর তারা লক্ষ্য করেন, পরিচিত মুখ দেখার পর টেম্পোরাল পোল থেকে যে প্রতিক্রিয়া আসে এবং অপরিচিতদের দেখার পর যে প্রতিক্রিয়া আসে তা তুলনা করে দেখা যায় যে পরিচিত মুখের ক্ষেত্রে টেম্পোরাল পোলের নিউরন গুলা ছিল অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল। ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে যে, এই কোষগুলো পরিচিত বস্তুর ক্ষেত্রে অপরিচিত বস্তুর তুলনায় তিনগুণ বেশি রেস্পন্স করেছে, যদিও অপরিচিত ফেইসগুলো তারা ভার্চুয়ালি স্ক্রিনে অনেকবারই দেখেছে। তাই এটি লক্ষণীয় যে, কোন কিছু মুখোমুখি দেখে যে নিউরাল এক্টিভিটি হয়, তা স্ক্রিনে দেখে নাও হতে পারে। টেম্পোরাল পোল এলাকার কোষগুলো সংবেদনশীল কোষ হিসেবে কাজ করে সাথে ভিজুয়াল উদ্দীপনার ক্ষেত্রে দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম। কিন্তু তারা মেমোরি কোষের মতোও কাজ করে যেগুলো শুধুমাত্র ঐসব উদ্দীপনার সাড়া দিবে যেসব ফেইস মস্তিষ্ক আগে দেখেছে।

জুলাই
২

গায়ক পাখিদের মস্তিষ্কের প্লাস্টিকনে ডোপামিনের ভূমিকা

ডোপামিনের নাম শুনে নি এমন মানুষ বিজ্ঞান জগতে খুব কম সংখ্যকই রয়েছে। ভালো লাগা, উত্তেজনাকর মুহূর্তে যেমন সে সর্বদাই বিরাজমান, তেমনি আমরা যখন কিছু শেখার-বুঝার কিংবা পরিকল্পনার চেষ্টা করি, ডোপামিন নামের এই নিউরোট্রান্সমিটার আমাদের মস্তিষ্কে একই সাথে অনুভূতি উপলব্ধি এবং উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্নায়ুবিজ্ঞানীরা নতুন গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে গায়কপাখিদের ডোপামিন কীভাবে তাদের জটিল নতুন শব্দ শিখতে ভূমিকা পালন করে।

নতুন কিছুতে প্রতিবেদন সৃষ্টি, তা থেকে মস্তিষ্কের নিউরো প্লাস্টিসিটি হওয়া (সহজ ভাষায়, স্নায়ুতন্ত্রে অভিযোজন করা কোনো অনুভূত পরিবর্তনকে নিউরো প্লাস্টিসিটি কিংবা ব্রেইন প্লাস্টিসিটিও বলে) এর পিছনের ভূমিকাটুকু ডোপামিন কতটুকুই রাখে এবং তা কেমন করে, সেটি পরীক্ষণে গায়ক পাখিদের দেখে-কণ্ঠস্বরে অন্য পাখিদের কি অনুভূত হয়, কতটুকু নিউরো প্লাস্টিসিটি ঘটে এবং তাতে ডোপামিনের প্রভাব কতটুকু তা নিয়ে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের সহায়তা নেন ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস আর্মহেস্ট এর নিউরো সাইন্টিস্টরা এবং রিসার্চ পেপারটি জার্নাল অব নিউরোসায়েন্স-এ প্রকাশিত হয়।

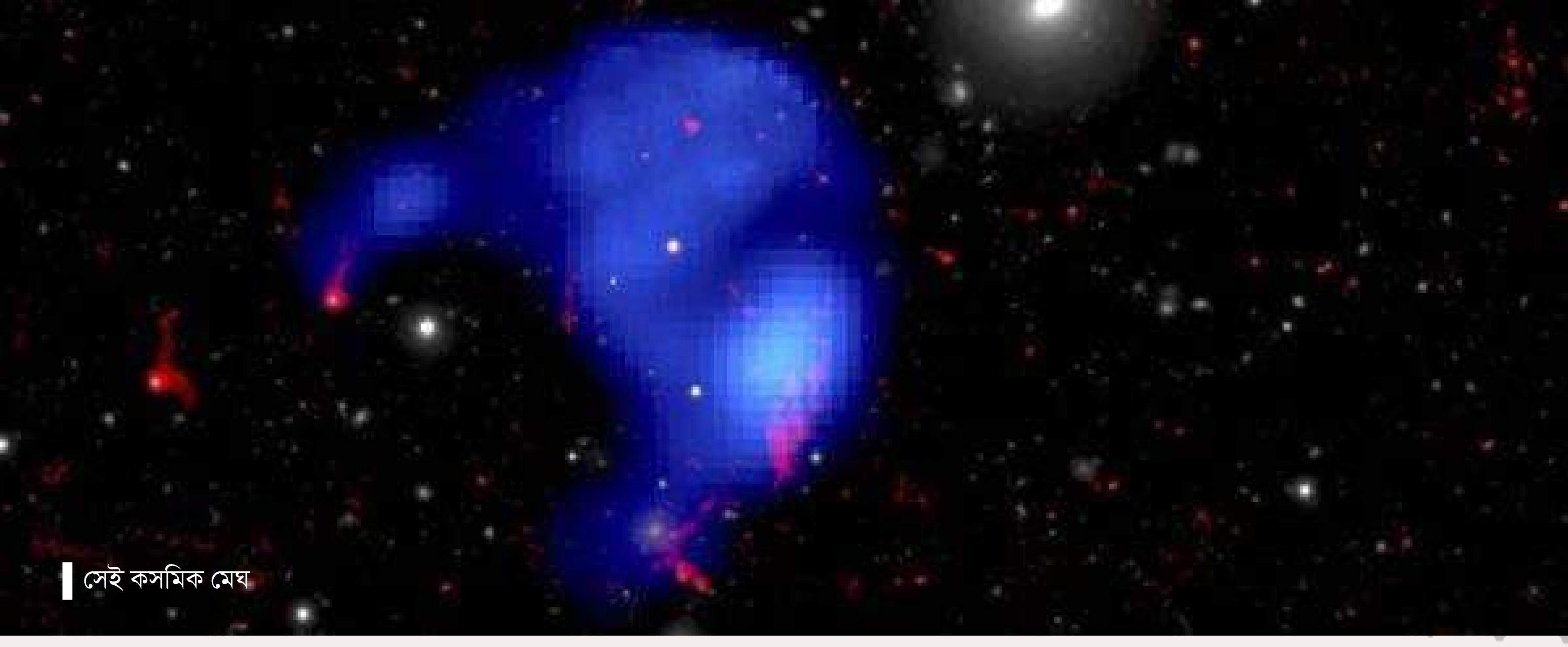

সেই কসমিক মেঘ

জ্যোতির্বিদরা লুকানো একটি কসমিক মেঘ শনাক্ত করেন যেটি পুরো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি থেকে বড়।

জুলাই
৫

ইন্টারগ্যালেক্টিক (দুই বা ততোধিক গ্যালাক্সির মাঝে) স্পেসের শূণ্যস্থানে বড় একটা কিছু লুকিয়ে আছে।

যদিও এটি গ্যালাক্সি নয় বাট তবুও কম্পেয়ারেবল একটি সাইজ। গরম, মৃদুভাবে উত্তপ্ত গ্যাসের একটি বিশাল মেঘ যেটি মিল্কিওয়ে থেকে বড় এবং গ্যালাক্সিগুলোর মাঝে গুচ্ছাকারে জমা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এই মেঘটি কোন গ্যালাক্সি থেকে হঠাৎ করে কোনভাবে ছিটকে পড়ে এবং এই ধরনের মেঘ মানবসভ্যতা প্রথমবার দেখেছে। আশ্চর্য্যজনকভাবে এটি ক্ষয় না হয়ে কম্প্যাক্ট অবস্থায় আছে শত মিলিয়ন বছর ধরে। এটির ভর সূর্যের প্রায় ১০ বিলিয়ন গুণ এবং এটির তাপমাত্রার রেঞ্জ ১০,০০০-১০০,০০,০০০ কেলভিন।

নতুন সৃষ্ট হতে যাওয়া গ্রহের চারপাশে উপগ্রহ তৈরির ডিস্কের দেখা মিলল!

জুলাই
২২

প্ল্যানেট ফর্মেশন বা গ্রহ তৈরির প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল এবং দীর্ঘ। শক্তিশালী টেলিস্কোপ যন্ত্রের মাধ্যমে জ্যোতির্বিদেরা PDS 70b ও PDS 70c নামক দুটি অসম্পূর্ণ গ্রহ দেখতে পেয়েছিলেন। সম্প্রতি এএলএমএ (চিলিতে অবস্থিত টেলিস্কোপের একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় ইন্টারফেরোমিটার, যা বৈদ্যুতিক-চৌম্বকীয় বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করে) সৌরজগতের বাইরের একটি গ্রহের চারপাশে উপগ্রহ তৈরির ডিস্ক শনাক্ত করেছে।জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পূর্বে PDS 70c এর চারপাশে এলাকার কোষগুলো সংবেদনশীল কোষ হিসেবে কাজ করে সাথে ভিজুয়াল উদ্দীপনার ক্ষেত্রে দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম। কিন্তু তারা মেমোরি কোষের মতোও কাজ করে যেগুলো শুধুমাত্র ঐসব উদ্দীপনার সাড়া দিবে যেসব ফেইস মস্তিষ্ক আগে দেখেছে।এমন একটি ডিস্ক থাকার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; কিন্তু সে সময়ের টেলিস্কোপে ধারণকৃত চিত্রগুলো দিয়ে ডিস্কের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা যায় নি। উপগ্রহ তৈরির কাজটি কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে চলতে থাকবে; তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ডিস্ক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন বিজ্ঞানীরা।

জুলাই
২৬

হাবল (মহাকাশে স্থাপিত একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র) বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিডে জলীয় বাষ্পের প্রমাণ পেয়েছে।

প্রথমবারের মতো, জ্যোতির্বিদরা বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিডের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের প্রমাণ উন্মোচন করেছেন। এই জলীয় বাষ্প তৈরি হয় যখন চাঁদের উপরিভাগ থেকে বরফ উপজাত হয় - যা শক্ত থেকে গ্যাসে পরিণত হয়। জলীয়বাষ্পের এই প্রমাণ খুঁজে পাওয়ার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গত দুই দশক থেকে হাবল পর্যবেক্ষণগুলি পুনরায় পরীক্ষা করেছিলেন।

জুলাই
২৬

New Research Finds Children With Autism Have a Distinctive Gut Microbiome

অটিজম আক্রান্ত শিশুরা সাধারণত তাদের সাথে বিকাশমান অন্যদের থেকে আলাদা হয়। সম্প্রতি গবেষকরা বলছেন যে তাদের অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া বা "মাইক্রোবায়োম" এর মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। এবং প্রমাণগুলি থেকে জানা যায় যে, ব্যাকটেরিয়া এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের মাঝে যে কানেকশন (যাকে গাট ব্রেইন এক্সিস বলা হয়) সেটি সামাজিক আচার আচরণে প্রভাব বিস্তার করে।

অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ও অনুন্নত পরিমাণে। নিউরোট্রান্সমিটিং কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যাকটেরিয়া তাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে কম দেখা যায় এবং তাদের এমন ৫ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া দেখা যায়, যেগুলো সাধারণত শিশুদের অন্ত্রে দেখা যায় না।

এই গবেষণায় অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত শিশুদের জন্য দ্রুত চিকিৎসা হতে পারে বলে তারা আশাবাদী।

প্রথমবারের মতো ব্ল্যাকহোলের অপর পাশে আলোর দেখা পেলেন বিজ্ঞানীরা

জুলাই
২৯

ব্ল্যাকহোল সবকিছুকে গিলে ফেলে এমনকি আলো পর্যন্ত এর কাছ থেকে নিস্তার পায় না বলে এতদিন জেনে এসেছি। কিন্তু নতুন তথ্যপ্রমাণ অনুসারে, ব্ল্যাকহোলের আশেপাশে আলো ইকো বা অনুরণন তৈরি করে; ফলে বিজ্ঞানীরা এর অপর পাশ দিয়ে আলোর দেখা পেতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা ৮০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সির মধ্যে থাকা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের দ্বারা বিকিরিত এক্স-রে শনাক্ত করতে পেরেছেন, যার দেখা মিলেছে ব্ল্যাকহেলের অপর পাশ দিয়ে। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী ড্যান উইলকিন্সের মতে, এটি হলো ব্ল্যাকহোলের দুর্লভ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি, যা স্থান বক্রতা এবং ব্ল্যাকহোলের মধ্যস্থ চৌম্বকক্ষেত্রের ফলে সৃষ্টি হয়। চৌম্বকক্ষেত্রগুলো এতটাই আবদ্ধ যে ব্ল্যাকহোল অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে উচ্চশক্তির ইলেকট্রন তৈরি করে, যা পরবর্তীতে জন্ম দেয় এক্স-রের। আইন্সটাইন তাঁর জেনেরাল থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে এই ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবে তার বাস্তব প্রমাণ মিলল এতদিনে।

> ❞
> এই ঘটনাটি আইন্সটাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার ভবিষ্যতবাণী সত্য প্রমাণ করলো

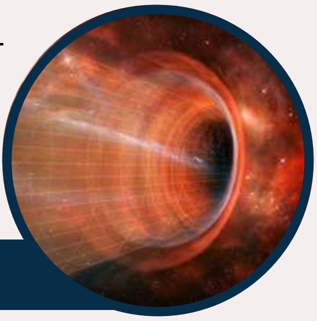

মেক্সিকো উপসাগরের তলদেশে বিশাল ডেড জোন আবিষ্কার!

আগস্ট
৬

মার্কিন বিজ্ঞানীরা মেক্সিকো উপসাগরের তলদেশে বিশাল ডেড জোন আবিষ্কার করেছেন। NOAA অনুসারে এই ডেড জোনটি প্রায় ৬,৩৩৪ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত এবং সাধারণ ডেড জোন থেকে আরো বিরাট।

ডেড জোন তৈরি হয় জমিতে নিউট্রিয়েন্ট অথবা অতিরিক্ত সার ব্যবহার করার কারণে যা পরিশেষে সমুদ্রে এসে পতিত হয়। এটি সামুদ্রিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে এবং বছরে মৎস্যচাষ ও সামুদ্রিক আবাসস্থলের প্রায় ২.৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি করে।

Gulf of Mexico

অধ্যবসায়ই ছিলো মঙ্গল পৃষ্ঠ খননের সময় নাসার মূল প্রতিবন্ধকতা

আগস্ট
৯

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের জন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে, ইচ্ছাশক্তি এবং অধ্যবসায় এর জোরে, নাসা মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে খনন কাজ সম্পন্ন করলেও শিলার নমুনা সংগ্রহের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা শুক্রবার একটি ছোট টিলার ছবি প্রকাশ করেছে যার কেন্দ্রে রোভারের পাশে একটি ছিদ্র রয়েছে - যা রোবট দ্বারা লাল গ্রহে সর্বপ্রথম খনন করা হয়েছিলো। কিন্তু রোভার দ্বারা পৃথিবীতে পাঠানো তথ্য প্রথম নমুনা সংগ্রহ করার এবং একটি টিউবে সীলমোহর করার প্রচেষ্টার পর ইঙ্গিত দেয় যে কোন পাথর সংগ্রহ করা হয়নি। ড্রিল হোল একটি নমুনা প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ, যেটিতে প্রায় ১১দিন সময় লাগতে পারে এবং যার লক্ষ্য প্রাচীন হ্রদের জলাশয়ে সংরক্ষিত প্রাচীন মাইক্রোবায়াল জীবনের চিহ্নগুলি সন্ধান করা। একটি বড় জিপ গাড়ির আকার এর সমতুল্য মিশনটি এক বছর আগে ফ্লোরিডা থেকে রওনা হয়েছিল এবং অধ্যবসায় এর জোরে ১৮ ফেব্রুয়ারি জিজেরো ক্র্যাটারে অবতরণ করেছিল। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে গর্তটিতে ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে একটি গভীর হ্রদ ছিল, যা সঠিকভাবে পুনরুদ্ধার করলে ভবিষ্যৎ এ প্রাণী ও উদ্ভিদ এর জীবন সঞ্চার করতে সক্ষম হতে পারে। নাসা ২০৩০ -এর দশকে প্রায় ৩০টি নমুনা পৃথিবীতে আনার জন্য একটি মিশনের পরিকল্পনা করেছে, যা বর্তমানে মঙ্গল গ্রহে আনা

যায় এমন যন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি পরিশীলিত যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করা হবে।

আইএসএস-এ প্রথম মহাকাশ অলিম্পিক!

আগস্ট
১১

ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা নাসা কর্তৃক প্রেরিত ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন অভিযান cre-5 এর ক্রুরা দীর্ঘদিন কাজের একঘেয়েমি দূরীকরণ এর লক্ষ্যে ছুটির এক দিবসে পৃথিবী থেকে ৪০০ কিলোমিটার উপরে শূণ্যে অবস্থানকালে অংশগ্রহণ করে প্রথম অনুষ্ঠিত স্পেস অলিম্পিকে!

শনিবার বিকেলে ৪টি ভিন্ন জাতির ৭ জন ক্রীড়াবিদ ২ টি দলে বিভক্ত হয়ে অংশ নেয় ৪ টি মজার খেলা ফ্লোর-রুটিন, নো-হ্যান্ডবল, সিঙ্ক্রোনাইজড স্পেস সাঁতার এবং ওজনহীন শার্পশুটিং এ। দু'টি দল "টিম ক্রু ড্রাগন" ও "টিম সোয়ুজ"এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ক্রু মেম্বার দের মধ্যে জন্ম নেয় সংহতির পাশাপাশি দৃঢ় মনোবল।

সম্পূর্ণ কার্যক্রম টি ভিডিও আকারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করে ইএসএ মহাকাশচারী টমাস পেসকেট। তিনি মহাকাশে ২০০ টির ও বেশি পরীক্ষা-নিরিক্ষার পরিকল্পনা করা হয়েছে যার মধ্যে ৪০ টি ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা ও ১২ টি নতুন পরীক্ষা ফরাসি মহাকাশ সংস্থা CNES এর নেতৃত্বে এই অলিম্পিকের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে একজন নভোচারী কিভাবে তার পেশা ও শখের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে ও উভয় ক্ষেত্র তাকে শিখায় টিম মেম্বারদের প্রতি মূল্যবোধ ও সতীর্থদের সম্মান এবং উভয় ক্ষেত্রেই নিজের সেরা টা দিতে দরকার কঠিন প্রশিক্ষণ এর পাশাপাশি সঠিক দলের সদস্য হওয়ার বিকল্প নেয়।

এলইডি রশ্মি কোভিড -১৯ করোনাভাইরাস জীবাণুমুক্ত করার পথ আলোকিত করে

আগস্ট
১২

COVID-19 CORONAVIRUS

আমেরিকার ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স জনস্বাস্থ্য ভাইরোলোজি প্রমাণ করেন যে, নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে, LEDs ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। এলইডি সাধারণত জীবাণুমুক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সম্প্রতি AIP পাবলিশিং হরাইজনস-এনার্জি স্টোরেজ অ্যান্ড কনভার্সন অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল কনফারেন্সে পাকিস্তানের গবেষকরা করোনাভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে মানুষের ত্বক নিরাপদ রাখতে একটি অতিবেগুনী LED এর উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তৃতীয়দিনের সম্মেলনে দলটি 222nm এর লক্ষ্যযুক্ত একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দূর-অতিবেগুনী LEDs (UV-C LEDs) ডিজাইন করেছে।অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম নাইট্রাইডের উপর ভিত্তি করে তৈরি এ নকশা III-nitrides নামক উপকরণের একটি অংশ যা দক্ষ, সস্তা এবং পরিবেশ বান্ধব।

III-nitride UV-C LEDs চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, ফোন ও কলমের মতো ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী জীবাণুমুক্ত করার জন্য উপযুক্ত এবং সহজেই ক্লিনিকাল অ্যাপ্লিকেশনে একীভূত হতে পারে। করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উপাদানটি ইতিমধ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

আগস্ট
১৪

মঙ্গল গ্রহের প্রথম নমুনা সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা!

চলতি বছরের ফ্রেব্রুয়ারির ১৮ তারিখ নাসার "পারসেভারেন্স রোভার" মঙ্গলে অবতরণ করার পর সেটি নিয়ে শুরু হয় নানা জল্পনা-কল্পনা। রোভারটিকে মঙ্গলে পাঠানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন নমুনা থেকে লাল-রঙের গ্রহটির অতীতের অবস্থা সম্পর্কে জানা। তাই প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে রোভারটি কিছু পাথরের নমুনা সংগ্রহের চেষ্টা চালায়। কিন্তু সাম্প্রতিক পাওয়া খবর অনুযায়ী, নাসা তাদের প্রথম নমুনা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে গ্রহটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের পাউডারের ন্যায় পাথর। এটি মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, মঙ্গল সম্পর্কে পৃথিবীবাসীর অজানা রয়ে গিয়েছে অনেক কিছুই। তাই নাসার বিজ্ঞানীরা পরবর্তী কাজ শুরু করার সময় আরো সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

৬২.৮ ট্রিলিয়ন ঘর পর্যন্ত পাই (π) এর মানের বিশ্ব রেকর্ড!

আগস্ট
১৬

সুইজারল্যান্ডের গবেষকেরা সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে ৬২.৮ ট্রিলিয়ন ঘর পর্যন্ত পাই এর মান বের করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্র্যাবুয়েন্ডেন ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সের এক বিবৃতি থেকে জানা যায়, এই গণনায় সুপার কম্পিউটারটির সময় লেগেছে ১০৮ দিন ৯ ঘন্টা। এর আগের বিশ্ব রেকর্ডটিতে পাই-এর মান গণনা করা হয়েছিল ৫০ ট্রিলিয়ন ঘর পর্যন্ত। সুইস গবেষণা দলটির মতে, এই রেকর্ড তৈরি করতে তাদের অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে আরএনএ বিশ্লেষণ, তরল গতিবিদ্যার মতো বিষয়গুলোতে কাজে লাগতে পারে।

দ্বিমাত্রিক সুপারসলিড পদার্থ তৈরিতে সাফল্য!

আগস্ট
১৯

সুপারসলিড" হলো কঠিন পদার্থের একটি বিশেষ অবস্থা, যেখানে পদার্থের সূক্ষ্ম কণাগুলো নির্দিষ্ট কাঠামোতে সাজানো থাকলেও কোনোরকম ঘর্ষণ ছাড়াই প্রবাহিত হতে পারে। দুই বছর আগে, পদার্থবিদরা অতি-শীতল চৌম্বকীয় পরমাণু ব্যবহার করে "সুপারসলিড" পদার্থ তৈরি করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তা ছিল একমাত্রিক। সাম্প্রতিক অস্ট্রিয়ার একটি গবেষকদল দ্বিমাত্রিক স্ফটিকের মতো কাঠামো তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন।

পদার্থবিজ্ঞানী ব্রুনো লাবুর্থে-টোলরা'র মতে, একটি দ্বিমাত্রিক সুপারসলিড দেখতে তরল পানিতে নিমজ্জিত ঘনক আকৃতির বরফের টুকরোর মতো। "সুপারসলিড" অবস্থায় থাকা কণাগুলি একটি শক্ত কঠিন কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ হলেও সঞ্চরণশীলভাবে চলাচল করে; যার ফলে সামগ্রিকভাবে পদার্থটি তরঙ্গের মতো আচরণ করে এবং অবাধে ঘর্ষণ ছাড়া প্রবাহিত হতে পারে। "অতি কাঠিন্যতা বা সুপারসলিডিটি"-র পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৯ সালে, যা আবিষ্কার হলো অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় পর।

টেসলা আগামী বছর মানব আকৃতির রোবট প্রোটোটাইপ লঞ্চ করতে যাচ্ছে!

আগস্ট
২০

ইলন মাস্ক ঘোষণা দেন যে বিপজ্জনক এবং সচরাচর মানুষজন করতে চায় না এমন কাজের জন্য ডিজাইন করা "টেসলা বট" নামে রোবট লঞ্চ হবে। রোবটগুলি রেঞ্চ দিয়ে গাড়িতে বোল্ট সংযুক্ত করা থেকে শুরু করে দোকানে মুদি জিনিসপত্র তোলার মতো কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এটি আগামীর অর্থনীতিতেও গভীর প্রভাব ফেলবে!

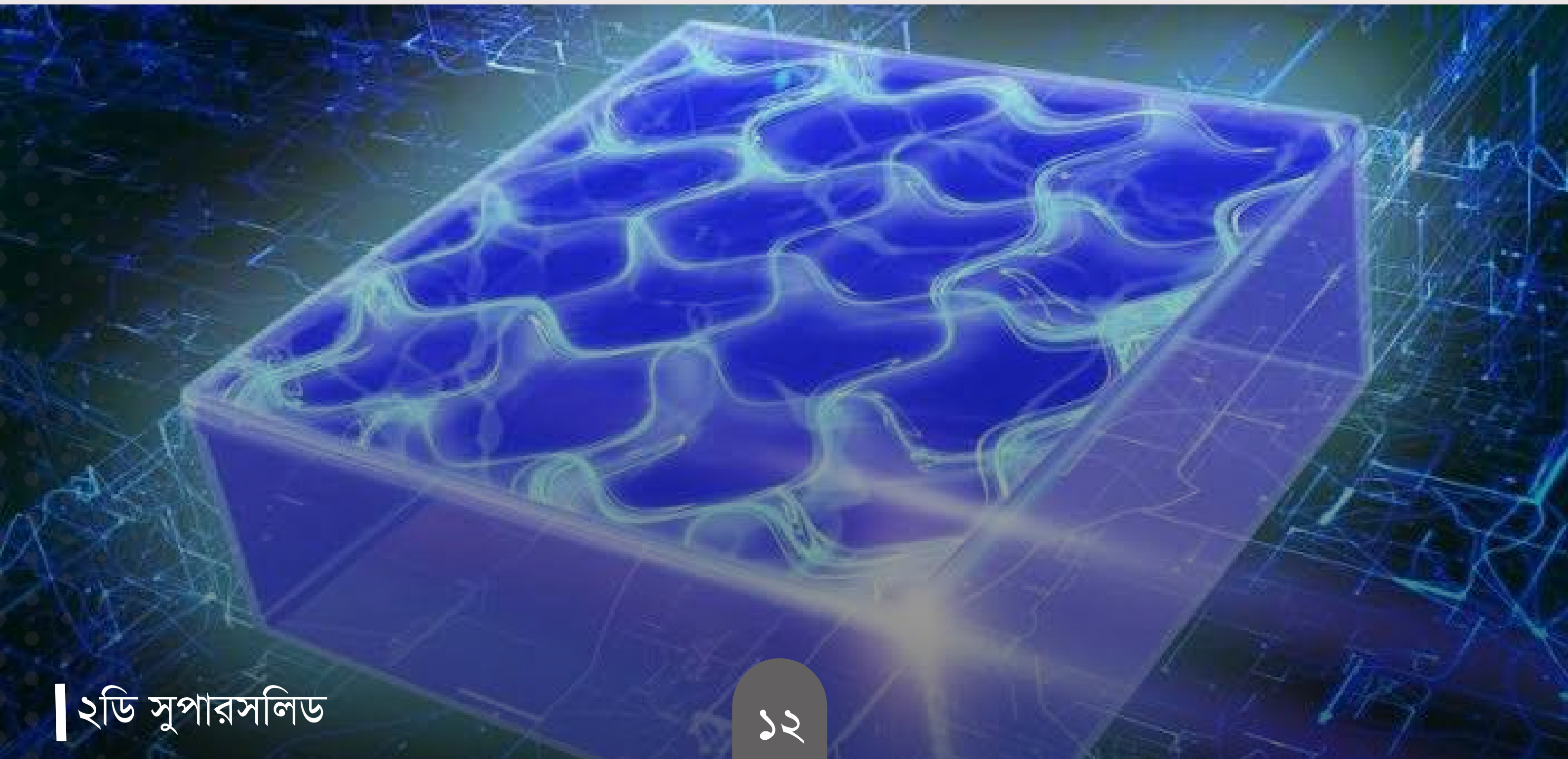

২ডি সুপারসলিড

আগ্নি-কেতন সৃষ্টি

আমি যুগে যুগে আসি,
আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু;
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু ॥
-কাজী নজরুল ইসলাম।

১৯৮৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী পৃথিবীর মানুষ নগ্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো এক পুরনো মাহাজাগতিক আগন্তুককে। ২০৬১ সালে আবার ফিরে আসার কথা দিয়ে পৃথিবীর পাশ কাটিয়ে চলে যায় ৫.৫ কি.মি. ব্যাসার্ধের হ্যালির ধূমকেতু।

রাতের আকাশে বহুদূরত্ব পাড়ি দেয়া তাঁরাদের আলো দেখে যেখানে মানুষ মুগ্ধ হয়ে কবিতা আওড়ায়, সেখানে মাত্র ৯.৫৪ মিলিয়ন কি.মি. দূর দিয়ে পাড়ি দেয়া এই মাহাজাগতিক বস্তুকে দেখে তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা অদ্ভুত! হ্যালির ধূমকেতুই হলো স্বল্পমেয়াদী আবর্তকাল বিশিষ্ট একমাত্র ধূমকেতু যা পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যায়।

কিন্তু এটি কি একমাত্র ধূমকেতু নাকি? মোটেও নাহ! আজপর্যন্ত মহাবিশ্বের ৪৫৯৫ টি ধূমকেতুর কথা জানা গেছে এবং এটি মহাবিশ্বের মোট ধূমকেতুর একটি তুচ্ছ অংশ কেবল।

ধূমকেতুকে ইংরেজিতে বলা হয় *COMET* , শব্দটি *Cometa* শব্দ থেকে এসেছে। গ্রিকে এর অর্থ ধরা হয় "লম্বা চুল পরে আছে এমন"। ধূমকেতু হলো এমন এক মহাজাগতিক উপাদান যা মূলত বরফ, ধূলকণা, বিভিন্ন গ্যাস (কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি) দিয়ে নির্মিত এবং একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দষ্ট নক্ষত্রকে আবর্তন করে।একটি ধূমকেতুর সাধারণত তিনটি অংশ থাকে - নিউক্লিয়াস (*NUCLEI*), কমা (*COMA*) এবং লেজ (*TAIL*)। ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস কঠিন পদার্থের, একেবারে সলিড, পাথর, বরফ নির্মিত। ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস এর পরিসর শত মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

কোনো ধূমকেতু যখন সূর্যকে আবর্তন করতে করতে সূর্যের পাশ দিয়ে যায় তখন তা প্রায় ২-৩ *AU* (১ *AU* = ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার) দূরত্বে চলে আসে। তখন সূর্যের আলোকীয় চাপ, সৌর তেজস্ক্রিয়তার (করোনা থেকে নির্গত ইলেক্ট্রন, রোটন, আলফা কণার) ফলে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের উপরের অংশ বাষ্পায়িত হতে থাকে এবং গ্যাস নির্গত হয়, এই অবস্থাকে *Outgassing* বলা হয়।

> **"ধূমকেতু হলো এমন এক মহাজাগতিক উপাদান যা মূলত বরফ, ধূলকণা, বিভিন্ন গ্যাস (কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি) দিয়ে নির্মিত এবং একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দষ্ট নক্ষত্রকে আবর্তন করে।"**

আউটগ্যাসিং এর ফলে নিউক্লিয়াসের চারপাশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে কমা (COMA) বলা হয়। মূলত এটিকেই আমরা দেখে থাকি ধূমকেতু হিসেবে।সাধারণত ধূমকেতু প্রতি ঘণ্টায় ২০০০ থেকে ১০০০০০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। ফলে " কমার " গ্যাসসমূহ আয়নিত হয়ে পড়ে এবং উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকে, যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে উজ্জ্বল ধূমকেতু হিসেবে। এই বেগে ছুটার ফলে গ্যাসসমূহ পিছন দিকে ধাবিত হয়ে ধূমকেতুর লেজ (TAIL) সৃষ্টি করে।

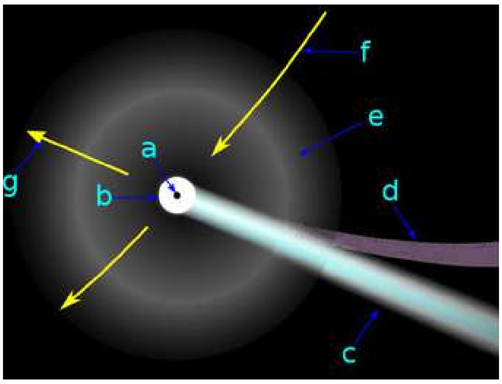

Diagram showing the physical characteristics of a comet. a) Nucleus, b) Coma, c) Gas/Ion tail, d) Dust tail, e) Hydrogen envelop f) Movement of the Comet g) direction to the sun.

এতো কথার পর জানতে কি ইচ্ছে হয় ধূমকেতুর জন্ম কোথায় কিভাবে হয়?

অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে ধূমকেতুর জন্ম সোলার সিস্টেম গঠিত হওয়ারও পূর্বে, প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে।ধূমকেতুকে আবর্তনকাল অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায় - *Short period comet* এবং *Long period comet.*

শর্ট পিরিয়ড বা পিরিয়ডিক কমেট তাদের বলা হয়, যাদের আবর্তনকাল ২০০ বছর বা তার কম এবং উপবৃত্তকার পথে কোনো বস্তুকে কেন্দ্রে রেখে আবর্তন করে (এক্ষেত্রে সূর্য)। এরমধ্যে যেসকল ধূমকেতুর আবর্তনকাল ২০ বছরের কম এবং ৩০° এর বেশি কোণে হেলে ঘোরে তাদের বলা হয় *Jupiter-family Comets (JFCs)*। আর যেসকল ধূমকেতুর আবর্তনকাল ২০ বছর থেকে ২০০ বছর পর্যন্ত এবং অক্ষীয় কোণ ০° থেকে ৯০° এরও অধিক হয় তাদের বলা হয় *Halley-type Comets(HTCs)*। ২০২০ সাল পর্যন্ত ৯১ টি *HTCs* এবং ৬৯১ টি *JFCs* আবিষ্কৃত হয়েছে। উল্লেখ্য কোনো ধূমকেতুর কক্ষপথের যে অংশ সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত (*aphelion*), ঐ অঞ্চলের কাছে যে গ্রহের কক্ষপথ থাকে সেই ধূমকেতুকে উক্ত গ্রহের "ফ্যামিলি" এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন: *JFCs*।

শর্ট পিরিয়ড ধূমকেতুসমূহের উৎপত্তিস্থল হিসেবে *Kuiper belt* নামক মহাজাগতিক স্থানকে বিবেচনা করা হয় যেটি সূর্য থেকে ৩০ *AU* দূরে নেপচুনের কক্ষপথের পেছনেই অবস্থিত এবং ৫০ *AU* পর্যন্ত বিস্তৃত। যেহেতু এই স্থানের বেশির ভাগ বস্তুই আকারে ছোট এবং গ্যাস, বরফ, পাথর নির্মিত তাই এদের মোট ভর সমগ্র পৃথিবীর মাত্র ১.০৩% এর মতো।আমাদের চেনা প্লুটো, বিভিন্ন সাদা বামন গ্রহ এই স্থানের বাসিন্দা। নেপচুনের কয়েকটি উপগ্রহের উৎপত্তিস্থলও এখানেই।

Long period ধূমকেতু বলা হয় ঐসব ধূমকেতুদের যাদের আবর্তনকাল ২০০ বছর থেকে হাজার কিংবা শত সহস্র বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং যাদের কক্ষপথ অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার। এইসকল ধূমকেতুর এক্সেন্ট্রেসিটি বা কেন্দ্র থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ১ বা তার অধিক হতে পারে।১ হলে তা অধিবৃত্তাকার এবং ১ এর অধিক হলে তা পরাবৃত্তাকার।

Long period ধূমকেতুসমূহের গতিপথ নির্ধারিত হয় তাদের চলার পথে অর্থাৎ অরবিটালের উপর বৃহৎ বৃহৎ মহাজাগতিক বস্তু বা গ্রহের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের মাধ্যমে। সুদীর্ঘ সময় ধরে চলার ফলে তাদের নিজস্ব একটি কক্ষপথ সৃষ্টি হয়ে যায়, যাকে আমরা এখন তাদের অরবিটাল বলছি। আবার কিছু ধূমকেতু এমন আছে যারা সূর্যকে মাত্র একবার পাশ কাটিয়ে সোলার সিস্টেম থেকে বের হয়ে যায়, তারা হলো নন পিরিয়ডিক ধূমকেতু।

Long period ধূমকেতুর উৎপত্তিস্থল হিসেবে সুদূরের *Oort cloud* (ওর্ট মেঘ) কে বিবেচনা করা হয়। এর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও ধারণা করা হয় এটি সূর্য থেকে সর্বনিম্ন ২০০০ *AU* থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২০০০০০ *AU* পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মেঘের বাইরের দিকের অংশকে বলা হয় *Outer Oort Cloud* বা সোলার সিস্টেমের শেষ এবং ভেতরের দিকের ডিস্ক শেপের অংশকে বলা হয় *Inner Oort Cloud* বা *Hills cloud*। *Inner Oort Cloud* এর মধ্যে হেলিওস্ফেয়ার (যে অঞ্চল জুড়ে সূর্যের চৌম্বকীয় আকর্ষণ বিদ্যমান) এবং ইন্টারস্টেলার স্পেসও অন্তর্ভুক্ত। *Outer Oort cloud* এ সূর্যের মহাকর্ষণ বল অনেক কমে যায় বিধায় সোলার সিস্টেমের ভেতরকার কোনো বড় গ্রহের বা নক্ষত্রের আকর্ষণে খুব সহজেই মহাজাগতিক উপাদান কিংবা ধূমকেতু সৌরমণ্ডলে ঢুকে পড়ে। এই সকল ধূমকেতুসমূহই হলো *Halley type Comets* কিংবা *Long period Comets*। তবে কিছু কিছু *Short period comet* ও থাকতে পারে যা *Inner Oort cloud* এ উৎপন্ন হয়।

এই যে ধূমকেতুর উৎপত্তি, কুইপার বেল্ট, ওর্ট ক্লাউড এই সবের ধারণা দেয়া হয়েছে কেবল একটি করে ছবি দিয়ে। আমাদের অবশ্যই তুলনামূলক ছবি দেখা জরুরী। আমাদের মহাবিশ্ব যে কত বিশাল, কত দূর পাড়ি দিয়ে যে ধূমকেতুরা আমাদের হাতছানি দিয়ে যায় তা নিচের ছবি থেকেই বোঝা যাবে।

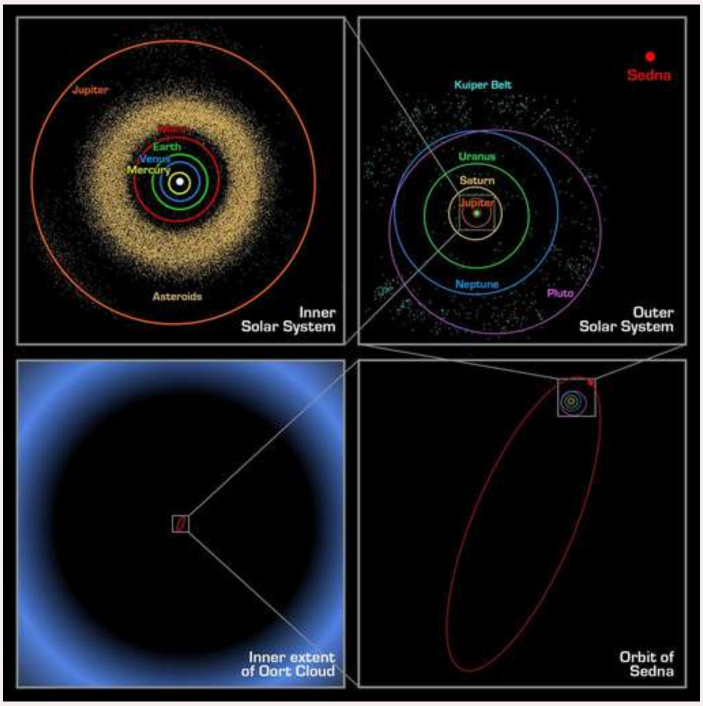
Jupiter
Mars
Earth
Venus
Mercury
Asteroids
Inner Solar System
Kuiper Belt
Sedna
Uranus
Saturn
Jupiter
Neptune
Pluto
Outer Solar System
Inner extent of Oort Cloud
Orbit of Sedna

এই যে এতো কষ্ট করে চক্কর লাগানো ধূমকেতুদের ভাগ্যে তেমন কিছু থাকে নাহ। মাঝে মাঝে তারা সৌরমণ্ডল থেকে বের হয়ে যায় কোনো বৃহৎ বস্তুর আকর্ষনে। আবার অনেক সময় মিলিয়ে যায় অত্যন্ত উত্তাপে।

Short period comet থেকে *Long period comet* তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। *JFCs* গুলোর প্রায় ১০০০০ বছর বা ১০০০ আবর্তনকাল পর্যন্ত অস্তিত্ব থাকে। আমাদের অতিপরিচিত হ্যালির ধূমকেতু প্রায় ১৬০০০ বছর ধরে বর্তমান পথে পরিভ্রমণ করছে, যদিও এর সাব্লিমেশন সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কিছু জানায়নি। ধূমকেতু সমূহের আরেকটি নিষ্ঠুর নিয়তি হলো সংঘর্ষ। বিশাল বড় এই মহাজাগতিক অবাঞ্চিত আগন্তক পৃথিবীর দিকে আসছে...ভাবলেই শিউরে উঠে শরীর।

1P/Halley

কিন্তু সৌন্দর্য কি কিছুই নেই?

মানুষ কিন্তু ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মধ্যে স্থান দিয়ে রেখেছে ধূমকেতুকে। সাধারণত সকল উল্কাপাতকে (ধূমকেতু ও গ্রহাণুর অংশবিশেষই হলো উল্কা) ঘিরেই এইসব মিথ চলে আসছে।ধ্রুবতারা দেখে চট করে তিনবার উইশ করে ফেলা আমাদের মুখে মুখে। তিনবার উইশ করতে পারলেই কেল্লা ফতে! টাকা, বাড়ি, গাড়ি, বউ, জামাই....আরকি লাগে ।টলেমির সময়কালে মহাজাগতিক সব কিছুকে ভাবা হতো স্বর্গীয় বস্তু।টলেমি বিশ্বাস করত ঈশ্বর স্বর্গ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে দুই একটা তারা খসে পড়ত!
অনেক জায়গায় আবার দুর্ভাগ্যের কারণ ও মানা হয় ধূমকেতুকে বা উল্কাপাতকে।

এত লেখা পড়ার পর একটা কাজ করার শক্তি আছে কি?

চট করে খোলা আকাশের নিচে গিয়ে আকাশ পানে দূরবীন লাগিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকো। 'পারসেইড' নামের উল্কাবৃষ্টি দেখতে পাবে, যদি সময়টা আগষ্টের দিকে হয়। এই উল্কাবৃষ্টির উৎপত্তি ১০৯পি/ সুইফট-টাটল ধূমকেতু থেকে, যার আবর্তনকাল ১৩৩ বছর।তারপর দেখতে পারো "অরায়নিডস"। দেখতে পাবে অক্টোবরের শেষ দিকে। এর উৎস কিন্তু সুপরিচিত ১ পি/হ্যালির ধূমকেতু থেকে। তাছাড়া লিওনিডস, জেমিনিডস, আর্সিডিস, কোয়াড্রানটিডস, লাইরিডস, ইটা অ্যাকুয়ারিডস, ডেলটা অ্যাকুয়ারিডস ইত্যাদি দেখে দেখে সারা বছর পার করে দিতে পারবে। আকাশেরও যে সৌন্দর্য আছে তার আর কখনো খুঁজতে চাইবে নাহ মন।

লেখায়ঃ

এনামুল হক জুয়েল, চট্রগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।
কাজী রাকিব, চট্রগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল।

তথ্যসূত্রঃ Wikipedia, Nasa।

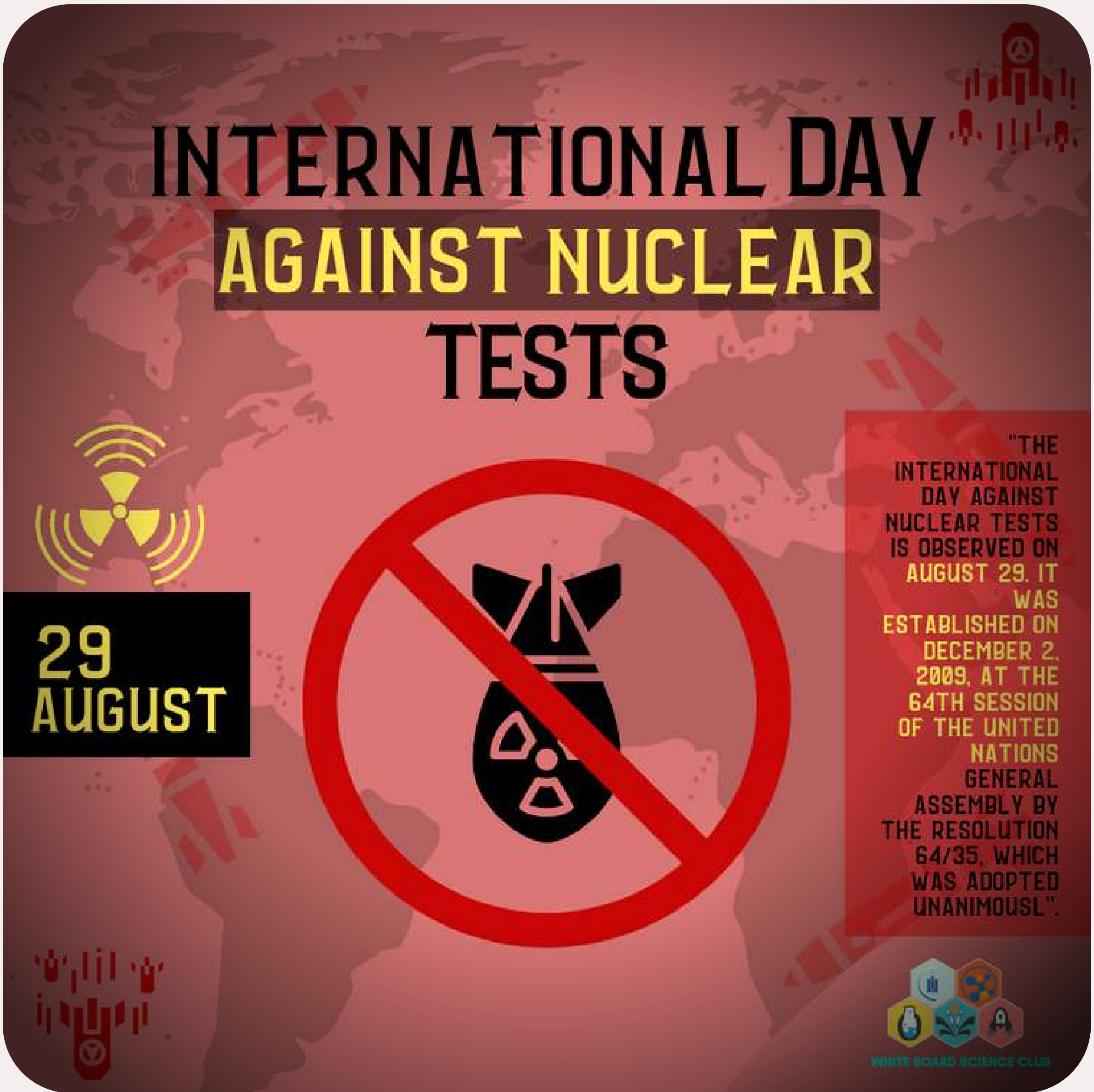
INTERNATIONAL DAY
AGAINST NUCLEAR
TESTS
29
AUGUST
"THE INTERNATIONAL DAY AGAINST NUCLEAR TESTS IS OBSERVED ON AUGUST 29. IT WAS ESTABLISHED ON DECEMBER 2, 2009, AT THE 64TH SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY BY THE RESOLUTION 64/35, WHICH WAS ADOPTED UNANIMOUSL".
WHITE BOARD SCIENCE CLUB

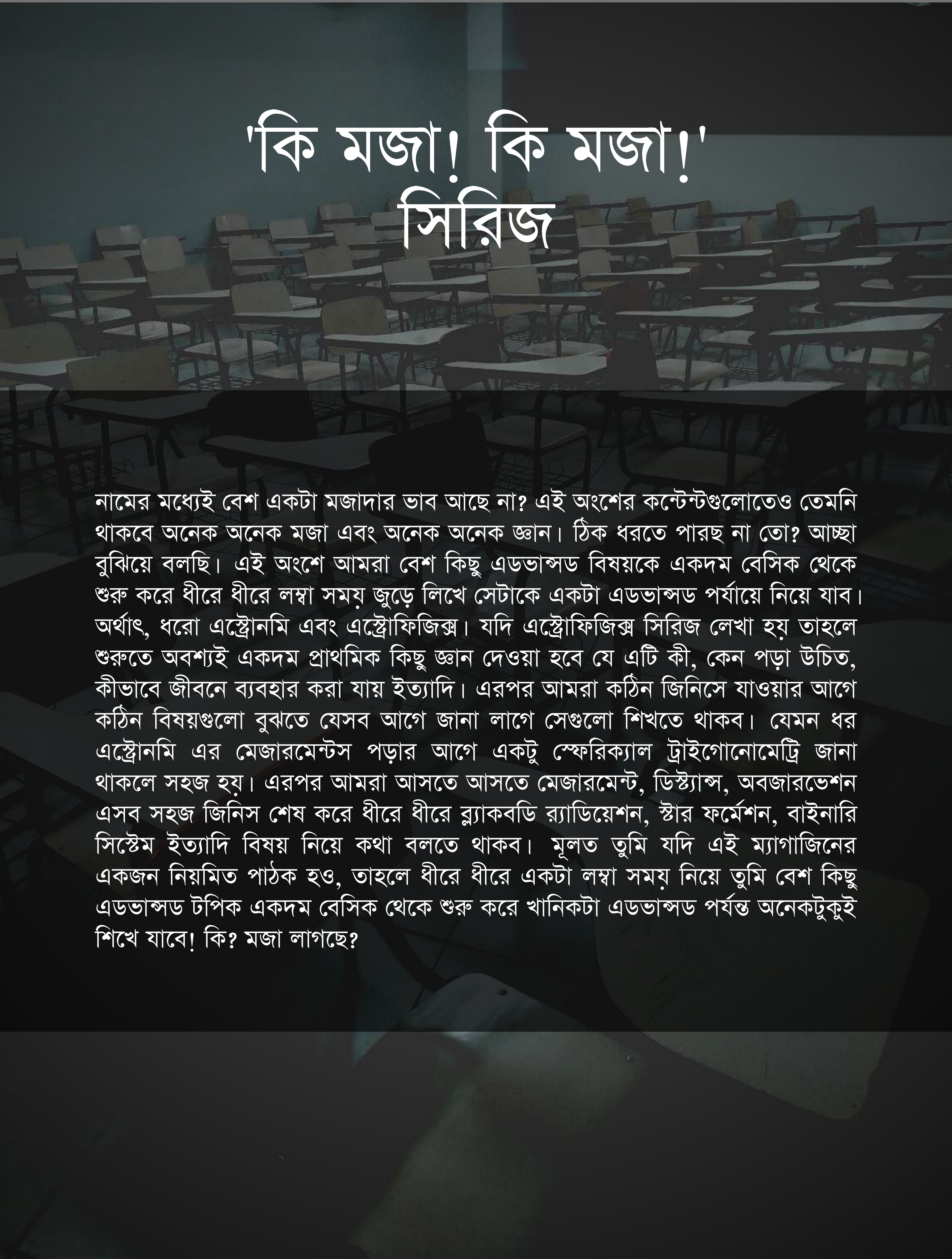

'কি মজা! কি মজা!' সিরিজ

নামের মধ্যেই বেশ একটা মজাদার ভাব আছে না? এই অংশের কন্টেন্টগুলোতেও তেমনি থাকবে অনেক অনেক মজা এবং অনেক অনেক জ্ঞান। ঠিক ধরতে পারছ না তো? আচ্ছা বুঝিয়ে বলছি। এই অংশে আমরা বেশ কিছু এডভান্সড বিষয়কে একদম বেসিক থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে লম্বা সময় জুড়ে লিখে সেটাকে একটা এডভান্সড পর্যায়ে নিয়ে যাব। অর্থাৎ, ধরো এস্ট্রোনমি এবং এস্ট্রোফিজিক্স। যদি এস্ট্রোফিজিক্স সিরিজ লেখা হয় তাহলে শুরুতে অবশ্যই একদম প্রাথমিক কিছু জ্ঞান দেওয়া হবে যে এটি কী, কেন পড়া উচিত, কীভাবে জীবনে ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি। এরপর আমরা কঠিন জিনিসে যাওয়ার আগে কঠিন বিষয়গুলো বুঝতে যেসব আগে জানা লাগে সেগুলো শিখতে থাকব। যেমন ধর এস্ট্রোনমি এর মেজারমেন্টস পড়ার আগে একটু স্ফেরিক্যাল ট্রাইগোনোমেট্রি জানা থাকলে সহজ হয়। এরপর আমরা আসতে আসতে মেজারমেন্ট, ডিস্ট্যান্স, অবজারভেশন এসব সহজ জিনিস শেষ করে ধীরে ধীরে ব্ল্যাকবডি র‍্যাডিয়েশন, স্টার ফর্মেশন, বাইনারি সিস্টেম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলতে থাকব। মূলত তুমি যদি এই ম্যাগাজিনের একজন নিয়মিত পাঠক হও, তাহলে ধীরে ধীরে একটা লম্বা সময় নিয়ে তুমি বেশ কিছু এডভান্সড টপিক একদম বেসিক থেকে শুরু করে খানিকটা এডভান্সড পর্যন্ত অনেকটুকুই শিখে যাবে! কি? মজা লাগছে?

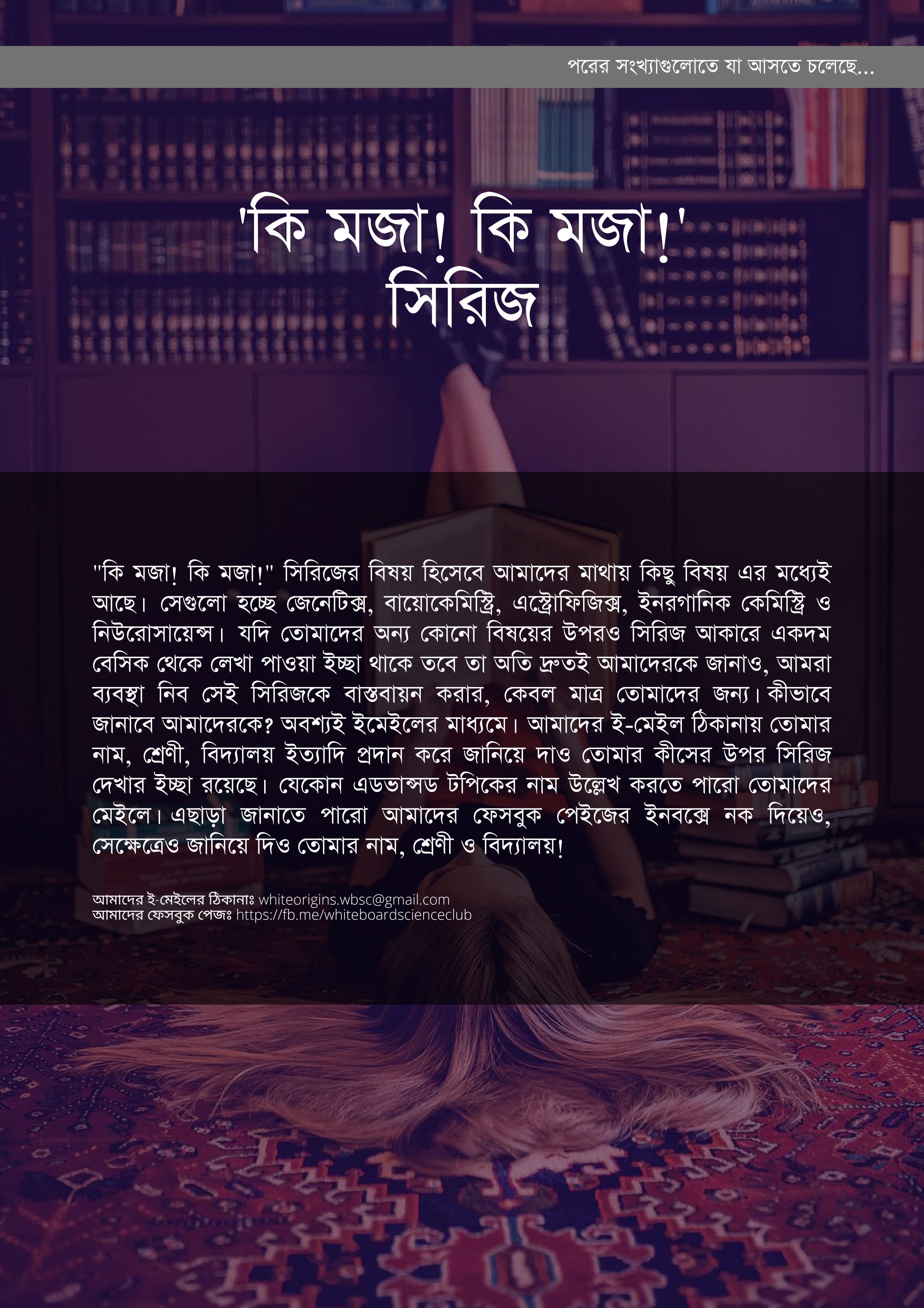

পরের সংখ্যাগুলোতে যা আসতে চলেছে...

'কি মজা! কি মজা!' সিরিজ

"কি মজা! কি মজা!" সিরিজের বিষয় হিসেবে আমাদের মাথায় কিছু বিষয় এর মধ্যেই আছে। সেগুলো হচ্ছে জেনেটিক্স, বায়োকেমিস্ট্রি, এস্ট্রোফিজিক্স, ইনরগানিক কেমিস্ট্রি ও নিউরোসায়েন্স। যদি তোমাদের অন্য কোনো বিষয়ের উপরও সিরিজ আকারে একদম বেসিক থেকে লেখা পাওয়া ইচ্ছা থাকে তবে তা অতি দ্রুতই আমাদেরকে জানাও, আমরা ব্যবস্থা নিব সেই সিরিজকে বাস্তবায়ন করার, কেবল মাত্র তোমাদের জন্য। কীভাবে জানাবে আমাদেরকে? অবশ্যই ইমেইলের মাধ্যমে। আমাদের ই-মেইল ঠিকানায় তোমার নাম, শ্রেণী, বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রদান করে জানিয়ে দাও তোমার কীসের উপর সিরিজ দেখার ইচ্ছা রয়েছে। যেকোন এডভান্সড টপিকের নাম উল্লেখ করতে পারো তোমাদের মেইলে। এছাড়া জানাতে পারো আমাদের ফেসবুক পেইজের ইনবক্সে নক দিয়েও, সেক্ষেত্রেও জানিয়ে দিও তোমার নাম, শ্রেণী ও বিদ্যালয়!

আমাদের ই-মেইলের ঠিকানাঃ whiteorigins.wbsc@gmail.com
আমাদের ফেসবুক পেজঃ https://fb.me/whiteboardscienceclub

বিগ ব্যাংঃ

সবকিছুর সৃষ্টি যেখানে!

মানুষ চিন্তা করতে জানে, ভাবতে জানে। অজানাকে জানার অদম্য নেশা নিয়ে ছুটতে জানে জ্ঞানের রাজ্য। জ্ঞানের এই তীব্র নেশা থেকে মহাবিশ্ব ও রক্ষা পায়নি। কৌতুহলী মানুষ যখন উপরে তাকায়, দিবা আলো ভেদ করে রহস্যের আলো মনের দুয়ারে উঁকি মারতে থাকে।

মানুষ উদঘাটন করতে থাকে মহাবিশ্বের যত রহস্য। জ্যোতির্বিদরা কীভাবে মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে বিগব্যাং থিওরির মাধ্যমে। এই ধারণাটিই যে মহাবিশ্বটি কেবলমাত্র একটি বিন্দু হিসাবে শুরু হয়েছিল, তারপরে প্রসারিত হচ্ছিল, হচ্ছে এবং হতে থাকবে।

বিগ ব্যাং মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব। এ তত্ত্বমতে কোনো ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় নয় একটি বিশেষ মুহূর্তে মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটে। অধিকাংশ মহাকাশতত্ত্ববিদের মতে, আজ থেকে প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে সব কিছু একটি ঘন জায়গায় কেন্দ্রীভূত ছিল যার আগে তাপমাত্রা ও ঘনত্ব ছিল অত্যন্ত বেশি। একেই মহাবিশ্বের বয়স ধরা হয়।

তখন একটি বিস্ফোরণ সংঘটিত হয় যার স্থায়িত্বকাল ছিল খুবই কম সময়ের জন্য, ১ সেকেন্ড এর ১০^-৩২ গুণ। এর থেকেই মূলত মহাবিশ্বের সূচনা হয়।

১৯২২ সালে আলেকজান্ডার ফ্রেডম্যান আবিষ্কার করেন যে আইন্সটাইনের আপেক্ষিকতা ক্ষেত্র সমীকরণগুলো সমাধানের ফলে বিস্তৃত মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো আইন্সটাইন নিজেই স্থিতিশীল মহাবিশ্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তো তিনি তাঁর সমীকরণগুলোতে মহাজাগতিক ধ্রুবক যোগ করে সম্প্রসারণ সরিয়ে নেন। ১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী জর্জ লেমিটার স্বাধীনভাবে ফ্রিডম্যান সমাধান গণনা করেন এবং বলেন মহাবিশ্ব একটি সুপ্রাচীন পরমাণু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। ২ বছর পর, ১৯২৯ সালে এডউইন হাবল এই তত্ত্বের সপক্ষে একটি পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ উপস্থাপন করেন তিনি বলেন, মহাকাশের গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমান্ধয়ে একটি নির্দিষ্ট গতিতে দূরে যাচ্ছে। তাঁর মতে, আদিতে মহাবিস্ফোরণের ফলে গ্যালাক্সিগুলো সৃষ্টি হয়েছিল এবং এগুলোর দূরে সরে যাওয়ার আচরণ বিগ ব্যাং কেই নির্দেষ করে। ১৯৪৮ সালে জর্জ গ্যামফ এ তত্ত্বটিকে পূর্ণতা দান করেন।

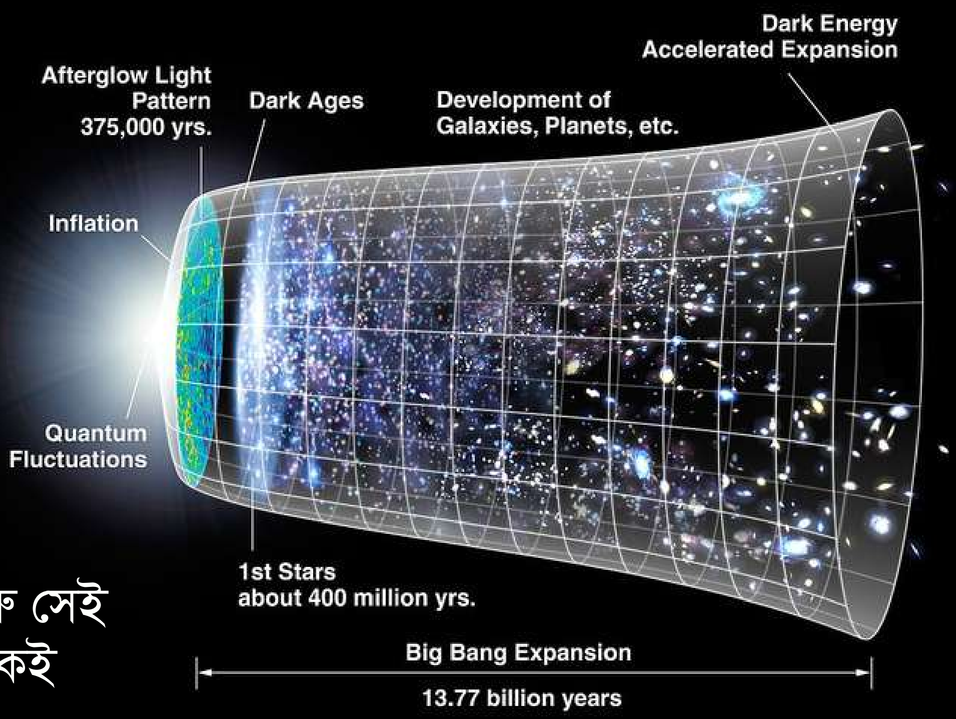
Dark Energy
Accelerated Expansion
Afterglow Light
Pattern
375,000 yrs.
Dark Ages
Development of
Galaxies, Planets, etc.
Inflation
Quantum
Fluctuations
1st Stars
about 400 million yrs.
Big Bang Expansion
13.77 billion years

সবকিছুর শুরু সেই বিগব্যাং থেকেই

১৯৬৪ সালে আর্নো পেনজিয়া ও রবার্ট ওয়িলসন বিকিরণের অস্তিত্ব প্রমাণ করে বিগ ব্যাং এর ধারণাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

"বিগ ব্যাং" নামটি ফ্রেড হয়েল নামে এক বিজ্ঞানী ঠাট্টা করে দিয়েছিলেন, যিনি স্টিডি স্টেট থিওরিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৪৯ সালে বিবিসি প্রচারিত এক রেডিও অনুষ্ঠানে তার এই টিটকারি পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এই নাম ব্যবহার করে। তিনিও বোধ হয় জানতেন না তারই চক্ষুশূল তত্ত্বের নামকরণ তার দ্বারাই হবে। স্টিডি স্টেট নিয়ে একটু বলে রাখি, এ তত্ত্ব মতে মহাবিশ্ব সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয় নি বরং অতীত ও ভবিষ্যতে সর্বদা এক রকম।

সৃষ্টির প্রথমদিকে মহাবিশ্ব সুষম ও সমতাপীয় রূপে একটি উচ্চ শক্তি ঘনত্ব এবং উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপবিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। মহাবিশ্ব সৃষ্টির ১০^-৪৩ সেকেন্ড পর পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো কার্যকরিতা লাভ করে। এ সময়কে প্লাংক অন্তঃযুগ বলা হয়।

কোয়ান্টাম সূত্রানুসারে এ সময় ৪ টি বল একত্রিত হয়। এ সময় কোয়ার্ক ও লেপ্টেন কণার সৃষ্টি হয়। এরপর আনুমানিক ১০^-৩৫ সেকেন্ড পর মহাজাগতিক স্ফীতি শুরু হয়। মহাকর্ষ বল পৃথকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সময় আরো গড়াতে থাকলে তাপমাত্রা কমে ১০^১৬ কেলভিনে নেমে আসে। তাপমাত্রা আরো কমলে দুর্বল নিউক্লিয় বল ও বিদ্যুত চৌম্বকীয় বল পৃথক হয়ে যায়।

সবল নিউক্লিয় বলের প্রভাবে কোয়ার্ক আবদ্ধ হয়ে ফোটন, প্রোটন ও নিউট্রন সৃষ্টি হয়। সময়ের সাথে সাথে মহাবিশ্ব আরো শীতল হতে থাকে। তাপমাত্রা নেমে এলো ৫ বিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তারপর আরো ৩০০ বছর পেরিয়ে গেল। মহাবিশ্বের তাপমাত্রা এমন এক পর্যায়ে নেমে এলো যেটি পরমাণুর গঠন তৈরি করতে লাগলো। প্রোটন,ইলেক্ট্রন ও নিউট্রন মিলিত হয়ে ডিউডেরিয়াম ও হিলিয়াম তৈরি হয়।

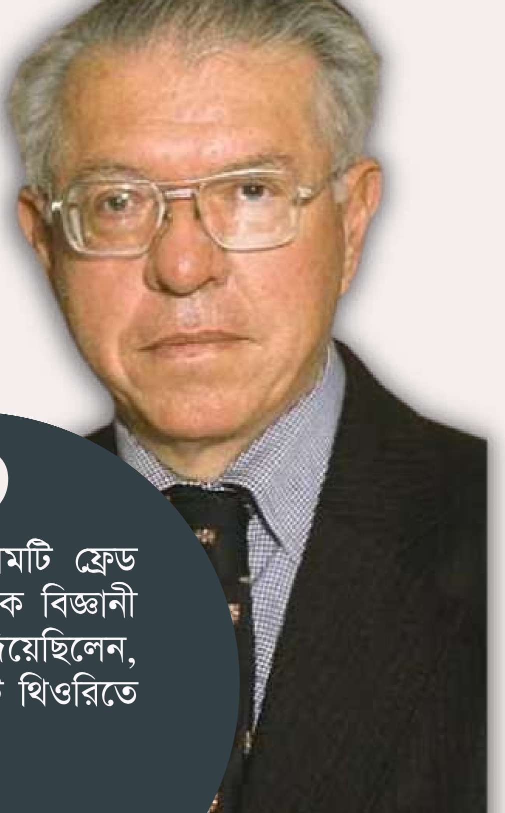

"বিগ ব্যাং" নামটি ফ্রেড হয়েল নামে এক বিজ্ঞানী ঠাট্টা করে দিয়েছিলেন, যিনি স্টিডি স্টেট থিওরিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

তারপর ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগের কথা। ধূলিকণা ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সমন্বয়ে (যার ৯৮ শতাংশ হাইড্রোজেন, ২ শতাংশ হিলিয়াম) থেকে সৃষ্টি হয় সূর্য। সূর্য সৌরজগৎ এর সব উপাদান দিয়ে তৈরি হয়নি। বাকি উপাদান গুলো দিয়ে তৈরি হয় ধূমকেতু, উল্কা, গ্রহ, উপগ্রহ। এরপর একগুচ্ছ সংঘর্ষতে জন্ম নেয় পৃথিবী। এরপর ৩০ মিলিয়ন বছর পর, "থিয়া" নামক এক গ্রহাণুর সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষে উৎপত্তি ঘটে চাঁদের।

মহাবিশ্বের ভর ঘনত্ব যদি ক্রান্তি ঘনত্বের চেয়ে বেশি হয় তবে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট আকারে পৌঁছানোর পর আবার সংকুচিত হতে শুরু করবে। তখন এটি আবার ঘন ও উত্তপ্ত হতে থাকবে এবং একসময় সেই আদি অবস্থায় পৌঁছুবে যে অবস্থায় মহা বিস্ফোরণ শুরু হয়েছিলো।

দিনশেষে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়।

বিগ ব্যাং এর আগে কি ছিল?

আজও বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা। ১৪ বিলিয়ন বছর আগে বিগ ব্যাং হলে তখন কিছুই থাকার কথা না। কিন্তু তখনও কয়েকশত কোটি বছরের পুরোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্যালাক্সির অস্তিত্ব পাওয়া যায় বলে জানান অশ্বিনী কুমার লাল। অশ্বিন দার মত আরো অনেকে সপ্নের টাইম মেশিনে করে ভবিষ্যতে গিয়ে বিগ ব্যাংহীন বিজ্ঞান দেখতে পান। কিন্তু জোর গলায় অস্বীকার করার মত প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি।

তাই, মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে বিগব্যাং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব। আজ আপাতত এখানেই বিগ ব্যাং কথনের ইতি টানছি...

রেফারেন্সঃ

Wikipedia, space.com, science.nasa.gov, onushilon.org, phys.org

লেখায়:

রাগীব মাজেদ চৌধুরী, এসএসসি, চট্রগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

মুহাম্মদ, এসএসসি, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

তানভীর আজিজ মাহী, দশম শ্রেণী এসএসসি, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল

সায়ানাইড

আমি খুব স্বাভাবিকভাবে হাতে থাকা স্টেনগানের ধোঁয়াটুকু এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলাম। সামনে পরে থাকা বিশ্রী ক্ষতবিক্ষত লাশটা দু হাতে মাটির দলা খামচে পরে আছে। একবার দেখেই বলে দেওয়া যায় মারা গেছে। মাথার দুপাশ দিয়ে কালো রক্তের ক্লট। আমি কাজটুকু শেষ করে সাবধানে আমার জুতার তলা দেখে নিলাম। পুরো স্পটে আমার কোনো চিহ্ন যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করে নেওয়া খুব জরুরি।

বাড়ি ফেরার সময় একটা টেলিফোন বুথ থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় ফোন করতে হলো, "ছেলে ঘুমিয়ে গেছে। আমার সাথেই আছে। বাড়ি ফিরছি, কিছু আনতে হবে কি? " ওপাশ থেকে শব্দ ভেসে এলো, "না, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো। রাত অনেক হয়েছে। " ছেলে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি বলতে একটা পঁয়ত্রিশ তলার বিশাল বিল্ডিং। দেশের বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্র। আমি গাড়ি গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। কার্ড পাঞ্চ করিয়ে ভেতরে গিয়ে সোজা বাঁক ধরে এগিয়ে গেলাম লাইন ধরে দাঁড়ানো স্টাফ বিল্ডিং এর দিকে। মোট ছয়টা সাততলা বিল্ডিং সেই এরিয়াতে। আমায় যেতে হবে একেবারে শেষেরটিতে।

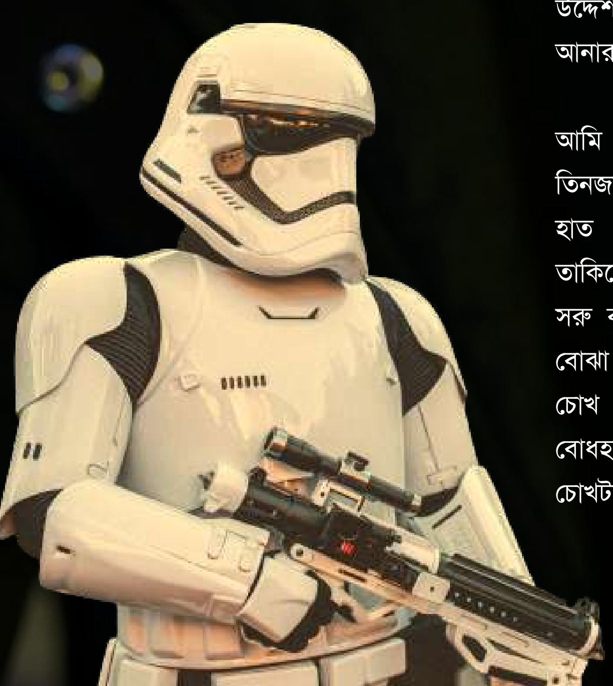

আবার কার্ড পাঞ্চ করতেই ঘড়ঘড় করে দরজা খুলে গেলো। লম্বা করিডোর ধরে গেলে যেতে ক্যান্টিন, লন্ড্রি, কিচেন, ওয়েটিং লঞ্জ-এরকম হাবিজাবি আরো অনেককিছু। দুদিকে কিছু না দেখে একেবারে শেষ মাথায় সিঁড়ি ধরে তিনতলায় উঠে গেলাম। দরজায় ঢুকেই লিফট পরে, সবাই সেদিকে যায়। সেদিকেও সিঁড়ি রয়েছে। কাজেই কেউ এইদিকে আসেনা। তিনতলায় এসে আবার কার্ড পাঞ্চ, এবার পাঞ্চ করাতে হলো নিরেট দেওয়ালে। আলিবাবার গুহার মত সেই দেয়াল খুলে গেলো। আমি পৌঁছে গেলাম আমার ঘরে। হোম সুইট হোম। দরজা খুলতেই আমার মেন্টরের চকচকে ন্যাড়া মাথা দেখা গেলো। শব্দ হতেই তিনি আমার দিকে ফিরে খুব সুন্দর করে হাসলেন। পেছনে আরোকিছু মানুষ। কাউকে আমি চিনি না। সহৃদয়ভাবে মেন্টর জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছো লিলিথ? কোনো সমস্যা হয়নি তো?"

আমি মাথা নেড়ে না-সূচক উত্তর দিলাম। যে প্রশ্নের উত্তর সাধারণ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে দেওয়া যায়, তাঁর উত্তর দিতে জিভ নাড়ানো আমার প্রটোকলে নেই।

মেন্টরের পেছনে থাকা মানুষগুলো আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, "লিলিথ, তোমার কিছু আনার কথা ছিলো।"

আমি তাদের সামনে এগিয়ে গেলাম। মোট তিনজন, আমাকে প্রশ্ন করা মানুষটি টেবিলে হাত দিয়ে বসেছিলো। আমি তার দিকে তাকিয়ে খুব সাবধানে পকেট থেকে একটা সরু বাক্স করে রাখলাম। স্বচ্ছ বক্সটি দেখে বোঝা যাচ্ছে ভেতরে কি আছে, তিনজন লোক চোখ কুচকে ফেললেন। ভায়োলেন্স দেখে বোধহয় অভ্যেস নেই। বক্সে থাকা বাম চোখটার রেটিনা তাদের খুব প্রয়োজন।

২

আমার মেন্টর আমাকে নির্দেশ দিলেন, "লিলিথ, চলো চেকাপ রুমে।"

আমার মাথায়, স্পাইনাল কর্ডে, বুকে, হাতে বেশকিছু তাঁর ঢুকিয়ে দিয়ে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে অনেকরকম পরীক্ষা করলেন তিনি। প্রত্যেকটি ডেটা নিঁখুতভাবে সংগ্রহ করতে হয় উনাকে। শরীরের ওই জায়গাগুলোতে একেবারে ছাপ পরে গেছে একই পরীক্ষা বারেবার করতে করতে। যতবার মিশন থেকে ফিরেছি, ততবার একই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। আমি ধৈর্য্য ধরে বসে থাকি। এমনি এমনি মেন্টর আমাকে লক্ষী মেয়ে বলেন না।

বেশকিছুক্ষণ পরে মেন্টর আমাকে বললেন, "লিলিথ, দেখি রেডি হও।"

আমার নির্বিকার ভাব আর থাকলো না। এই শেষধাপ আসলেই খুব কষ্টের, আমার মস্তিষ্কে থাকা প্রত্যেকটা স্মৃতি যত্ন করে মুছে দেওয়া হয়। এই মুছে দেওয়ার প্রক্রিয়া যথেষ্ট ব্যাথা দেয়। মস্তিষ্কের মিশনের স্মৃতি মুছে দেওয়া শেষ করার পরেও আরো অনেকক্ষণ এই বিশ্রী যন্ত্রে আমার মাথাটা বেঁধে রাখেন মেন্টর। অবচেতনভাবেও যেন আমার মাথার ভেতর তথ্যগুলো না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হয়, এই অংশ চলার সময় আমার মাথায় আর মিশনের স্মৃতি থাকেনা। তবে এই ব্যাথা খুব ভালোমতই মনে থাকে, যেহেতু এটা স্মৃতি মোছার পরের ধাপ।

তবু আমি লক্ষী মেয়ের মত সহ্য করি। সহ্য না করে উপায় নেই। হিউম্যানোয়েডদের মস্তিষ্ক তার নিয়ন্ত্রনকারীদের করা প্রোগ্রামের একচুল এদিক ওদিক হতে পারেনা। প্রোগ্রামে মিশন আর তার পরবর্তী প্রতিটা ধাপ পরিস্কার করে লিখে দেওয়া আছে। মেন্টর খুব দুঃখ পান আমার এই সময়ের যন্ত্রণা দেখে। মানুষটার মন নরম। পুরো কাজ শেষ হতে হতে আমার আর চলার শক্তি থাকেনা। কিন্তু আমি চলি, নিজের ঠান্ডা ঘরে ঢুকি। আমাকে চব্বিশ ঘন্টা মনিটর করার জন্য মোট আটটা ক্যামেরা তাক করা থাকে। আমি জানি না কতদিন ধরে আমি এখানে থাকি। অপ্রয়োজনীয় কোনো তথ্য তারা তাদের অতিযত্নের হিউম্যানোয়েডের মস্তিষ্কে গেড়ে রাখবেনা। আগাছার মত উপড়ে ফেলে দেবে।

আমি অবশেষে আমার বিছানায় শুই। ক্লান্তিতে চোখ বুজে যায় আমার।

৩

ধড়াম করে দরজা খোলার শব্দ হলো। আমি চেয়ার থেকে ফিরে তাকালাম। ঘরে যিনি ঢুকছেন তিনি একসময় সেই গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন- যেখানে এখন আমি থাকি। গত তিন সপ্তাহ ধরে আমাকে নতুন টার্গেটের পিছনে কাজ করতে হচ্ছে। আমাকে দুটো কাজ দেওয়া হয়েছে। একটা চিপ সংগ্রহ, আর এই টার্গেটকে মেরে ফেলা। আমি এখন জানি চিপ কোথায় আছে। আজকেই ফাইনাল নক ডাউন।

হন্তদন্ত হয়ে লোকটি আমার সামনে বসলেন। বললেন, “বাজে কথা না বলে সরাসরি জিজ্ঞেস করি। তুমি জানো আমার মেয়ে কোথায়?”

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি। কেমন যেন দেখাচ্ছে তাঁকে। আগে কোনো টার্গেটকে মারার স্মৃতি আমার মাথায় নেই, কিন্তু আমার প্রটোকল অনুযায়ী কাউকে মারার সময় এরকম অদ্ভুত অনুভূতি আসার কথা না। আমি অবাক হই। ব্যাপার কী?

লোকটা অধৈর্য্য হয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, "তুমি জানো? তোমার অফিস থেকে আমাকে বলা হয়েছে তারা আমার মেয়ের খোঁজ পেয়েছে। আমি উনিশ বছর ধরে এদের কাছ থেকে শুধু একটা খবর পাওয়ার জন্যই বসে আছি। আমাকে হতাশ করোনা প্লিজ!”

আমি আমার অনুভূতিকে পাত্তা না দিয়ে টেবিলের ওপরে তাঁর রাখা হাতটা ধরলাম। "আমি বলছি। উত্তেজিত হবেন না।" এরপর টুক করে আমার হাতের নিচে লুকিয়ে রাখা দুই ইঞ্চি লম্বা সিরিঞ্জের কয়েক মিলিমিটারের সুচ তাঁর হাতের কব্জিতে ঢুকিয়ে দিলাম। তিনি বোঝার আগেই তাঁর পুরো শরীর অবশ হয়ে গেলো। শক্তিশালী অবশকারী বিষ ছিলো সিরিঞ্জে।

এরপর টুক করে আমার হাতের নিচে লুকিয়ে রাখা দুই ইঞ্চি লম্বা সিরিঞ্জের কয়েক মিলিমিটারের সুচ তাঁর হাতের কব্জিতে ঢুকিয়ে দিলাম। তিনি বোঝার আগেই তাঁর পুরো শরীর অবশ হয়ে গেলো, শক্তিশালী অবশকারী বিষ ছিলো সিরিঞ্জে।

আমি জানি এই ঘরের চারকোণে চারটি ক্যামেরা আছে। সামনে বসা লোকটি যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সে অবস্থায় ই স্থির বসে- মুখের একটা মাংসপেশীও নড়ছেনা তাঁর। আমি তাঁর হাত ধরা অবস্থাতেই অন্য হাত দিয়ে তাঁর মধ্যমাটার মাঝ বরাবর কেটে ফেললাম।

নিখুঁতভাবে আমাকে এসব কাজ শিখতে হয়েছে। কোনো সমস্যা হলো না। কাটা আঙুল দিয়ে যাতে রক্ত না আসে, তাঁর জন্য সাবধানে বুড়ো আঙুল দিয়ে আমার জামার হাতা থেকে লম্বা করে পাকানো তুলা নিয়ে গেড়ে দিলাম। ক্যামেরা থেকে এখন বোঝা যাবেনা আঙুলের জায়গায় তুলা বসানো। পুরো কাজটা করার সময় অনবরত আমাকে কথা বলতে হচ্ছে। কি কথা বলব তা মেন্টর প্রোগ্রাম করে দিয়েছেন।

“আপনার শরীর অবশ হয়ে গেলেও আপনি আমার প্রত্যেকটা কথা শুনতে ও বুঝতে পারছেন। উনিশ বছর আগে আপনি এবং আপনারই একজন সহকর্মী আপনাদের দেশের সরকারের অত্যন্ত গোপন একটি প্রজেক্টের মূল দায়িত্বে ছিলেন। হিউম্যানোয়েড বানানোর এই প্রজেক্ট আপনারা শেষ করেছেন ঠিক ছয় বছরের মাথায়। আপনাদের নিখুঁত কাজের কারণে একজন মানুষকে খুব সহজেই তার মানবিক অনুভূতি আর গুণগুলো বাদ দিয়ে তাঁর মস্তিষ্ককে ন্যানোটেকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

সরকারের সাথে আপনাদের চুক্তি ছিলো এই প্রযুক্তি আপনি বিনাশর্তে প্রতিরক্ষাবাহিনীর হাতে তুলে দেবেন। বিনিময়ে এর অর্থায়ন করবে সরকার। আপনার সহকর্মী মানুষের শরীরকে হিউম্যানোয়েডের মস্তিষ্কে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিবর্তন আর অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন।

হিউম্যানোয়েডকে কন্ট্রোল, নির্দেশনা দেওয়া, মস্তিষ্ক থেকে ইচ্ছামতো স্মৃতি মুছে দেওয়া, প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রোগ্রাম তৈরি থেকে শুরু করে হিউম্যানোয়েডকে স্বাভাবিক মানুষের মতই আচরণ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমটি আপনার তৈরি। কিন্তু প্রজেক্ট শেষ করার পর আপনি বিট্রে করেন। আপনি ভোল পালটে বলে ফেললেন, মানব প্রজাতির ওপর এধরণের এক্সপেরিমেন্ট করা মানবাধিকার লঙ্ঘন। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্ষুদ্রতর স্বার্থের কথা চিন্তা করলে চলেনা। কাজেই আপনি পালিয়ে গেলেন। উনিশ বছর ধরে আপনাকে আপনার দেশের সরকার খুঁজে চলেছে। এই প্রজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ সব রেকর্ড আপনার কাছে। পাশাপাশি আপনার দাঁড় করানো আর্টিফিয়াল ইন্টেলিজেন্সটিও নতুন হিউম্যানোয়েড তৈরির জন্য প্রয়োজন। ল্যাবে আপনার ফেলে আসা ডিভাইসগুলো আপনি পুরোপুরি পরিস্কার করে এলেও তা পূনুরুদ্ধার করা হয়েছে। আপনার সবগুলো ডেটা সংরক্ষণ করার জন্য শক্তিশালী সার্ভার তৈরি করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সমস্যা হলো এটি শুধু একজন হিউম্যানোয়েডের জন্যই কাজ করে। আপনার সহকর্মীর দেওয়া তথ্য অনুসারে এই প্রোগ্রামগুলো হিউম্যানোয়েডের শরীর আর মস্তিষ্কের উপর ভিত্তি করে বানানো হয়। আপনার বানানো আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সটি তাই সেই বিশেষধরণের মানবদেহের ওপরেই কাজ করবে, এরজন্য বেশকিছু ডোনার ও সংগ্রহ করার কাজ চলছিলো। কিন্তু অতিগোপন এই প্রজেক্টের গোপনীয়তা তাতে যথেস্ট হুমকির মুখে পরে। উনিশ বছর আগে প্রতিরক্ষা বাহিনী আপনার স্ত্রী ও আপনার মেয়েকে তাদের জিম্মায় আনে। এরজন্য একটি ট্রেন দুর্ঘটনার নাটক সাজাতে হয়েছিলো অবশ্য। আপনার স্ত্রী না বাঁচলেও আপনার সাত বছরের মেয়ে বেঁচে যায়। গোপনীয়তার স্বার্থে তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া হয় আপনার সহকর্মীর ওপর। বিস্ময়করভাবে তিনি আবিষ্কার করেন আপনার প্রোগ্রাম কাজ করার জন্য যে ধরণের মানবদেহ প্রয়োজন, তা আপনার মেয়ের রয়েছে, হতে পারে আপনি তার কথা মাথায় রেখেই এই প্রোগ্রাম বানিয়েছিলেন। তাকেই পর্যবেক্ষণ করা সবচেয়ে সোজা ছিলো আপনার জন্য। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাকে এই প্রজেক্টের অংশ করে নেওয়া হয়। দীর্ঘ দশ বছরের নিরলস পরিশ্রম শেষে পুরোপুরি তৈরি হয় দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার-হিউম্যানোয়েড রোবট। গত নয় বছর ধরে হিউম্যানোয়েডটি অত্যন্ত সফলতার সাথে তাকে দেওয়া প্রত্যেকটি প্রজেক্ট সম্পন্ন করেছে। শত্রু দেশ থেকে অতি গোপনীয় তথ্য এনে দেওয়া থেকে শুরু করে জঙ্গিবাদী কার্যক্রম থামিয়ে দেওয়া-সব কাজেই সে সফল হয়েছে। তার মেন্টর হিসেবে কাজ করেছেন আপনারই বন্ধু সহকর্মী। উনিশ বছর পর অবশেষে আপনাকে ট্রেস করতে পেরেছে প্রতিরক্ষাবাহিনী।

আপনার শরীরে যে অবশকারী তরলটি দেওয়া হয়েছে, তা আপনার রক্তের সাথে বিক্রিয়া করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে মেরে ফেলবে। দেশদ্রোহিতা করার অপরাধে আপনাকে অনেক আগেই মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর আগে আপনার শেষ ইচ্ছা পূরণ করা হয়েছে। আপনি আপনার মেয়ের সাথেই জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো কাটাতে পারছেন। ধন্যবাদ।"

আমার মধ্যে কোনো মানবীয় অনুভূতি নেই। আমার তবু কেমন যেন লাগছে, সামনে বসে থাকা মানুষটার চোখ দিয়ে একফোঁটা জল বেরিয়ে এসেছে। আমি এখনো তাঁর হাত ধরে বসে আছি। ক্যামেরায় নিঁখুতভাবে আমাকে এই পুরো হত্যাকান্ডটিকে স্বাভাবিক কথাবার্তার রূপ দিতে হচ্ছে। কিন্তু আমার কেমন লাগছে কিছুতেই বুঝতে পারছিনা।

"আমার মধ্যে কোনো মানবীয় অনুভূতি নেই। আমার তবু কেমন যেন লাগছে, সামনে বসে থাকা মানুষটার চোখ দিয়ে একফোঁটা জল বেরিয়ে এসেছে। আমি এখনো তাঁর হাত ধরে বসে আছি। ক্যামেরায় নিঁখুতভাবে আমাকে এই পুরো হত্যাকান্ডটিকে স্বাভাবিক কথাবার্তার রূপ দিতে হচ্ছে। কিন্তু আমার কেমন লাগছে কিছুতেই বুঝতে পারছিনা।"

দেশদ্রোহি বিজ্ঞানী অবশেষে মারা গেলেন। তাঁর শরীর স্থির হয়ে বসে আছে এখনো, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনো বড় একটা ব্যাপার হজম না করতে পেরে শক পেয়েছেন। আমি স্বাভাবিকভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠি। অদ্ভুতভাবে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়, লোকটি আমার বাবা? আমি এতক্ষণ যা বলেছি, তা বলার আগ অব্দি আমি কিছুই জানতাম না। পুরোটাই আমার মস্তিষ্কে রাখা প্রোগ্রাম। তাহলে তাঁর সাথে দেখা করার পরে ঐরকম অনুভূতি হলো কেন?

৪

কার্ড পাঞ্চ করে এসে আমি আমার মেন্টরের সামনে দাঁড়ালাম। কেটে আনা মধ্যমাটি তাঁকে দেওয়ার কথা। আঙ্গুলটি নিয়ে তিনি সেইটার হাড়ের ফাঁক থেকে খুব ছোট একটা চিপ বের করলেন। চিপে দেশদ্রোহি বাবার সারাজীবনের কাজ।

আমার মস্তিষ্ক স্ক্যান করে মেন্টর অবাক হয়ে গেলেন।

“লিলিথ, তোমার ব্রেইন তো দেখি আজকে অন্যরকম ফাংশান করেছে। ব্যাপার কী?”

"আমি জানিনা মেন্টর। আমার কেমন যেন লাগছিলো পুরো সময়টা। মনে হচ্ছিলো টার্গেটকে ক্লিয়ার না করি।"

মেন্টর স্ক্যান শেষ করে কাগজগুলো হাতে নিয়ে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নয় বছর পর প্রতিরক্ষাবাহিনীর যত্নের হিউম্যানোয়েডটি আচমকা প্রটোকল আর প্রোগ্রামের বাইরে গিয়ে নিজের পিতার প্রতি মানবীয় অনুভূতি দেখিয়েছে। তাঁর ফাংশনে গন্ডগোল দেখা যাচ্ছে। হিউম্যানোয়েডটির ভেতর থেকে মানুষ বের হয়ে আসা কোনো কাজের কথা নয়।

মেন্টরের সাথে আজকেও বেশ কজন মানুষ বসে আছেন। তারা তাঁকে কি যেন নির্দেশ দেন। মেন্টর মাথা নেড়ে যায় দেয়। উনি এসে আমাকে বলেন, “তুমি তৈরি?”

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই। আমি সবসময়ই তৈরি। প্রোগ্রাম চালু করার অপেক্ষা শুধু।

সেলফ ডিস্ট্রাকশন মোডে আমাকে নিজের দাঁতের তলে থাকা এম্পুলটি ভেঙে ফেলতে হলো। সাথে কানের পিছন থেকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে চালু করতে হলো আমার মাথার চামড়ার নিচে থাকা বিস্ফোরক। আমার কোনো অনুভূতি নেই। আমার ভয় ও লাগছেনা। তবে মুক্তি পাচ্ছি ভেবে হালকা লাগছে।

এম্পুল থেকে সায়ানাইড বের হয়ে আমার রক্তে মিশতে শুরু করেছে। আমি অপেক্ষা করতে থাকি কখন কাউন্ট ডাউন শেষ হয়ে আমার খুলি উড়ে যাবে।

হৃদিকা বিশ্বাস,
দ্বাদশ শ্রেণি, চট্টগ্রাম কলেজ।

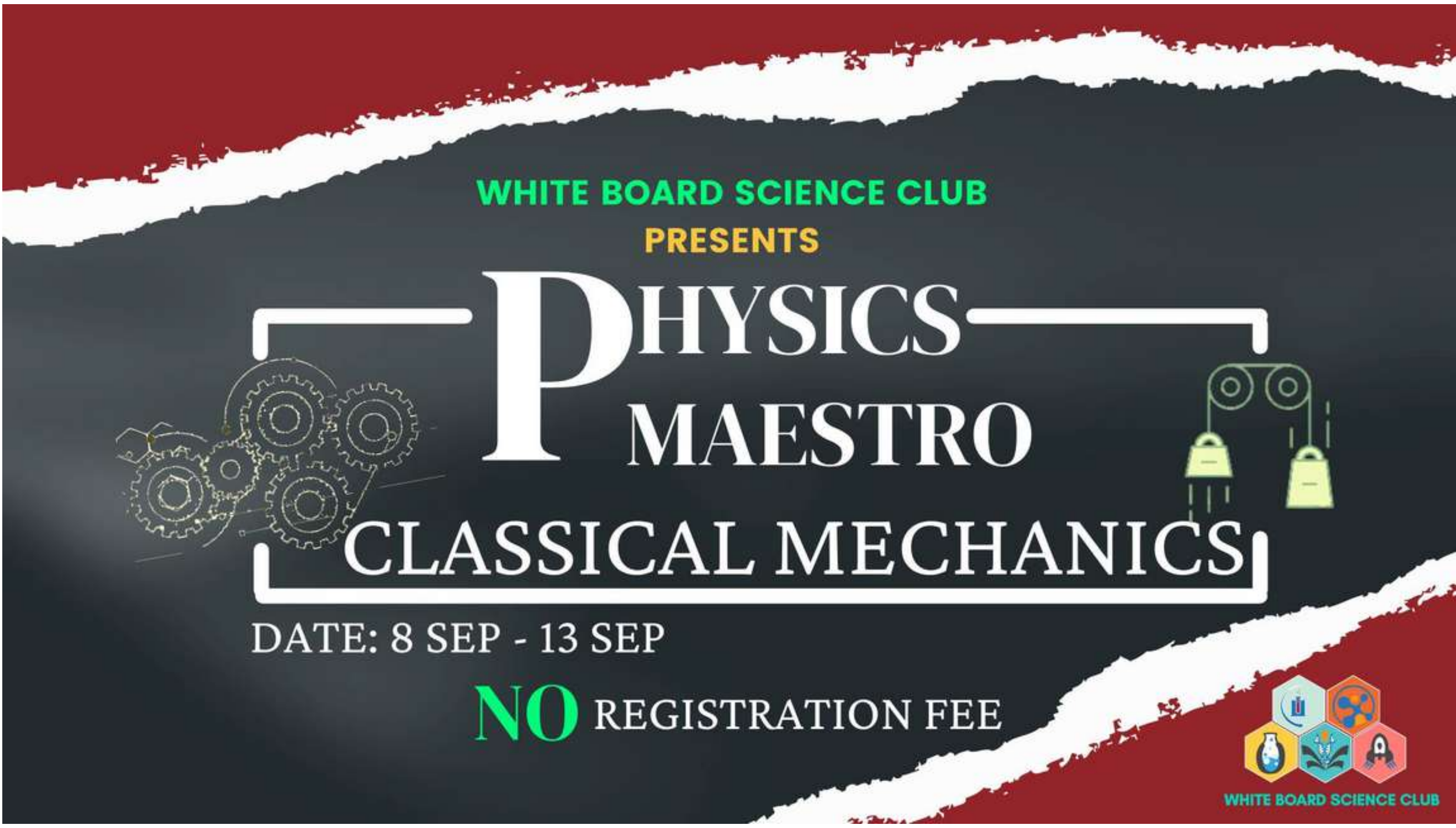
WHITE BOARD SCIENCE CLUB
PRESENTS
PHYSICS MAESTRO
CLASSICAL MECHANICS
DATE: 8 SEP - 13 SEP
NO REGISTRATION FEE
WHITE BOARD SCIENCE CLUB

সার্স কোভিড-২ (C.1.2)

দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন করোনা ভাইরাস বৈকল্পিক শনাক্তকরণ!

সময়ের প্রভাবে ভাইরাসের সংক্রমণ যেমন বাড়ে, তেমন বদলে যায় এর স্বভাব; এর ধরনও। সার্স-কোভিড-২ এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নয়। ২০২০ সালের শুরুর দিকে এই ভাইরাসটি প্রথম চিহ্নিত করা হলেও এ পর্যন্ত এটির হাজার হাজার মিউটেশন হয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিশেষজ্ঞরা সার্স-কোভিড-২ কতটুকু এবং কীভাবে বদলাচ্ছে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাহলে এই যে ভাইরাসটির নতুন নতুন ধরন ছড়িয়ে পড়ছে, তা নিয়ে আমাদের কতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত?

সম্প্রতি কোভিড-১৯ এর নতুন একটি স্ট্রেইনের সন্ধান পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকায় যা সার্স কোভিড-২ (C.1.2) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এটি এখনও সংক্রামক কিনা বা ভ্যাক্সিন বা পূর্বের সংক্রমণের দ্বারা প্রদত্ত অনাক্রম্যতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম কিনা তা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর মিউটেশন অধ্যয়ন চলছে।

রান্নাঘরের জাদুর কাঠি করছে না তো স্বাস্থ্যহানি !!

সাধারণ এক গৃহিণী আফিয়া বেগম। রান্নার প্রতি পদে তার হাতের জাদু দেখে মুগ্ধ সকলে তার রান্নার অঢেল প্রশংসা করে। কিন্তু এতো ব্যস্তজীবনে খুব তাড়াতাড়ি রান্না করা, খাবার গরম করা, বেকিং করা একটুখানি সময়ের ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানের কিছু আধুনিকতার ছোঁয়া তার রন্ধনশালায় যেন উঁকি দিচ্ছে।

একটি মাইক্রোওভেন এর ভারি প্রয়োজন অনুভব করছেন সেই কবে থেকে। কিন্তু অতি আধুনিক হতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্যের ই ক্ষতি করছি না তো!! এই শঙ্কা যে তার পিছু ছাড়েনা। এমন শঙ্কা আমাদের সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের। বিশেষ করে তা যখন আবার আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। চলুন জেনে নেওয়া যাক।

মাইক্রোওভেন নিয়ে এই শঙ্কা কতখানি সত্য?

মাইক্রোওভেন এর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যঝুঁকি ব্যাপারটি এর কাজ করার মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল। সাধারণ ওভেন বিকিরণ নিয়ে কাজ করে আর সাধারণত মাইক্রোওয়েভ ওভেন এ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে কাজ করে।এই যন্ত্রে মাইক্রোওয়েভ বা অতি ক্ষুদ্র কম্পাঙ্কের তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ ব্যবহার করে খাদ্যবস্তুকে উত্তপ্ত করা হয়।এটি মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ ব্যবহার করে খাদ্যবস্তুর অভ্যন্তরীণ পোলারাইজড অণুগুলোকে উত্তপ্ত করে, ফলে সম্পূর্ণ খাদ্যবস্তুটি গরম বা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

জার্মানির আখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা ড্রিসেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ বা ক্ষেত্রের সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিয়ে সব গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি বলেন, ‘‘মাইক্রোওয়েভ ওভেন মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, এমন কোনো গবেষণার ফলাফলের কথা আমার জানা নেই।

তবে মনে রাখতে হবে, মাইক্রোওয়েভ ওভেনের তরঙ্গ নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমিত রাখতে হয়। সেই নিয়ম মানা হচ্ছে, সেটা ধরে নিয়েই মূল্যায়ন করা হয়।’’ মাইক্রোওয়েভ ওভেন এর ব্যবহারের মাত্রা গুণোত্তর হারে বর্ধিষ্ণু। এক সমীক্ষায় জানা যায়, জার্মানির ৭০ শতাংশ সংসারেই রান্নাঘরে মাইক্রোওভেন আছে।

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যতটা মোবাইল ব্যবহারকারীদের ক্ষতি করে ততটা ওভেনে তৈরী খাবার করেনা। তাই মাইক্রোওয়েভ ওভেন এ তৈরী করা খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ততটা ও হানিকর নয়। সাধারণত খাবার কলুষিত করে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা এক্সরে। কারণ তাদের বিকিরণ আয়নাজিং। কিন্তু মাইক্রোওয়েভ ওভেন এ তৈরী করা খাদ্যে তেমন ক্ষতিকারক আয়নাজিং লক্ষ্যণীয় নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে,

ওভেনে তাজা খাদ্য রান্না করা কতটুকু স্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর??

এই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ উত্তর পাওয়া যায় ভোক্তা সুরক্ষা তথ্য পরিসেবার প্রতিনিধি "উটে গম" থেকে। তাদের মতে, ওভেনে তাজা খাদ্য যেমন- ব্রকোলি যদি রান্না করা হয়, তবে তার মধ্যে থাকা ফটোকেমিক্যাল যা আমাদের কে ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে ধ্বংস হয়ে যায়।অর্থাৎ এটি পরোক্ষ ভাবে আমাদের ক্যান্সার এর দিকে ধাবিত করে।আবার এমন কিছু ফলমূল সবজি আছে যা ওভেনে রান্না করলে তার খাদ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

এছাড়া মাইক্রোওয়েভ এর বিকিরণটি শরীরের টিস্যুকে গরম করতে পারে যেমন এটি খাবার গরম করে তাই এরফলে ত্বকের টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উচ্চ মাত্রার মাইক্রোওয়েভের এক্সপোজারে বেদনাদায়ক জ্বলন হতে পারে।

চোখের লেন্সগুলি তীব্র উত্তাপের জন্য উচ্চ মাত্রার মাইক্রোওয়েভগুলির সংস্পর্শে ছানি বা ছত্রাক হতে পারে।কোন কোন ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েব ওভেন থেকে উৎপাদিত ২.৪৫ গিগাহার্টজ এর তরঙ্গ তিন ফুট দুরুত্বের মধ্যে শরীরে লাগলে ত্বকের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মাইক্রোওভেনে রান্না, বেকিং এর সময় আমরা যদি কিছু বিষয় এড়িয়ে চলি তবে এর ব্যবহার আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে।

32: 14
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
Start
Cancel

নিম্নোক্ত কিছু বর্জনীয় বিষয় চলুন জেনে নেওয়া যাক-

★ রেস্তোরাঁ থেকে আনা ডিপ ফ্রাই করা খাবার পুনরায় ওভেন এ দেওয়া যাবেনা এতে করে এর মধ্যে থাকা ট্রান্স ফ্যাটি এসিড আর ও ক্ষতিকর হয়ে উঠে।

★ ওভেনে কোনোভাবেই দুধ গরম করা যাবেনা কারণ দুধ মূলত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ আর ওভেন এ গরম করার সময় এর গাঠনিক একক অ্যামিনো এসিড বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়।

★ মাংস রান্না বা গরম করার সময় এর মধ্যে থাকা অ্যামিনো এসিড ওভেনের পাল্লায় পড়ে ডি-নাইট্রোসোড এন্থানল অ্যামিনোস নামক বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যে পরিণত হয়।

★ ডিপ ফ্রিজে রাখা রান্না করা সবজি ওভেন এ রান্না করা হলে এর মধ্যে থাকা প্ল্যান্ট অ্যালকয়েড নষ্ট হয়ে যায়।

★ ওভেন এ খাবার রান্না করলে এর মধ্যে থাকা ভিটামিন -বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন-সি,ই সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট নষ্ট হয়ে যায়।

★ প্রতিনিয়ত ওভেনে রান্না করা খাবার খেলে লসিকাগ্রন্থির কার্যক্ষমতা কমে যায়। ফলে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে অনিদ্রা,উচ্চচাপ,বদহজম ইত্যাদি শারীরিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়

★এটি দেহে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল তৈরি করে যা দেহে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়াতেই থাকে। তবে গবেষকেরা সর্বদা ওভেন এ খাবার গরম করা কে সাধুবাদ জানালে ও খাবার রান্না করা কে তেমন গ্রাহ্য করেনা।

সাধারণত প্রতিটি আধুনিক যন্ত্রের ই সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধা থাকেই। সবকিছুর সাথে তাল মিলিয়েই আমরা বিজ্ঞানের আশীর্বাদপুষ্ট ফল কে গ্রহণ করি। কিন্তু এই অসুবিধা যেন কখনোই আমাদের জীবন কে ছাপিয়ে উঠতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েই আফিয়া বেগম সহ সকল রাঁধুনি কে আধুনিক সাহায্যকারী এই যন্ত্র নির্বাচনে হুশিয়ার হতে হবে। এবং মাইক্রোওভেন সহ সকল যন্ত্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নিয়েই তা ব্যবহার করবে কি করবেনা তার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমেই নিজ জীবনে আধুনিকতা কে সাদরে গ্রহণ করতে হবে!!

★ boldsky.com
★ ekushey
★ www.fda.gov
[Microwave Oven Radiation]

কলমেঃ-

জি.এম.আফরোজা সুলতানা মনি
ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

হাসপিয়াত তোরাবী
বাকলিয়া সরকারি কলেজ

গ্রিন টি কি সত্যিই ওজন কমায়?

আজকাল দেখা যায় সকালবেলা ঘন দুধ চা এর ধোঁয়া ছাড়া অনেকেরই ঘুম কাটতেই চায় না। বন্ধুমহলে কিংবা ঘরোয়া আড্ডায়ও চায়ের জুড়ি নেই। মূলত চা এক বেলা না হলেই দিনটাই ক্লান্তিময় হয়ে উঠে। কিন্তু যারা এনার্জি পাওয়ার জন্য চা খেতে ব্যস্ত তারা কি আদৌ শরীরের এনার্জি বাড়াচ্ছে নাকি আরো শরীরের ওজন বাড়িয়ে ক্ষতি বয়ে আনছে নিজ অজান্তেই? শরীরে চাঙ্গাভাব নিয়ে আসার পাশাপাশি ওজন কমাতে একটি স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসেবে গ্রিন টি-র প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

ওজন কমানোর খাদ্যের পরিপূরক হিসাবে গ্রিন টি পান করতে পারেন। তবে ব্যায়াম এবং গ্রিন টি পান একসঙ্গে চালিয়ে গেলে ওজন কমবে দ্রুত হারে।

বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি পান করা পানীয় গ্রিন টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ যৌগের পুষ্টিতে ভরপুর যা আমাদের শরীরের উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। গ্রিন টি শরীরের হজম প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ করে ক্ষুধা লাগার অনুভূতি হ্রাস করে ওজন কমাতে সহায়তা করে। গ্রিন টিতে উপস্থিত ক্যাটেচিন নামক এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পেটের মেদ ঝরাতে জোরালো ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে গ্রিন টি পান করার ফলে মানবশরীরের অস্বাস্থ্যকর পেটের চর্বি গলে যায়। গ্রিন টি পান করলে শরীরের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে থাকে।

Source:

★ www.healthline.com
[How Green Tea Can Help You Lose Weight?]

★ www.medicalnewstoday.com
[Does green tea help weight loss?]

তাপ বাড়ার ফলে শরীর থেকে ক্যালরি খরচ হয় যা আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। তাই অতিরিক্ত ওজন কমাতে নিয়মিত গ্রিন টি খেতে পারেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে আপনার স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং ব্যায়ামের বিকল্প হিসাবে গ্রিন টি পান করা উচিত।সেরা ফলাফলের জন্য, আপনি আপনার ওজন কমানোর খাদ্যের পরিপূরক হিসাবে গ্রিন টি পান করতে পারেন। তবে ব্যায়াম এবং গ্রিন টি পান একসঙ্গে চালিয়ে গেলে ওজন কমবে দ্রুত হারে। ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারের মতে, ওজন কমানোর জন্য আপনাকে প্রতিদিন ২-৩ কাপ গ্রিন টি পান করতে হবে। এটি অনুমান করা হয় যে ১ কাপ গ্রিন টিতে প্রায় ১২০ থেকে ৩২০ মিলিগ্রাম ক্যাটেচিন এবং ১০ থেকে ৬০ মিলিগ্রাম ক্যাফিন থাকে, যদিও এটি আপনি কীভাবে চা পান করেন তার উপর নির্ভর করে।

ইদানীং ওজন নিয়ন্ত্রণে অনেকেই গ্রিন টিকে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখতে পছন্দ করেন। তবে যখন তখন গ্রিন টি খেলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। যেমন খাবার খাওয়ার আগে বা পরে গ্রিন টি খেলে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে গ্রিন টি খেলে আপনার ঘুমের বারোটা বেজে যাবে। তাই গ্রিন টি থেকে উপকার পেতে হলে সঠিক সময় পরিমাণ মতোই খাওয়া উচিত।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে গ্রিন টি খেলে আপনার ঘুমের বারোটা বেজে যাবে।

হিমাদ্রী দে
চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ

হালিমা ইফফাত সামিয়া
সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

“ভরা পেটে ফল, খালি পেটে জল"– প্রবাদটি আদৌ কতটুকু কার্যকরী?

সামিন তারা বাবা থেকে রোজ সকালে উঠে খালি পেটে পানি পানের উপদেশ সেই ছোটো বেলা থেকেই শুনে আসছে। তার বাবার মতে, খালি পেটে সকালে এক গ্লাস পানি পান করলে শরীর নিরোগ থাকে, সারা দিনের কাজের স্ফূর্তি পাওয়া যায়। আবার ওইদিকে ঠাম্মার মুখে শুনেছে সে খালি পেটে নাকি ফল খাওয়া উচিত নয়। সামিন ভাবতে থাকে তার বাবা ও ঠাম্মার কথা আসলে কতটুকু সত্যি!! আচ্ছা আমরাও কি সামিনের মতো কখনো ভেবে দেখেছি যে, "ভরা পেটে ফল আর খালি পেটে জল"– এই কথাটি কতটা অর্থবহ ও স্বাস্থ্যসম্মত?

সবাই আজকাল সকালের খাবারে ফল খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে কেন!! এমন পরামর্শ দিচ্ছে কারণ সত্যিকার অর্থে দিনের শুরুটা যদি ফল দিয়ে করা যায়, তাহলে দারুন উপকার মেলে। বিশেষত ঘুম থেকে উঠে যদি এক গ্লাস তরমুজের রসের সঙ্গে অল্প করে লেবুর রস মিশিয়ে খাওয়া যায়, তাহলে তো কথাই নেই! সেক্ষেত্রে শরীর একেবারে চনমনে হয়ে উঠার পাশাপাশি নানাবিধ রোগের আশঙ্কাও হ্রাস পায়। তবে প্রশ্নটা হলো আসলেই কি সকালের খাবারের তালিকায় অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল থাকলে কি কোনও উপকার মেলে? চলুন জেনে নেই!!

১. শরীরকে বিষ মুক্ত করে:

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে আপনি যদি সকাল ৭-১১ এর মধ্যে এক বাটি ফল খান তবে আপনার শরীর থেকে বেশি মাত্রায় বিষাক্ত উপাদান বের হয়ে আপনাকে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকেরক্ষা করে। কারণ এই সময়টাতে শরীর নিজের মধ্যে জমে থাকা টক্সিক উপাদানসমূহ বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়া চালায়।

২. উপোসের পরে ফল মাস্ট!

সারা রাত উপোস থাকার পর যারা সকাল বেলা ফল দিয়ে দিনটা শুরু করেন তাদের বদহজম বা গ্যাস-অম্বলের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়।

৩. শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়:

ফলের মধ্যে থাকা প্রকৃতিক শর্করা রক্তে মেশার পর শরীরের প্রতিটি অঙ্গের কর্মক্ষমতা বাড়ার পাশাপাশি মস্তিষ্কও সজাগ হয়ে ওঠে। ফলে সার্বিকবাবে শরীরের সচলতা বৃদ্ধি পায়।

৪. ওজন কমে:

ফলের মধ্যে থাকা একাধিক পুষ্টিকর উপাদান একদিকে যেমন শরীরে মজুত টক্সিক উপাদানদের বের করে দিয়ে ওজন হ্রাসের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, তেমনি অনেকক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।

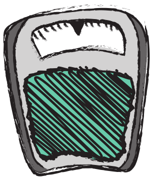

> খালি পেটে সকালে এক গ্লাস পানি পান করলে শরীর নিরোগ থাকে, সারা দিনের কাজের স্ফূর্তি পাওয়া যায়।

৫. রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তোলে:

বেশিরভাগ ফলে উপস্থিত ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য উপকারি উপাদান দেহের মধ্যের শক্তি এতটাই বাড়িয়ে দেয় যে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে।

৬. খালি পেটে ফল খেলে অ্যাসিড হয় না:

“সকাল সকাল ফল খাওয়া মানেই চোরা ঢেকুর আর অ্যাসিডিটির কবলে পরা”

- এমন ধরণার কিন্তু কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। কারণ একাধিক গবেষণায় একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে ফল খাওয়া মাত্র অ্যাসিড হওয়ার কোনও সম্ভাবনা তো থাকেই না। উল্টে শরীরে অ্যাসিড এবং অ্যালকেলাইনের ভারসাম্য ঠিক হতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অ্যাসিডিটি এবং গ্যাস-অম্বলে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে।

৭. হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়:

নিয়মিত খালি পেটে ফল খেলে শরীরে উপকারি ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন এবং খনিজ লবণের মাত্রা বাড়তে শুরু করে, যা খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমানোর পাশাপাশি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়।ফলে স্বাভাবিকভাবেই হার্টের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়।

৮. নানাবিধ পেটের রোগের প্রকোপ কমায়:

ফলের মধ্যে থাকা ফাইবার, শরীরে প্রবেশ করার পর হজমে সহায়ক পাচক রসের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে একদিকে যেমন হজমক্ষমতার উন্নতি ঘটে, তেমনি কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো রোগের প্রকোপ কমতেও সময় লাগে না।

ভারতীয় পুষ্টিবিদ পূজা মখিজার মতে, ভরা পেটে ফল খেলে ফলে থাকা ফাইবার পরিপাক ক্রিয়ায় বাঁধা সৃষ্টি করে, এতে হজমে সমস্যা দেখা দেয়।বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, ভারী কিছু খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ অন্তত বিরতি দিয়ে ফল খাওয়ার। এটিই স্বাস্থ্যসম্মত।

খালি পেটে ফল খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে তো জানলেন এবার খালি পেটে জলের কার্যকারিতা কতটুকু চলুন জেনে নেই!! পানি ও ফল মানবদেহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান। শরীরের সঠিক বিকাশের জন্য সময়মত এদের পেটে দেওয়াও জরুরি। খালি পেটে পানি পানের বিবিধ উপকারিতা রয়েছে!!

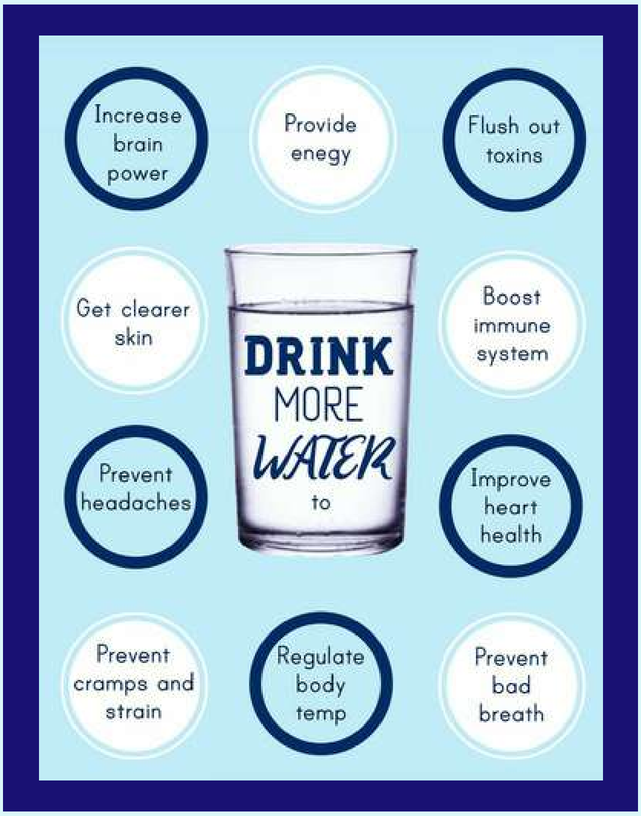
Increase brain power
Provide enegy
Flush out toxins
Get clearer skin
DRINK MORE WATER to
Boost immune system
Prevent headaches
Improve heart health
Prevent cramps and strain
Regulate body temp
Prevent bad breath

১) খালি পেটে ৫০০ মিলি পানি পান করলে বিপাকের (শরীরের ক্যালরি চর্বিতে না আটকে থেকে বার্ন হয়ে যাওয়ার) হার বেড়ে যায়।

২) পানি পানের কারণে পেট ভরা মনে হয়, অতিরিক্ত খাবার গ্রহণে অনীহা জন্মে।

৩) সকালে খালি পেটে পানি পান করলে প্রস্রাবের সঙ্গে দূষিত পদার্থ বের হয়ে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

৪) ঘুম থেকে উঠে পানি পানে মানসিক বিকাশ সাধন হয়, স্মরণশক্তি বাড়ে।

৫) ব্রণ কমাতে সাহায্য করে, ত্বকের শুষ্ক ভাব দূর করে আর্দ্রতা এনে দেয়, ত্বক উজ্জ্বল রাখে।

৬) হজম শক্তি বাড়ায়, ভেতরের অঙ্গকে সুস্থ করে, দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কোষ্ঠকাঠিন্যসহ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি দেয়।

সুতরাং সবশেষে বলা যায় যে, ফল ও জল উভয়ই খালি পেটে খেলেই বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

তথ্যসূত্রঃ *ntv.com, tagbangla.com*

লেখায়ঃ

তাসনিম চৌধুরী আদিবা,
বিএন কলেজ, চট্টগ্রাম

সুহাইলা তাবাসসুম
চট্টগ্রাম কলেজ

মিনহাজুল করিম চৌধুরী
কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ

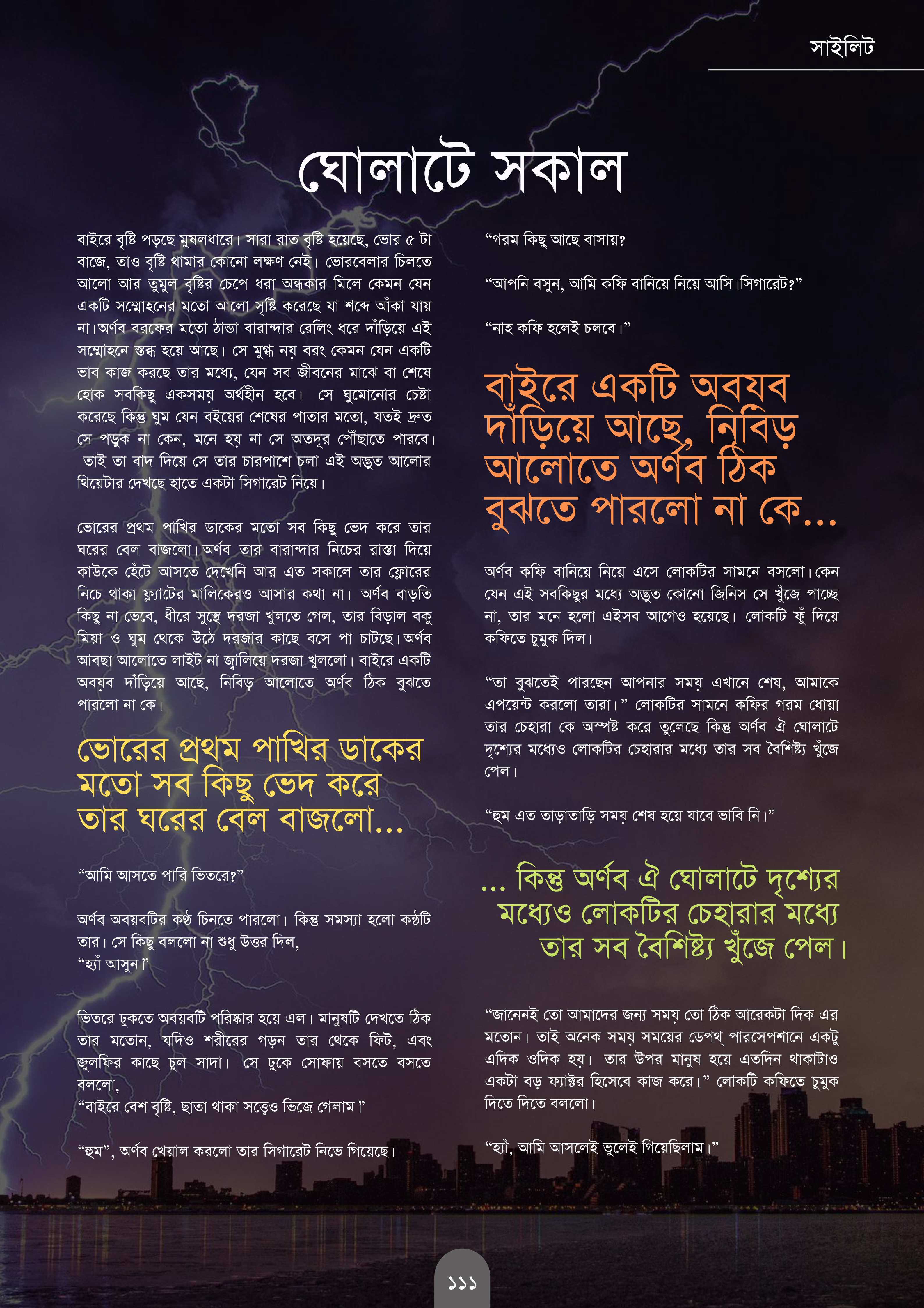

ঘোলাটে সকাল

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে, ভোর ৫ টা বাজে, তাও বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। ভোরবেলার চিলতে আলো আর তুমুল বৃষ্টির চেপে ধরা অন্ধকার মিলে কেমন যেন একটি সম্মোহনের মতো আলো সৃষ্টি করেছে যা শব্দে আঁকা যায় না।অর্ণব বরফের মতো ঠান্ডা বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে এই সম্মোহনে স্তব্ধ হয়ে আছে। সে মুগ্ধ নয় বরং কেমন যেন একটি ভাব কাজ করছে তার মধ্যে, যেন সব জীবনের মাঝে বা শেষে হোক সবকিছু একসময় অর্থহীন হবে। সে ঘুমোনোর চেষ্টা করেছে কিন্তু ঘুম যেন বইয়ের শেষের পাতার মতো, যতই দ্রুত সে পড়ুক না কেন, মনে হয় না সে অতদূর পৌঁছাতে পারবে। তাই তা বাদ দিয়ে সে তার চারপাশে চলা এই অদ্ভুত আলোর থিয়েটার দেখছে হাতে একটা সিগারেট নিয়ে।

ভোরের প্রথম পাখির ডাকের মতো সব কিছু ভেদ করে তার ঘরের বেল বাজলো।অর্ণব তার বারান্দার নিচের রাস্তা দিয়ে কাউকে হেঁটে আসতে দেখেনি আর এত সকালে তার ফ্লোরের নিচে থাকা ফ্ল্যাটের মালিকেরও আসার কথা না। অর্ণব বাড়তি কিছু না ভেবে, ধীরে সুস্থে দরজা খুলতে গেল, তার বিড়াল বকু মিয়া ও ঘুম থেকে উঠে দরজার কাছে বসে পা চাটছে।অর্ণব আবছা আলোতে লাইট না জ্বালিয়ে দরজা খুললো। বাইরে একটি অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে, নিবিড় আলোতে অর্ণব ঠিক বুঝতে পারলো না কে।

ভোরের প্রথম পাখির ডাকের মতো সব কিছু ভেদ করে তার ঘরের বেল বাজলো...

“আমি আসতে পারি ভিতরে?”

অর্ণব অবয়বটির কণ্ঠ চিনতে পারলো। কিন্তু সমস্যা হলো কণ্ঠটি তার। সে কিছু বললো না শুধু উত্তর দিল,
“হ্যাঁ আসুন।’

ভিতরে ঢুকতে অবয়বটি পরিষ্কার হয়ে এল। মানুষটি দেখতে ঠিক তার মতোন, যদিও শরীরের গড়ন তার থেকে ফিট, এবং জুলফির কাছে চুল সাদা। সে ঢুকে সোফায় বসতে বসতে বললো,
“বাইরে বেশ বৃষ্টি, ছাতা থাকা সত্ত্বেও ভিজে গেলাম।’

“হুম”, অর্ণব খেয়াল করলো তার সিগারেট নিভে গিয়েছে।

“গরম কিছু আছে বাসায়?

“আপনি বসুন, আমি কফি বানিয়ে নিয়ে আসি।সিগারেট?”

“নাহ কফি হলেই চলবে।”

বাইরে একটি অবযব দাঁড়িয়ে আছে, নিবিড় আলোতে অর্ণব ঠিক বুঝতে পারলো না কে...

অর্ণব কফি বানিয়ে নিয়ে এসে লোকটির সামনে বসলো।কেন যেন এই সবকিছুর মধ্যে অদ্ভুত কোনো জিনিস সে খুঁজে পাচ্ছে না, তার মনে হলো এইসব আগেও হয়েছে। লোকটি ফুঁ দিয়ে কফিতে চুমুক দিল।

“তা বুঝতেই পারছেন আপনার সময় এখানে শেষ, আমাকে এপয়েন্ট করলো তারা।” লোকটির সামনে কফির গরম ধোয়া তার চেহারা কে অস্পষ্ট করে তুলেছে কিন্তু অর্ণব ঐ ঘোলাটে দৃশ্যের মধ্যেও লোকটির চেহারার মধ্যে তার সব বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল।

“হুম এত তাড়াতাড়ি সময় শেষ হয়ে যাবে ভাবি নি।”

... কিন্তু অর্ণব ঐ ঘোলাটে দৃশ্যের মধ্যেও লোকটির চেহারার মধ্যে তার সব বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল।

“জানেনই তো আমাদের জন্য সময় তো ঠিক আরেকটা দিক এর মতোন। তাই অনেক সময় সময়ের ডেপথ্ পারসেপশানে একটু এদিক ওদিক হয়। তার উপর মানুষ হয়ে এতদিন থাকাটাও একটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।” লোকটি কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললো।

“হ্যাঁ, আমি আসলেই ভুলেই গিয়েছিলাম।”

“সমস্যা নেই, অনেকে আছেন এমন অনেকদিন থাকতে থাকতে ভুলে যান, তবে এখন আই গ্যেস আপনার কাছে ক্লিয়ার সব?” কফির কাপ টেবিলে রাখলো লোকটি, কাঁচের টেবিলে হওয়াতে অল্প শব্দ হলো। “আহ ভুলেই গিয়েছিলাম আমি এটা বেলজিয়াম গ্লাস, থাক কাপটি হাতেই রাখি আমি”

অর্ণবের মনে পড়লো এই দামী টি টেবিলটি সে বেশ ভালো টাকা দিয়ে কিনে এনেছিল তার ইউরোপ টুরের সময়। সে জিজ্ঞেস করলো না লোকটি কিভাবে জানে এটি, কেননা জিজ্ঞেস করাটা পয়েন্টলেস, তারা একই মানুষ।

“হ্যাঁ ক্লিয়ার।” অর্ণব একটু থেমে বললো, “কবে জয়েন করবেন আপনি?”

“পারলে এখনই। আপনি জানেনই তো তারা খুবই পাংকচুয়াল এইসব ক্ষেত্রে। তার উপর আমার মনে হয় আপনি ফেরত গেলে আপনাকে একটা ভালো রিটারায়িং পার্টি দিবে ওরা।তাই এখনই করলে ভালো”, লোকটি ক্ষীণ হেসে বললো।

অর্ণব দুইজন থেকে কফির কাপগুলি নিয়ে সিংকে রেখে এসে বসলো না আর। দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, “তাহলে উঠি আমি?”

লোকটি তার দিকে একটি কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললো, “আপনার রিটায়ারিং স্লিপ।”

অর্ণব কাগজটি নিয়ে তার ঘরের দিকে একবার তাকালো।বকু মিয়া সোফার নিচে আবার ঘুম দিয়েছে।সে তার দিকে আরেক নজর তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বাইরে এখনো বৃষ্টি পড়ছে। অর্ণব তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হাঁটার পরেও তার খারাপ লাগছে না। বৃষ্টির পানি তার শরীর বেয়ে নামার সময় তার এই পৃথিবী তে উপভোগ করা সব অনুভূতির কথা মনে পড়ছে। একটু আগে যে মনে হচ্ছিল কিছুই যায় আসে না, এখন তার মনে হচ্ছে, দরকার নেই তো পুরো জীবনের একটি অর্থ থাকা। এই যে বৃষ্টি তার শরীরে নদীর মতো বেয়ে চলেছে, এই যে ঠান্ডা বাতাস তার শরীরের কাঁপুনি ধরাচ্ছে, এই যে কাঁদা পানি তার জুতোর মধ্যে ঢুকছে এই সবই তো যথেষ্ট। আলোর এখনও চলতে থাকা অদ্ভুত থিয়েটারের নিচে বৃষ্টির তৈরি করা অস্পষ্টতাই অর্ণব হেঁটে যাচ্ছে এবং এই নাট্যমঞ্চেই একসময় সে মলিন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ফয়সাল মাহমুদ চৌধুরী
দ্বাদশ শ্রেণী,
চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ।

WHITEBOARD SCIENCE CLUB presents
FLASHBACK TO
MICHAEL FARADAY
BATTLE OF INFORMATION
AN ARTICLE WRITING CONTEST
NO REGISTRATION FEE
EXCITING OPPORTUNITIES FOR THE WINNERS
12 WINNER SELECTION
OPEN FOR ALL AGE
DEADLINE: 8 SEPTEMBER, 2021

হোয়াইটবোর্ড এর মেটামরফোসিস

২০২০ সালে হোয়াইটবোর্ড এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি ফেসবুকে ছোট্ট একটা পোস্ট দিয়েছিলাম ঠিক এভাবে,

"বিকাল নামতো আমাদের শহরে, আর টেম্পু থেকে নামতো কিছু কৈশোর এর শেষ প্রান্তে থাকা ছেলেপিলে।

এই কিশোরদের চোখে চকবাজারের পরিবর্তন, আমাদের শহরের সিভিল সোসাইটির ফাঁপা বুলি, আর ব্যাগ ঝুলিয়ে একের পর এক স্যার থেকে স্যারান্তরে কোনো স্বপ্ন ছাড়া, উদ্দেশ্য ছাড়া হেঁটে বেড়ানো নিয়ে ছিল প্রবল অস্বস্তি।

তারপর একটা খুঁটি গেড়ে ফেলতেই শুরু হয় প্রতিবন্ধকতা। আসলে কাপড়ের দেয়াল তুললে যেমনটা হয় আরকি।

সবকিছু কাটিয়ে White Board Science Club এখন একটা সুন্দর প্লাটফর্ম । ভালবাসা।

জানি, কিছু বছর পর আমরা কেউই এখানে থাকব না। মহীনের ঘোড়াগুলির মত। আর কেউ নতুন স্বপ্ন বুনবে, আর কেউ এসে ধরবে এই অরুণাচল।

কিন্তু ওই যে জীবনসায়াহ্ন নামে একটা জিনিস আছে, কোনদিন সে বয়সে উপনীত হলে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কিভাবে কাটিয়েছিলাম জীবনের দূরন্ত সময়গুলো?

সুন্দরভাবে উত্তর দিতে পারব।"

হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবকে নিয়ে এর চেয়ে ভালভাবে আমি বলতে পারব না।

অবশ্য, মানুষ যেভাবে প্রতিনিয়ত তার ভিতরে পরিবর্তন করতে ভালবাসে সেভাবে আমিও ওই পোস্ট এর সব কথার সাথেই একমত এখন আর নেই।

Chittagong Biotechnology Summer Schooling 1.0

হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব এর সৃষ্টিলগ্ন যদি ভাবতে হয় তবে ঠিক ওই সময়টায় একবার ফেরত যেতে হবে। সন ২০১৭। ঠিক সেসময়কার কিশোরদের ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে সবকিছু খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে। আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিলাম কিভাবে বিকাল নামলেও কেউ আর খেলার মাঠে ছুটছে না; হয় এদিক-ওদিক আড্ডা, নয়তো স্মার্টফোনে গেমস । কোনোটাই খারাপ না। খারাপ হলো ওই স্মার্টফোনেই স্ক্রল করতে করতে দেখতে পেতাম কিভাবে আমাদের এই শহরের ইয়ং জেনারেশন পিছনে পড়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ঢাকার একেকটি বড় বড় সায়েন্স কার্নিভ্যাল, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইন্ডিভিজুয়াল একেকটি চমকপ্রদ আয়োজন আমাদের চোখে তাক লাগিয়ে দিচ্ছিলো। আমাদের এখানে সে অনুপাতে কিছু হওয়া তো দুরের কথা, সেসব প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েও খুব বেশি সুবিধা করতে পারছিল না তেমন কেউ। (অবশ্য, সে সময়েও চট্টগ্রামে ম্যাথ সার্কেল ম্যাথ অলিম্পিয়াড আর প্রবলেম সলভিংয়ে যা অবদান রেখে চলেছিল তা এক কথায় অনবদ্য)। আমাদের কেবল মনে হচ্ছিলো এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। আমাদের কিছু করা উচিত। কি করব জানি না, কিন্তু কিছু করা উচিত। ঠিক সে সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম মেশিন ল্যাংগুয়েজ আর রোবটিক্স এর একটা ঢেউ আসছে। আমরা সেই ঢেউ টাকে ধরতে চাইছিলাম। বুঝতে পারছিলাম সবাই সে ঢেউটা দেখতে পাচ্ছিলো। কেউ একজনকে কেবল শুরু করতে হচ্ছিল।মুশফিক নামে একজন ছিলো আমাদের গ্রুপে। সে নাম

মুশফিক নামে একজন ছিলো আমাদের গ্রুপে। সে নাম দিলো হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব। নাফিস রায়হান মত দিলো হোয়াইটবোর্ড এর প্রথম প্রয়াস হওয়া উচিত রোবটিক্স স্কুল। আমাদের সেদিন থেকে পথচলা শুরু...

WHITE BOARD SCIENCE CLUB

দিলো হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব। নাফিস রায়হান মত দিলো হোয়াইটবোর্ড এর প্রথম প্রয়াস হওয়া উচিত রোবটিক্স স্কুল। আমাদের সেদিন থেকে পথচলা শুরু...

হোয়াইটবোর্ডটা মুশফিকের প্রস্তাবনা ছিল। কিন্তু নামটা হোয়াইটবোর্ড কেন দিব? আমি আর মাহির ভেবে দেখলাম হোয়াইটবোর্ড এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এখানটায় সবকিছু এক্সপেরিমেন্টালি লেখা যায়। ভুল গুলো মুছে ফেলা যায়। তারপর ঠিকভাবে আবার লেখা যায়। এটাই সে সময়ে আমাদের প্রয়োজন ছিল। আমাদের প্রয়োজন ছিল একটা প্লাটফর্ম এর, যেখানে আমরা আমাদের সব বুনন করা পরিকল্পনাকে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো । আবার শুধরাতে পারব সকল ভুল। নাম নাহয় ঠিক হলো। রোবটিক্স স্কুল যে চালু করব তার জন্য জায়গা কই? খরচাদি কই? আর ট্রেনারই বা পাব কোথায় যেখানে রোবটিক্স এর কনসেপ্টই এই অঞ্চলে তুলনামূলক নতুন। অর্থাৎ পথচলার শুরুতেই আমরা অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলাম।

হোয়াইটবোর্ড এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এখানটায় সবকিছু এক্সপেরিমেন্টালি লেখা যায়। ভুল গুলো মুছে ফেলা যায়। তারপর ঠিকভাবে আবার লেখা যায়। এটাই সে সময়ে আমাদের প্রয়োজন ছিল।

এর ক্লাসরুম পেলাম। অনিক সরকার ভাই, কিঞ্জল বড়ুয়া ভাই, রিয়াদ আশরাফ ভাই, মিনহাজুল ইসলাম রিয়াম ভাই আর সাকিব আবরার ভাইকে ম্যানেজ করলাম কোর্স এর ট্রেনার হিসেবে। তাদের ম্যানেজ করতে মাহির আজরফ এর ছোটাছুটি আমার চোখের সামনে ভাসে আজো। একদিকে দেশসেরা ট্রেনারগুলো, অন্যদিকে রোবটিক্স এর মতো ক্রেজ উঠা কনসেপ্ট। যা হবে ভেবেছিলাম তাইই হলো। প্রথম ক্লাসেই উপচে পড়া ভীড়। আমরা জায়গা দিতে পারছিলাম না এত বেশি মানুষকে।

হোয়াইটবোর্ড এর প্রথম ক্লাস, তাতে এত বেশি ভীড় সামাল দিতে আমরা আসলেই প্রস্তুত ছিলাম না। অনিক ভাই, কিঞ্জল ভাই, রিয়াদ ভাইদের এত বেশি সহযোগিতা; রিয়াম ভাই আর সাকিব ভাইদের সারাদিন আমাদের এত এত বিরক্তি সহ্য করা আমাদেরকে একটি শুভসূচনা এনে দিয়েছিল। আমরা তারপর পুরো কোর্সটিই বিনামূল্যে করাই। মাহির স্কলারশিপের টাকা পেয়েছিল, আর আমার জমানো টাকা ছিল। সেটা দিয়েই আরডুনো কেনা থেকে শুরু করে প্রজেক্টর ভাড়া, সবকিছুর সামাল দিচ্ছিলাম। বাকি এক্সিকিউটিভরাও নিজেদের সাধ্যমতো এগিয়ে এসেছিল। ওয়ালিদ, আওসাফ, সামিল, নকীব, আদিলদের কথা না বললেই নয়। এখন এসে মনে হয়, বিনামূল্যে করার সিদ্ধান্তটা কিছুটা হলেও ভুল ছিলো। প্রথমতঃ অনেকেই শেষ অবধি একাগ্রতা ধরে রাখতে পারেন নি, সিরিয়াসনেস এর অভাব ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমরাও অনেকক্ষেত্রেই যথাযথ ফোকাস দিতে পারিনি।

অবশ্য, সে সময়ে চট্টগ্রামের অবস্থা এমন ছিল যে রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে অভিভাবকরা কখনোই কোচিং-প্রাইভেট বাদ দিয়ে রোবটিক্স স্কুলে তার সন্তানকে পাঠাতেন না। তাই আমরা বিনামূল্যে করার বিকল্প ভাবতে পারিনি। প্রতিটি ক্লাসের আগের রাতেই এক্সিকিউটিভরা প্রত্যেক পার্টিসিপ্যান্টকে মেসেজ দিতো। এখন এসে আমরা যখন অনেক বড় বড় কাজেও প্রফেশনালিজমের ঘাটতি দেখি, মনে পড়ে সে সময়ের কথা। ইন্টার পড়ুয়া অবস্থায়ও আমরা বুঝতাম প্রফেশনালিজমের গুরুত্ব।

ক্লাস এর জন্য নাহয় রুম পাওয়া গেলো। কিন্তু নিয়মিত যে কাজ করব তেমন জায়গা পাচ্ছিলাম না। আমেরিকান কর্ণার আমাদেরকে তাদের সাথে কোলাবরেশনে যেতে বলে। কিন্তু অনেকগুলো প্রস্তাবনাই আমাদের পছন্দ না হওয়ায় আমরা সেদিকে আর যেতে পারিনি। এর ভিতরে আবার ওই কলেজের রুমটিও হারিয়ে ফেললাম তাদের নিজস্ব কারণে। তারপর থেকে একেকদিন একেকটি কোচিং/প্রাইভেট ব্যাচ এর রুম/কারো বাসার ছাদে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে নিয়ে গেছি। এ সময়ে এসে ভাবি, আমরা কি এক সময়কে পেছনে রেখে এসেছি এতদূর!

"সে সময়ে চট্টগ্রামের অবস্থা এমন ছিল যে রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে অভিভাবকরা কখনোই কোচিং-প্রাইভেট বাদ দিয়ে রোবটিক্স স্কুলে তার সন্তানকে পাঠাতেন না।"

কেমিস্ট্রি
কিউব
WHITE BOARD SCIENCE CLUB
রোবটিক্স

ঠিক সেই সময় এর সাথে যদি বর্তমান হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবকে তুলনা দিই যেন আকাশ-পাতাল এক পার্থক্য তৈরি হবে। হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব বর্তমানে একটি জাতীয় পর্যায়ের বিজ্ঞানভিত্তিক সংগঠন।যারা জেনেটিক্স নিয়ে কাজ করার সাহস করতে পারে। রিসার্চ পেপার তৈরির মতো মহাযজ্ঞের জন্য যারা এখন ওয়ার্কশপ নিতে পারে। যাদের আছে ইন্টারন্যাশনাল রোবটিক্স অলিম্পিয়াডের মতো বড় জায়গায় পুরস্কার পাওয়া সদস্য। যাদের জেনারেল সেক্রেটারি ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোফিজিক্স অলিম্পিয়াডের মেডেলিস্টসহ আরো অনেক বড় সাফল্যধারী। পত্র-পত্রিকা খুললেই নিয়মিত যাদের সাফল্যের খবর চোখে পড়ে। কিন্তু এই অবস্থান একদিনে তৈরি হয়নি। এই অবস্থানে উঠে আসতে আমাদের সাথে অনেক মানুষই বটবৃক্ষের মতো ছিলেন। ড. আদনান মান্নান স্যার এর প্রতি হোয়াইটবোর্ড এর প্রতিটি সদস্য কৃতজ্ঞ। গত চারটে বছর ধরে তিনি পরিচালক হিসেবে আমাদের রয়েছে রক্তিম বড়ুয়া ভাইয়ের মতো তরুণ গবেষক। তার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি গাইডলাইনেই আমরা নতুন কিছু শিখছি। একইসাথে তিনি বেশ মজার মানুষও। তার লিডারশীপ দক্ষতা যে কারো জন্যই ঈর্ষার ব্যাপার বলে আমি মনে করি। সহযোগী পরিচালক সোহেল বড়ুয়া ভাইয়ের কাছেও আমাদের ঋণ কম জমেনি।

মাহবুব হাসান স্যারের একটি কথা আমার সবসময় মনে পড়ে,
"*To develop a good course module, you have to set goals first*"
তার এই কথাকে সব জায়গায়ই আমরা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করি।

Chittagon
Summe

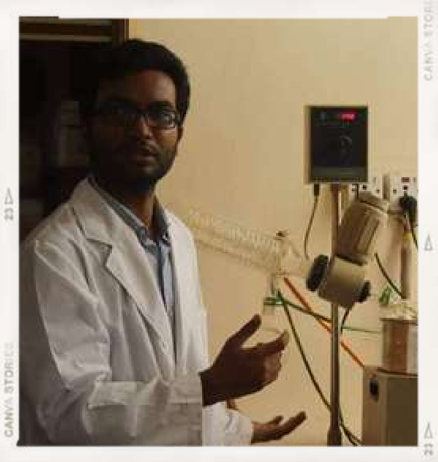

> To develop a good course module, you have to set goal first

নিরলসভাবে, বিরক্তিহীন আমাদেরকে যেভাবে গাইড করে চলেছেন নিঃসন্দেহে তা হোয়াইটবোর্ড এর প্রাপ্তি। আমাদের মডারেটর সাইফুদ্দীন মুন্না স্যার এর প্রতিটি গাইডলাইন, অনেকগুলো সমস্যার একাই সমাধান হয়ে দাঁড়ানো আর যেকোনো উদ্যোগকে এপ্রিশিয়েট করে সেটা সফল করতে তার অভিভাবকত্ব আমাদের বড় এক প্রাপ্তি। ড. মনজুরুল কিবরিয়া স্যার এর মতো উঁচুমানের ব্যক্তিত্ব আমাদের যেকোনো প্রয়োজনেই যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন তা কখনো ভুলবার নয়। জার্মানিতে গবেষণারত মাহাদিয়া কুমকুম আপুর অবদান আমরা কখনোই ভুলতে পারব না। সৈয়দ লোকমান ভাইয়ের সাথে রাত জেগে বায়োটেকনোলজি ক্যাম্প এর জন্য পরিকল্পনা তৈরির মতো অসংখ্য স্মৃতি আমাদের সামনে এগোতে সাহায্য করবে।

হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব এর শুরুর দিকের সময়ে আমাদের দেখে খুব বেশি মানুষ বলেননি আমরা টিকে যাব। আসলে এমন প্রচেষ্টা, কিংবা এই শহরে কমবেশি ইউথ অর্গানাইজেশনের অতীত এমনটা ভাবতেই বাধ্য করে। কিন্তু আমরা টিকে গেছি।দিনকে দিন নিজেদের আরো ভালো করার চেষ্টা চালিয়ে গেছি। এর পিছনের কারণগুলো যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবঃ

১.আমাদের লিগ্যাসি মেইন্টেইন করা হয়েছে যথাযথভাবে। প্রতিবছরেই আমরা নতুন নতুন টিম তৈরি করতে পেরেছি। পরিবর্তন এসেছে ক্লাবের পরিচালনায়ও। তাতে কাজের গতি ছিল সবসময়ে।

Department of Physiology, Biochemistry & Pharmacology

Freshers' Reception 20

মেম্বাররাও নিজেদের সেরাটা দিতে সচেষ্ট ছিলেন সর্বদা।
২. পরিকল্পনা মোতাবেক আগানো।
৩. হোয়াইটবোর্ড আমাদের প্রজন্মের সবচেয়ে পটেনশিয়াল মানুষগুলোকে পেয়েছে ।
৪. চট্টগ্রামের অন্যান্য প্রবলেম সলভিং ক্লাবগুলোর আন্তরিক সহযোগিতা।
৫. আত্মতুষ্টিতে না পড়া। আমরা কখনোই নিজেদের নিয়ে অনেক বেশি আত্মতুষ্টিতে ভুগিনি। যতই সামনে গেছি, নতুন নতুন কাজের অংশীদার করে নিয়েছি নিজেদের।
৬. ক্লাবের মেম্বারদের অবাধ স্বাধীনতা।সেটা যেকোনো প্রস্তাবনা হোক কিংবা যেকোনো কাজে তার স্বকীয়তা রক্ষা। আবার পরিচালনা পর্ষদও সর্বদা ক্লাবের মেম্বারদের কাছে জবাবদিহিতার অধীনে থাকে।

বায়োটেকনোলজি

এই সময়ে এসে হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব এর দারুণ এক পথযাত্রায় আমি আমাদের শুরুর কথাগুলোকে তুলে আনলাম কিছু কারণে। হোয়াইটবোর্ড এর এই চতুর্থ জেনারেশনের জানা প্রয়োজন কেমন ছিল আমাদের শুরুর দিনগুলো। আমরা কিভাবে পাড়ি দিয়েছি এই দীর্ঘ পথ । গতিশীল এই ক্লাব এর গতিশীলতা রক্ষার্থেই পুরনো হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে আমাদের একটা ট্রিবিউট দেওয়া প্রয়োজন ছিলো, আমার এই সামান্য লেখায় তাদের খুব বেশি কিছু হয়তো হবে না। কিন্তু আমি জানাতে চাই তাদের আমরা কতবেশি ভালবাসি। আর আমাদের পথ-পরিক্রমায় ভুল-ত্রূটিগুলো সামনে আসা প্রয়োজন। সেসব সামনে থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ পথচলা আরো সুগম হবে।

চারটে বছর কম সময় নয়। আমাদের সাফল্য কি?
সাফল্য তো আপেক্ষিক বিষয়। আমি সেটা নিয়ে অন্য কোনো সংখ্যায় নিশ্চয়ই লিখব। কিন্তু, আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে সামনে আগাতে শুরু করেছিলাম তার প্রাপ্তিটা পরোক্ষ। আমরা চট্টগ্রামের মানুষকে এটুকু বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে একাডেমিক পড়াশুনার বাইরে একটা বিস্তৃত জগত আছে। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সেই জগত নির্ভর। আপাতত এটুকুকেও যদি সাফল্য ধরা হয় সেটাই বা কম কিসের? আব্দুর রহমান, অংকন দে অনিমেষ, সাদিয়া সুলতানাদের হাত ধরে হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব এগিয়ে যাক আরো অনেক অনেক বছর । জয়তু হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব।

লেখকঃ সাঈদ খান সাগর, কোওরডিনেটর, হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব।

> Science we need,
> Consciousness we want.

জুলাই-আগস্ট
২০২১

হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবের দ্বৈমাসিক বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিন

হোয়াইট অরিজিন্স

ভাইরাসের ক্ষুদ্র জগৎ

ভাইরোলজি ও রোগতত্ত্ব

- পানির গুরুত্ব
- আফ্রিকায় নতুন করোনা ভ্যারিয়েন্ট
- সৌরকলঙ্ক, ধুমকেতু, বিগব্যাং
- গ্রিন টি কি সত্যি-ই ওজন কমায়?
- ব্ল্যাকহোল
- সুখে থাকতে ভয়! চেরোফোবিয়া!
- হাইপারলুপ
- ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে সিলভার মেডেলিস্টের সাক্ষাৎকার
- সায়েন্স ফিকশন, মাসিক তারাম্যাপ, বিজ্ঞান বুলেটিন, ৬টি ফিচার আর্টিকেলসহ আরো অনেক কিছু!